আহমদ ছফার
কবিতাসমগ্র

আহমেদ ছফার কবিতা সমগ্র

আহমদ ছফার কবিতা সমগ্র

সম্পাদনা

নূরুল আনোয়ার

খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি

৯ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রাক-কথন

আহমদ ছফার জীবদ্দশায় তাঁর দুটি কবিতার সংকলন প্রকাশিত হয়েছিল। একটি 'আহমদ ছফার গান কবিতা ইত্যাদি' অন্যটির নাম 'আহমদ ছফার কবিতা'। দুটি সংকলনের কোনটিতেই আহমদ ছফার সব কবিতা স্থান পায়নি। তথাপি অনেকে সংকলন দুটিকে আহমদ ছফার একেকটি সম্পূর্ণ কবিতার বই হিসেবে গ্রহণ করেছেন। বর্তমানে সংকলন দুটির অস্তিত্ব বাজারে তেমন একটা নেই বললেই চলে।

২০০৯ সালের একুশে বইমেলায় 'আহমদ ছফার সাক্ষাৎকারসমগ্র' বইটি বেশ সাড়া জাগিয়েছিল। তখন আহমদ ছফার অনেক পাঠক জানতে চেয়েছিলেন তাঁর কবিতা সমগ্র কবে বেরুবে। বিষয়টি তখনও আমাদের মাথায় আসেনি যে আহমদ ছফার সকল কবিতা নিয়ে একটা বই বের করতে হবে। আমরা মনে মনে পরিতৃপ্ত ছিলাম 'আহমদ ছফা রচনাবলি'তে তাঁর সব কবিতা স্থান করে নিয়েছে, সুতরাং আলাদাভাবে 'কবিতা সমগ্র' বইয়ের প্রয়োজন নেই। পরে আমার মাথায় কাজ করতে থাকল এত টাকা দিয়ে রচনাবলি কেনার সাধ্য ক'জনের আছে। আমার মনে ধরল, স্বতন্ত্র একটি 'কবিতা সমগ্র' বই হলে কম দামে পাঠক সংগ্রহ করতে পারবেন এবং আহমদ ছফার লেখা প্রচার প্রসারের যে দায়িত্ব আমি গ্রহণ করেছি তারও একটা পথ সম্প্রসারিত হবে। আমি মনের তাগিদে কাজটি গুছাতে লেগে গেলাম।

আহমদ ছফা গদ্য লেখক হিসেবে যত পরিচিত, কবি হিসেবে তত নন। তাঁর গল্প, উপন্যাস এবং প্রবন্ধ সাহিত্য নিয়ে যত আলোচনা সমালোচনা হয়েছে কবিতা নিয়ে তত মাতামাতি হয়নি। কেন হয়নি সেটি বলা আমার পক্ষে এক রকম অসম্ভব। তবে একটা কথা আমার মনে হয়েছে, আহমদ ছফা কবি— একথা তিনি কখনো জাহির করতেন না এবং তাঁর যে ক'টি কাব্যগ্রন্থ আছে সেগুলোও পাঠকদের হাতে তুলে দেয়ার যে সযত্ন প্রয়াসের দরকার ছিল তিনি তা গ্রহণ করেননি। 'আহমদ ছফার গান কবিতা ইত্যাদি' ও 'আহমদ ছফার কবিতা' নামের সংকলন দুটি প্রকাশ করেছিলেন যথাক্রমে— জনাব আবুল বাশার এবং শ্রী শিবনারায়ণ দাশ। তাঁরা দুজনেই পেশাদার প্রকাশক ছিলেন না। আহমদ ছফার প্রতি একটা শ্রদ্ধাবোধ প্রাণ থেকে অনুভব করতেন বলেই তাঁরা গাঁটের পয়সা খরচ করে সংকলন দুটি প্রকাশে প্রয়াসী হয়েছিলেন। তাঁরা যে বই দুটি সফলভাবে পাঠকদের হাতে পৌঁছুতে পেরেছেন একথা নিশ্চিত করে বলা যাবে না, কারণ এখানে ব্যবসায়িক লাভালাভের

বিষয়টি ছিল গৌণ। সুতরাং আহমদ ছফার কবিতা কানাগলি পেরিয়ে রাজপথে পদার্পণ করার মত সুযোগ তেমন একটা তৈরি হয়নি।

আহমদ ছফার মোট কাব্যগ্রন্থ ছ'টি। তার মধ্যে 'গো-হাকিম' নামে একটি শিশুতোষ এবং 'আহিতাগ্নি' নামে একটি গানের বই রয়েছে। গানগুলো কবিতার গোত্রভুক্ত কিনা সেটি যাঁরা কবিতা নিয়ে কাজকারবার করেন তাঁরাই ভাল বলতে পারবেন। তথাপি আমি গানগুলোকে একই মলাটে বন্দি করতে সযত্ন প্রয়াসে উদ্যোগী হয়েছি। 'ফাউস্ট' আহমদ ছফার মৌলিক গ্রন্থ নয়। তারপরেও এটির প্রতি তাঁর একটা প্রবল পক্ষপাত কাজ করত। বাংলা ভাষায় 'ফাউস্টে'র যতগুলো অনুবাদ হয়েছে কোনটাই আহমদ ছফার অনুবাদের সমকক্ষ নয়, এই ব্যাপারে নানা পণ্ডিতজনের ভাষ্য পাওয়া যায়। 'এই অনুবাদটি বাংলা ভাষার একটি ক্লাসিক হিসেবে ইতোমধ্যে স্বীকৃতি অর্জন করে ফেলেছে।' এই অপূর্ব সৃষ্টিকে তাঁর অন্যান্য কাব্যগ্রন্থের পাশে স্থান দিলে দোষের কিছু আছে বলে আমি মনে করি না; বরং সংকলনটি আরো বেশি গ্রহণযোগ্যতা পাবে এই দাবি করতে পারি।

'Aspects of Social Hormony in Bangla Culture and Peace Song' শিরোনামে আহমদ ছফা বিখ্যাত কিছু গান ইংরেজিতে অনুবাদ করেছিলেন এবং ওগুলো পুস্তিকা আকারে প্রকাশিত হয়েছিল। 'বাংলা-জার্মান সম্প্রীতি'তে দায়িত্বে থাকা অবস্থায় একটা উপলক্ষকে সামনে রেখে গানগুলো অনুবাদ করেছিলেন। এই পুস্তিকাটি তেমন একটা পরিচিতি পায়নি। এই সংকলনে পুস্তিকাটির জন্য একটা জায়গা ছেড়ে দিতে হল। তাছাড়া কয়েকটি অগ্রন্থিত ও অপ্রকাশিত কবিতাও এই গ্রন্থভুক্ত না করে পারা গেল না।

'আহমদ ছফা রচনাবলি'র ভাষা অনুসরণে 'আহমদ ছফা কবিতা সমগ্র' প্রকাশিত হল। ভুল-ভ্রান্তি থাকা একটুও অস্বাভাবিক নয়। সকলে যদি সমস্ত দোষ-ত্রুটি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখে বইটি গ্রহণ করেন আমার পরিশ্রম সার্থক হয়েছে মনে করব।

জুলাই, ২০০৯

নূরুল আনোয়ার

সূচিপত্র

জল্লাদ সময়

[প্রথম প্রকাশ : ১৯৭৫]

উৎসর্গ

কবি সিকানদার আবু জাফর
কবি আল মাহমুদ
শ্রদ্ধাস্পদেষু

আমাদের সময়

আমাদের এ সময় সুসময় নয়
জোয়ারে হিন্দোল দোলা, ভাটায় মন্থর;
চেনাজানা ভদ্র নদী ভেবে
যেজন ভাসাবে ডিঙ্গা পৈতৃক বিশ্বাসে
জেনে রাখ সর্বনাশ সম্মুখে তোমার।

মেঘনা পদ্মা কর্ণফুলী যেই নামে ডাক
পুরোপুরি পাল্টে গেছে জলের শরীর;
এই নদী সেই নদী নয়
খরধার বেগবান তরঙ্গিত গতি
সহিংস আঘাতে খায় সাবেক বসতি।

না বৈশাখ না জ্যৈষ্ঠ

১

বৈশাখে দেই না ডালি
জ্যৈষ্ঠদিনে করিনে ক্রন্দন
দুই হাতে ছিঁড়েখুঁড়ে জন্মের বন্ধন
লাঙল চালাই বেগে অকর্ষিত ক্ষেতে।

আমি এক ক্ষ্যাপা চাষা
শ্রীমন্ত দক্ষিণ হস্তে অনন্ত ভরসা
রাশি রাশি প্রাণভরা বীজ
কুমারী মাটির বুকে অনুরাগে ঢালি।

আগামী আষাঢ়ে
ঘন নীল মেঘ চোঁয়া জলধারা প্রাণদ সঞ্চারে
শস্যের শিশুর কানে করে যাবে মন্ত্র উচ্চারণ
সবুজ সদর্পে ঊর্ধ্বে বাড়াবে মস্তক।

অঘ্রাণে কনক বর্ণ সুপক্ক ফসল
দেখব রেখেছে মাথা আলের শিথানে
বিস্তীর্ণ দিগন্ত জুড়ে আনন্দের ধান
আমার প্রাণের প্রাণ স্বপ্নের বিস্তার।

মনে হবে আমি যেন সেই মাতামহ
দৌহিত্রের মুখ দেখে আচানক যার
হঠাৎ ননীর স্রোতে
প্রবীণ প্রাণের প্রান্তে জন্ম লয় স্নেহ।

২

রবীন্দ্রনাথের কাছে ঋণী নই আমি
নজরুল কিংবা কোন ফসিলের স্তরে
হৃদয়ে পাথর বসে। আমি তো নিশ্চিত জানি
বাস করি ভিন্ন ভূমণ্ডলে
বন্দী আমি, মুক্ত আমি আপন সমাজে।

কম্পাসের মত, আমার মনের কাঁটা ঘুরে বারবার
অভিযাত্রী সন্তানের দিকে তাক্ করে।
তা দেয়া কুক্কুটি প্রায় স্বপ্নে বাঁচি বলে
অসীম সাহসী আমি
লোহার লাঙল দিয়ে পাথুরে মৃত্তিকা চাষ করি।

এই হৃদয় দ্রবণী শ্রমে কি তীব্র আস্বাদ
দূর ভবিষ্যৎ কান্তিমান বিম্ব ফেলে রূঢ় বর্তমানে
যেমন আকাশ ভাসে জলের হৃদয়ে।

আমি তাই তাজা ডিনেমাইটের মত শব্দে
প্রতিদিন বিস্ফোরণ আনি
প্রচণ্ড উত্থানমন্ত্রে যৌবনের উজাগর ধ্বনি
তীব্রবেগে উর্ধ্বে ছুঁড়ে মারি।

যে কবি বৈশাখে জন্মে বঙ্গদেশে
বিগ্রহের আসনে আসীন— তাঁর কণ্ঠ নিঃসৃত সঙ্গীত
মাতৃগর্ভে শোনা অস্ফুট নিঃশ্বাস মনে হয়।

যে কবি বজ্র-পুষ্প নীলকণ্ঠে করেছে ধারণ
নব নির্মিতির রাজ্যে তাঁর কণ্ঠধ্বনি
কখনো শুনিনি আমি।
জানি আমি জানি
কথার সাগর বটে রবীন্দ্রঠাকুর,
কি লাভ আমার তাতে
আমি তো পরের ধনে করিনে পোদ্দারি;
খোঁড়া হই, অন্ধ হই জ্ঞাত আছি বিলক্ষণ
আমি তবু স্বতন্ত্র ঈশ্বর
আমারো ধ্যানের গাঙে প্রতিদিন জাগে নয়া চর।
বিদ্রোহীর অগ্নিকুণ্ডে মৃত অঙ্গারের লোভে
চপল শিশুর মত কখনো যাইনি আমি
বরং করেছি ঘৃণা
অপ্রকাশ দুঃখ-স্রোতে অপরের স্থূল হস্তক্ষেপ।

আমার জীবনক্ষেত্রে ফেলেছে এই ভাষা
লোহিত মাংসের মত ভীষণ রসালো
গিঁঠ গিঁঠ অস্থিময় কখনো বা ভাঙ্গা কাঁচ
প্রাণের আলোক লেগে করে ঝলমল।

বৈশাখ জ্যৈষ্ঠেতে গড়া বাঙালির
সাধের মিনার, চেতনার স্তরে স্তরে
খসে খসে যায় সময়ের নিষ্ঠুর প্রহারে
জীর্ণ অট্টালিকা হতে যেন চুন বালি ঝরে।

আকণ্ঠ গানের তৃষ্ণা, বুকে জ্বলে অগ্নিবর্ণ কথা
বাঙলার বারোটি মাস ওড়ায় পাতাকা
দুই হাতে ভরে নিয়ে শোণিত অঞ্জলি
নব কাব্যসুন্দরীর রাঙা পায়ে ঢালি।

জন্মভূমি

তসবিহ্ মালার মতন গোটা গোটা
মাগো তোমার চোখের জলের ফোটা
দরদরিয়ে শঙ্খ নদের বেগে

রেখায় রেখায় মেঘলা আনন ভাসায়
সোঁদর বনের বাঘিনী মা
তুমি কেন গর্জে ওঠ না।

মরার হাড়ে চমক লাগে
জোয়ার খেলে জলে
ঘনিয়ে আসে রাঙা নাটক
সময় ওঠে দুলে
মা জননী রক্তরঙের
বসনখানি কেন পরো না?

ঘোষণাপত্র

[আল মাহমুদ সমীপে]

আপনি সংবাদ জানতে চান?
তাহলে শুনুন
এরই মধ্যে একটা চমৎকার কাজ করে ফেলেছি
বুঝিয়ে না বললে ঠিক ধরতে পারবেন না।

গত রাতের আকাশে বাঁকা সুন্দর চাঁদ ছিল
তারাগুলো হীরকখণ্ডের মত জ্বলছিল ঝক্‌ঝক্
আঁকাবাঁকা হাওয়া মশারিতে ঢেউ খেলছিল
প্রকৃতিতে শুরু হয়ে এক ঘনায়মান তাণ্ডব।

আমার শরীর তাতছিল, মন যাচ্ছিল লালিয়ে
জিভের আগায় মারাত্মক সব শব্দরাজি
পাকা ফলের আবেগে বোমার মত
প্রবল দোলায় দুলছিল।

সে এক অদ্ভুত অনুভূতি
আমি ঠিক আমাতে ছিলাম না
বুকের খাপে তলোয়ারের ঝন্ ঝন্
কানে সর্বনাশের সঙ্কেত
তারপরেও কি স্থির থাকা যায়!

হঠাৎ করে এক কাণ্ড করে বসলাম
পয়লা একটু হকচকিয়ে গিয়েছিলাম,
কি জানি কি ঘটে, বিপদ তো সেয়ানা
ভালুকের মত ওঁতপেতে থাকে।

শেষ পর্যন্ত আপন মস্তকের ওপর দণ্ডায়মান হয়ে
মধ্যরাত সাক্ষী রেখে
আস্ত একটা যুদ্ধ বেবাক দুনিয়ার বিরুদ্ধে
ঘোষণা করে দিলাম।
তাছাড়া আর কি করবার ছিল—
আমার মত বেপরোয়া হঠাৎ কবি
যে নাম যশের ধার ধারে না, রেডিও টিভির
পরোয়া করে না, আপন রক্তিম হৃদয়
নিয়ে বেঁচে আছে বলে গর্বিত, দাঁতখসা
অধ্যাপকদের বুড়ো আঙুল দেখায়,
মানুষের মনে হানা দিয়ে জায়গা করে নিতে জানে
তার দিন কেমন করে কাটে?

দেশটা যেন বদ্ধজলা
এদিকে মরণ— ওদিকেও তেমন
দুয়ারে দারোয়ান, অন্দরমহলে খোজাদের চীৎকার
তাদের গায়ে চাপকান, গলায় চাদর
বিশ্রী বোঁটকা রামছাগলের গন্ধ
কাঁহাতক সহ্য করা যায়
তাই মধ্যরাতে যুদ্ধ লাগিয়ে বেঁচে গেলাম।

জিভের ডগা থেকে শব্দগুলো নীরব বিস্ফোরণে
ফেটে পড়ল, এই মাসের, এই বছরের
এটাই সেরা খবর;
কোন খবরের কাগজে ব্যানার হয়নি
রয়টার রিপোর্ট করেনি
টিভি কভারেজ দেয়নি
ওরা সবাই খবরের চোকলা নিয়ে ব্যস্ত।
রাজস্থানে ভারতীয় মুরগি পরমাণুর ডিম পেড়েছে
এই নিয়ে হৈ চৈ করে কিম মেরেছে
এরা সাগ্রহে প্রত্যাশা করে একটা কিছু ঘটুক
অন্যরকম— যাতে হেডলাইনে চীৎকার করতে পারে।

কিন্তু এই সংবাদ কীটেরা জানে না
দুনিয়ার সেরা বিস্ফোরণগুলো নীরবেই ঘটে।
যেমন ধরুন যৌবন প্রাপ্তির গোপন মধুর সংবাদ
প্রথম প্রেমে পড়ার বিস্মিত পুলক
আইনস্টাইনের মস্তকে আপেক্ষিক তত্ত্বের উদয়
কার্লমার্কসের মনে নতুন বিশ্বের উদ্ভাসন
অথবা রবীন্দ্রনাথের মনের সৃষ্টি যন্ত্রণার
ক্ষমাহীন আকুলি বিকুলি;
কোন্ বাপের বেটা খবরঅলা এসবের খোঁজ রেখেছে;
অথচ এসবই হল সব খবরের গ্র্যান্ড ফাদার।

সে যাকগে
আমি যাকে বলেছি বিশ্বের মহত্তম বিস্ফোরণ
কিন্তু এমন নীরবতায় ঘটিয়েছি যে
কাউকে টের পাবার কোন অবকাশই দিইনি।

গতকাল মধ্যরাতে
আমি একাকী বেবাক কিছুর বিরুদ্ধে
একটা আত্তযুদ্ধ ঘোষণা করেছি।
সারারাত কাগজে খস খস করে ঘোষণাপত্র লিখেছি
তারাগুলো সভয়ে আমাকে এ অসমসাহসী কাজ করতে দেখেছে।

আমি ধ্রুবনক্ষত্রের প্রতি নির্দেশ জারি করেছি
বারোমাস এ্যাটেনশনের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকবে
একচুল এদিক ওদিক হটতে পারবে না।

চাঁদকে পরিষ্কার বলে দিয়েছি
পুরনো কথা মনে কাঁটার মত বিঁধে আছে
এরপরেও যদি স্বৈরিণীর মত আচরণ দেখি
আমার সুদক্ষ গোলন্দাজ দল
বেপরোয়া শব্দের কামান দেগে
রূপোলি অহংকার ফালা ফালা করে
তোমাকে উলঙ্গ করে ছাড়বে।

সূর্যের কাঁধে রসদ জোগাবার ভার দিয়েছি
বহুকালের বিশ্বস্ত সেবক, চাকুরিটাও উত্তম

কিন্তু আমার আলোকপিয়াসী শব্দসৈনিকদের
ভাগে আলোর যদি কমতি পড়ে
দুনিয়ার চারকোণ ঢুঁড়ে
রাশি রাশি ব্যাকরণ পুস্তক এনে জ্বালামুখ সীল করে দেব।
ছয় ঋতু বারোটি মাসের প্রতি নির্দেশ
থিয়েটারের নিপুণ নটির মত
নিখুঁত সাজ পোষাকে
মাইনে পাও না পাও
ঠিক সময়ে আসবে যাবে।

দুনিয়ার গ্রন্থালয়গুলোতে আমার সৈনিকদের ছড়িয়ে দিয়েছি
অতীত কবিদের আত্মা যেখানে কালি এবং কাগজের
পটভূমিকায় বন্দী;
আমি মূর্চ্ছাহত আত্মাদের জাগিয়ে তুলতে নির্দেশ দিয়েছি
এবং বলেছি তারা যেন আবাবিল পক্ষীর মত
ভূমণ্ডলে চক্রমন করেন।
কেননা এরই মধ্যে পৃথিবীর কলকজায় প্রচুর জং ধরেছে
ঘুরতে ফিরতে বিশ্রী আওয়াজ দেয়
শরীরের ভাঁজে ভাঁজে পুঁজ-পুষ্ট ঘা
চীৎকারে প্রতিদিন বাতাস পর্যন্ত কাঁদে।
ধন্বন্তরী আত্মাদের প্রতি
প্রেরণার মত ওয়ারলেস ম্যাসেজ রিলে করেছি—
সারিয়ে তুলুন পৃথিবীকে, সুন্দরীর হৃত
যৌবন ফিরিয়ে দিন।
আপনাদের বিদ্যে জাহির করুন
তা নইলে হাতের পরে তুলে নিলাম লেখনী
মহত বৃহতের খাতা থেকে ঘস ঘস কেটে দিচ্ছি
ঢোলা ঢোলা সব নাম।

যুবতীদের প্রতি রঙীন প্ররোচনা
কৃষ্ণচূড়ার বন লুট করে খোপায় কেশে
আগুনবরণ ফুল গুঁজে, জোছনা রাতের
আবছা আঁধারে মনের মানুষের হাত ধরে
বেরিয়ে পড়, বেরিয়ে পড় সব
পথে পথে অমৃত নির্ঝর, পেয়ালা
ভরো আর পান কর

রক্তিম মদের ফেনার মত লোহিত যৌবন উপচে উঠুক।
প্রেমিকদের কানে মুখ রেখে বলেছি,
বেদনার গভীর নির্জন তার স্পর্শ কর
ব্যথাকে ঘষে ঘষে তীক্ষ্ণ এবং চোখা করে
প্রতিটি ভাব অনুভব বিজুলি শিখায় যেন জ্বলে।
তোমাদের ভাগ্য চেকন সুতোয় ঝুলছে
অন্যথা শরীরে দোকান খোলা
মহিলাদের সঙ্গে ছেদবিহীন দাম্পত্য জীবন;
মাংসের কারাগারে বন্দী হিসেবে কাটাবে।

নিনাদিত হুকুম সেনানিদের প্রতি
ধর্মগুরুদের শখের আলখাল্লাগুলো খুলে ফেল
হাজির কর তাগোরে আমাগো থিয়েটার হলে
আর কবিতা পাঠের আসরে, নিপুণ অভিনয়
দেখে মানুষ মুগ্ধ হয়ে বিশ্বেস করুক
আর কবিতার আগুনে অন্তর শিক কাবাবের
মত সেঁকতে থাকুক।

বুড়ো পণ্ডিত মশাইদের প্রতি অনুরোধ
আপনারা নাসিকাযন্ত্রে ফুসফুসের ঘর্ঘর শব্দ তুলে
যখন নিদ্রিত হবেন, অনুগ্রহ করে সেই ঘুমের মধ্যে
মরে থাকবেন, এই যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতেও
বীরের সম্মান পাবেন। আমারই নির্দেশে
আগামীকাল সকালে পৃথিবীর নবযৌবন প্রাপ্তি ঘটছে।
বেঁচে ওঠার অপচেষ্টা করে
আপনারা ডাইনোসরের উত্তর পুরুষদের মত
হ্যাংলামো করবেন না।

আমার অক্ষৌহিনী সৈনিকদের
অস্ত্র শিক্ষা দেয়ার স্কুলে আমি অনেক গহন গভীর
মারাত্মক এবং প্রয়োজনীয় বিষয় শিক্ষা দিচ্ছি
দুনিয়ার সেরা প্রতিভাবান বলে কথিত মানুষটিও
এসবের নাগাল পাবে না কোনদিন।
আমার দূর পাল্লার যুগ অতিক্রমী কামান
আন্তঃমহাদেশীয় নতুন মূল্যচিন্তার ক্ষেপণাস্ত্র
এবং চিরঞ্জীব ট্যাংক কারখানায়

দিনরাত হরদম তৈরি হচ্ছে
নিঃশ্বাস ফেলবার অবকাশ নেই।
ইচ্ছে ছিল আপনাদের সকলকে ডেকে
মিটিং করে কাজটা করব।
পরে দেখলাম, সাত কুকুরে শেয়াল পাকড়ায়
কথাটা শুনতে চমৎকার, কিন্তু তাতে সত্যের
ছিটে ফোঁটাও নেই।

তাই আমার কাজ আমি একা করে ফেলেছি
নিন্দে প্রশংসা দুই-ই আমার।
কেউ যদি গাঁইগুঁই করে, নামঠিকানা
পাঠিয়ে দেবেন, দেখে নেব হালাই কেমন বাপের বেটা।
আমি একজন কবি জেনারেল কোন্ শালারে কেয়ার করি
কারাগারের চৌহদ্দীতে ঢাক পিটিয়ে জানিয়ে দেবেন
আমি মানে জনাব অমুক আস্ত লড়াইর ডাক দিয়েছি।

জল্লাদ সময়

খড়্গ হস্তে নৃত্য কর জল্লাদ সময়
তোমার সুস্থির হওয়া বড় প্রয়োজন
সকলে বিশদ জানে তবু হয় অন্ধকারে খুন
অস্ত্রহীন তাই কেউ বিনা খুনে দায়ভাগী হয়।

কেন্দ্রহীন হে সময় ছিন্ন ডানা রাক্ষসীর মত
শরীরে গড়িয়ে চল একটানা নীতিহীন বলে
তোমার রথের চাকা ঠেকে দেখ কোন্ রসাতলে।
মূল্যের বৃক্ষের মূলে অহরহ হানছ আঘাত।

সময়ের জানু চিরে বেরিয়েছে জারজ সময়
টাট্কা মনুষ্য প্রাণ মনে কর খেলার পুতুল
ইচ্ছেমত ভাঙ্গ তুমি মর্জিমত বসাও মাশুল
তোমার গর্ভের পাপে বঙ্গদেশে জেগেছে প্রলয়।

দাঁতাল জন্তুর মত গর্জমান নির্দয় সময়
তোমার আশ্রয়ে বাড়ে পুষ্ট হয় শূয়রের দল
যা পারে তছনছ করে দুঃখিনীর অন্তিম সম্বল
শোননা প্রজ্ঞার বাণী অনাচারে করনা সংশয়।

সূর্যালোকে পিঠ দেয়া আততায়ী লজ্জিত সময়
যা কিছু প্রকাশ্য তুমি বামহস্তে করছ গোপন
সমূহ ধ্বংসের বীজ গর্ভাশয়ে করেছ রোপণ
কিন্তু কিছু সত্য আছে কোনদিন লুকোবার নয়।

কৃষ্ণচূড়া

এখন জ্যৈষ্ঠের দিন
কৃষ্ণচূড়া ডালে ডালে তুলেছে নিশান
খুনের বরণ বেশি খুনস্মৃতি জাগানিয়া ফুল
শাখায় ক্রোধের শিখা জ্বেলে
কম্পান্বিত তীক্ষ্ণস্বরে
হাওয়ায় কিসের কথা বলে
আচানক থমকে যায় গানের বুলবুল।

এখন জ্যৈষ্ঠের দিন
তরুশীর্ষে সময়ের তুমুল সংবাদ
রাঙা ফুলদল বলে
মৃত সব মানুষের বিষণ্ন ভাষায়
যুদ্ধ হবে
আরো একবার যুদ্ধ হবে
পাণ্ডুর বিশীর্ণ এই হতাশ বাঙলায়!

এখন জ্যৈষ্ঠের দিন
নিসর্গ সংঘাতমত্ত, তরুমূলে প্রাণ
থর থর নাচে, ডালে ডালে
অশান্ত ডম্বরু
প্রকৃতির অন্তর্লোকে উষ্ণ কানাকানি
অদ্যকার এই সব অভিমানী ফুলদের
মৃত সব মানুষের খুন মনে হয়।
এখন জ্যৈষ্ঠের দিন
নির্বাক পল্লবে জাগে ফিসফিস ভাষা
বড় বেশি ম্লান-তাজা দুঃখ ঝরে যায়
যেন মনে হয়
মৃত সব মানুষের করুণ নিঃশ্বাস

অর্ধস্ফুট বাণী
দলে দলে তারা বলে
যুদ্ধ হবে
আরো একবার যুদ্ধ হবে
পালঙ্ক শায়িত লাশ এই বাঙলায়।

পঁচিশে বৈশাখ

তোমার জন্মদিনে
কবিতা লক্ষ্মীর কাছে করি অঙ্গীকার
শোন প্রেতদেহধারী রবীন্দ্রঠাকুর
আমার কবিতা হবে বল্লমের ফলা
গনগনে লাল ক্রোধ
শব্দমন্ত্রে উন্মূলিত হবে যেন
সময়ের ভয়ঙ্কর ফুল।
আমার কবিতা হবে
দুর্ভিক্ষ মন্থিত বাণী
ভুখা নাঙ্গা মানুষের জ্বলন্ত হুঙ্কার।

তোমার মসৃণ কাব্য ললিত রাগিনী
এই ঝোড়ো যুগে
যখন মানুষে মানুষ খায়
রেশমের ফাঁস মনে করি।
গোটা বঙ্গভূমি জুড়ে আজ সুন্দরের কীট
ভদ্র মহোদয়দের ত্বকে কিলবিল করে।

কুণ্ঠাহীন কণ্ঠে বলি
তাতানো ইস্পাত হবে আমার চেতনা
পাথরে আঘাত করে টেনে নেবে ভাষা
জন্ম দেবে বেপরোয়া শব্দমালা
অহঙ্কারী ধ্বনি,
তারা রোমশ আঁধার কেটে
ছুটে যাবে কান্তিমান দিনের আলোকে
'গাইব মা বীররসে ভাসি মহাগীত'

রাখী

আমি বাঁচতে চাই
পূর্বরাগের অনুরাগে রাঙা
রক্তিম লগ্ন যেমন
ভালবেসে ভালবাসার গান গেয়ে
অনুর্বর প্রহরে
জীবনের স্বচ্ছধারা ছিটিয়ে
প্রচ্ছায় সঘন হিজল গাছের তলে
দীঘির জলে
কম্পমান চাঁদের ছায়া দেখে
তারাভরা আকাশ দেখে
এ জীবন আমি সঙ্গীতে সঙ্গীতে
নক্ষত্রের দিগন্তে
ছড়িয়ে দিতে চাই।

আমি প্রেমিক
ফুলের রসে ফলের রসে
মৃত্তিকার সুগোপন একান্ত
আপন মমতায় সিক্ত
ধমনীর কিনারে কিনারে
ঢেউ দেয়া উদ্দাম
নাড়ীচেরা ব্যথার শিয়রে
রক্তগোলাপের মত লাল
জ্বলছে অমেয় প্রেমের উষ্ণশিখা।
শূন্যচারী বিধাতার ফাঁকির শূন্যে নয়
পৃথিবীর আঁশে শাঁসে পুষ্ট
ভূঁই-মালতীর লতার মত
লাউ কুমড়োর ডগার মত

নিবিড় মমতার বিনম্র ফসল
হৃদয়ে হৃদয়ে বপন করেছি।

হাতে আমার অস্ত্র নেই
তূণীরে রক্তপিপাসু তীক্ষ্ণ তীর নেই
চারপাশের হিংস্র কুটিল লোভাতুর দৃষ্টি

দৃষ্টির তীক্ষ্ণ শহরে পলে পলে আহত
আমি এ যুগের এক ক্রুশবিদ্ধ যীশাশ।

আঘাতে আঘাতে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে
একেক ঝলক রক্ত একেকটি লালবর্ণের
কম্পিত সঙ্গীতের কলির মত
চরণতল রঞ্জিত করে
তৃষিত মৃত্তিকায় অবগাহন করছে।

হারানো রক্তের স্মৃতি
হারানো জীবনের মত
প্রাণে যখন টনটন বাজে
তখন ঠিক তখনই দেখি
মুখবক্ষে রক্তলেখা হাজার নাটক
অভিনীত হয় রোজ বীভৎস উল্লাসে
পশু মাংসে পাশবিক উচ্ছ্বাসের জের
যখন রাত্রির গহন স্পর্শে
থিতিয়ে আসে
আমি দেখি সে ধ্রুবনক্ষত্রের দীপ্তি
অবিরাম জ্বলছে বুকের কামনার মত
আর স্থির থাকতে পারিনে
প্রাণের প্রিয় দোসর সঙ্গীতলতা
দুলে ওঠে।

আমার ভায়ের রক্তে
আমার গানের সংরাগ মিশে
রচনা করে প্রশান্তির পুষ্পল দ্বীপ
গানের বর্মে, প্রেমের বর্মে, শান্তির বর্মে
সারা শরীর আবৃত করে ঘুমোতে যাই।
আমার রক্ত ঘুমোয়, মাংস ঘুমোয়
আর ঘুমোয় স্তব্ধ নিথর রাত্রি
ক্ষমাহীন চেতনা দুর্বাশার মত
প্রচণ্ড আক্রোশে রাত জাগে;
অস্তিত্বের মোড়ক থেকে
স্বপ্ন বীজ খসিয়ে মূর্ত করে তোলে
আমি স্বপ্ন দেখি

রক্তাক্ত সংগ্রামের শীর্ষে শান্তির মুক্তোবিন্দুটি জ্বলছে
ঠিক যেন আংটির ওপর পাথর।
ভারি অদ্ভুত এমনি করে মুসা নবী একবার
নীল দরিয়ার হৃদয় দেখেছিল।
জেগে ওঠে লাল শাপলার হাসি দেখি
শর্ষেফুলের ক্ষেত দেখি
ফুলের আগুন বুকে ছড়ায়,
আহ্ আফশোশ—
জননী পৃথিবী হজম করতে পারেনি
আমার ভায়ের রক্ত
ফুলের গালে সূর্যরাগে জ্বলছে।

আর স্থির থাকতে পারিনে
বেহালার ছড় টেনে একটা করুণ
সুরের কবরী রচনা করি
টসটস অশ্রুবিন্দু গড়িয়ে পড়ে
আমার তোমার আরো অনেকের
এ অশ্রুমতী নদীতে ভেসে ভেসে
নামহারা নিস্তরঙ্গ সাগরে ডুবেও
নক্ষত্রের দিগন্তে সঙ্গীতের
রাখী বাঁধার স্বপ্ন দেখি।

নৃপতি

[মার্টিন লুথার কিংকে]

আমার আকাশ থেকে আরো এক তারকা বিলয়
কাঁদব কি, ঢাকব কি মুখ, নাকি বন্ধ করি
দুই চোখ! নিশ্চিন্ত নির্বাণে যাব তেমন জঙ্গল
কই প্রত্যহ নিদ্রার কালে হতাশাকে বলি
দেরি কেন কৃষ্ণমিতা বিলম্ব না সয়।
কুরে কুরে খারে তুই সবুজ বিশ্বাস তরু
সেরা বিত্ত মানবতা
তুই আজ হৃদয় বল্লভ।

হতাশারে— তুইও এক নিশ্চেষ্ট নাগর
ঠেলে দিলি অভাগারে সূর্যের সকাশে

জ্বলন্ত সন্দেশবহ কু-বারতা আনে
কেবল নক্ষত্র মরে আমার আকাশে
অভাগা দুঃখের গাঁথা লিখবে চিরকাল!

লিংকেন, মার্টিন কিং তোমাদের বুলেট—
প্রবিষ্ট বুক, ভূলুণ্ঠিত দেহ বল কোন্ আচ্ছাদনে ঢাকি
মার্কিন মুলুকে নেই তেমন চাদর।
তোমাদের ওষ্ঠাধরে প্রফুল্লিত মিনতির আলো
বল কোন্ দীপাধারে জ্বালি
নির্বল বাঙালি আমি
তবু পেলে বর্তে যাই, সৃজনে প্রলয় আনে তেমন আয়ুধ।
তাহলে কোথায় যাব সাদা-কালো মানুষের হয়ে
আবার যাব কি আমি হিমালয়ে? বোধিদ্রুম তলে?
মুসার মতই যাব সিনাই পর্বতে?
হেরার গুহায় জাগা আলোকিত প্রশ্ন পেলে
করব কি বিদ্ধ পুনঃ আল্লার হৃদয়?
কিছুই জানিনে
কিন্তু আমার দক্ষিণ হস্ত
কেন কালো মানুষের হয়ে
কোমরে ড্যাগার খুঁজে বুঝতে পারিনে।

মা

দৃষ্টি হতে শৈশবের গ্রাম ঝরে যায়
আমার জননী আজ স্বর্গবাসী হল
এই বেদনা কোথা রাখি সৃষ্টি টলমল
আস্ত এক ভূমণ্ডল আমার হারায়।

চুপ কর তৃণতরু স্তব্ধ হও পাখি
ক্ষান্ত দাও সহোদরা বড় বেশি লাগে
প্রকাশ্য রোদন নেই পুরুষের ভাগে
কৃপালু বান্ধবজন করে দাও আমাকে একাকী।

উঠোনে কে তুমি কাঁদ ব্যথিতা মশারি
একাকী বালিশ ধুকছ বিছানে

স্বহস্ত পালিত তরু পড়ে কিছু মনে
কোন্ স্মৃতি ধর তুমি বেনারশি শাড়ি।

আমাকে আবৃত কর উদাসী রিক্ততা
প্রান্তরের প্রান্তে বাজে বিষণ্ন বাঁশরী
পঞ্চ প্রাণে কাকে ডাকি মাতৃনাম ধরি
তুমি কি জননী সত্যি হে মূর্ত মৌনতা!

কবিতার প্রতি

আমাকে নিল না কেউ তাই তোর
দ্বারে এলাম বড় ক্লান্ত এই অবেলায়
তুই যদি ফেরাস আজ নিষ্ঠুর হেলায়
যাব, হেন স্থান নেই, রুদ্ধ সব দোর।

সুন্দরী করুণাময়ী দু'টি পায়ে বহুদূর থেকে
হেঁটে, মাড়িয়ে কাঁটার পথ আগাছা জঙ্গল
ধুধু বালুচর ক্ষুধায় পাইনি খাদ্য পিপাসায় জল
তথাপি এনেছি দেখ ছিন্নবস্ত্রে একতারা ঢেকে।

কি গান শুনবি বল্ কোন্ সুরে এই যন্ত্র বাজাই
রুদ্ধ হাত স্তব্ধ জিহ্বা প্রাণের গহন বাক্য চোখে চোখে বলি
আমার সম্মুখে দাঁড়া তৃষিত নয়নে দেখি সুন্দর ত্রিবলী
প্রাণেশ্বরী কোন্ রাগ ভাল লাগে বল্ আজ কোন্ গান গাই।

আমার দুঃখের কথা প্রতীক্ষার উতলা প্রহর
বসন্তের মৃদু হাওয়া, নিষ্পত্র হেমন্তের সোনালি বিকাল
ঝঞ্ঝা ঝড় বজ্রপাত এই মত কেটে গেছে কাল
যদি চাস তুলি তবে নিপুণ যন্ত্রের তারে প্রাণের ঝঙ্কার।

অনন্ত যৌবনা তুই বীর্যবান পুরুষের একাগ্র সাধনা
জন্মগত অক্ষমতা কোন্ প্রাণে নিবেদন করি
ইচ্ছে করে মর্মমূলে হেনে বসি তীক্ষ্ণধার ছুরি
লাল রক্ত টেনে হৃষ্ট মনে সাঙ্গ করি তোর আরাধনা।
তোর রাজ্যে কেউ আসে যাওয়ায় ঘূর্ণির ঢেউ তুলে

জন্মেই যুবরাজ কেউ নক্ষত্র নীরবে কাঁদে কারো তিরোধানে
কারো লাল হৃদপিণ্ড যুগ যুগ রেখেছ শিথানে
নির্বাক ফুলের মত অকালে হারায় কেউ তোমার অকূলে।

আমাকে নিল না কেউ, নিরুপায় বড় আমি
আবদ্ধ তরীর মত দিন রাত ঘাটে বসে একা
ঝিলমিল শাড়ির প্রান্ত ভাগ্যে গেল দেখা
মিলে যদি অনুমতি মায়াময় তোর লোকে কিছুক্ষণ থামি।

সাধ

১

সাধ ছিল মরে যাব তরুণ বয়সে
যেদিন আকাশ ব্যেপে ফুল্ল চন্দ্রলোক
ছড়াবে মধুর হাসি, ভ্রমরের অপূর্ব ঝঙ্কার
জেগে রবে ফুটি ফুটি চম্পকের বনে, জাগাবে
বুকের তলে করুণ বেদনা। ডাহুকির মত রাত
গাঢ় মমতায় নীরবে মেদুর হবে, করুণায়
উথলাবে হিয়া। অর্ধ জাগরণে দৃষ্ট স্বপ্নের মতন
অভ্যস্ত জীবনখানি চিরতরে ফেলে
অন্তরে যে বাঁশি বাজে তার সুর ধরে
একাকী গমিত হব নক্ষত্রের পথে
দেবতার পুত্র আমি এখানে কি কাজে আছি
হেলায় হেলায় জীবনের মৃগয়ার দিন চলে যায়।
অতএব এই বেলা চল
মিলবে কি কোনদিন এরকম সুন্দর প্রয়াণ।

২

যখন তোমার সঙ্গে দেখা হল নারী
প্রাণের উপান্তে এল আনন্দিত দাহ, বাক্যে রস
পাখ-পাখালির কণ্ঠে শুনি গন্ধর্ব নিন্দিত সুর
তরুরাজ গায় ধীর বিলম্বিত লয়ে সুকণ্ঠ সঙ্গীত।
কাঙ্ক্ষিত সকল ধন কান্তিময়ী তোমার শরীরে
যেন বয় ঢল ঢল নবীন লাবণী। পিপুলের

ঘন ছায়া দৃষ্টি হতে ঝরে,
অবেলায় স্নাত হয়ে যাই।
এমন তোমাকে ছেড়ে কোথা যাব?
কোথা আমি যেতে পারি? পাখি কি
কোথাও যায় প্রাণপূর্ণ বাসাখানি ছেড়ে?
আবিষ্ট প্রাণের পরে
সাধ করে চড়িয়েছি সোনার শৃঙ্খল
জন্মান্ধের মত তাই দুবেলা পায়ের কাছে ঘুরি
অন্তরে কামনা করি দৃষ্টিপটে এ অন্ধতা চিরদিন থাক।

রজনীগন্ধার উপমা

ইচ্ছে করে মাঝে মাঝে, জ্বলে উঠি
ফেটে পড়ি তীব্র বিস্ফোরণে
ভেঙ্গে ফেলি হাটে হাঁড়ি
জানুক নগরবাসী, শুনুক সকলে
তোমার চরিতকথা
মহিলা হে কি রকম তুমি!

রজনীগন্ধাকে আমি বড় বেশি
ভালবাসি, ব্যথা দিতে নিজে ব্যথা পাই
এতদিন বলি বলি করে তাই বলতে পারিনি;
এ আমার দুর্বলতা, কলঙ্কও বলতে পার
তোমাকে পুষ্পের সঙ্গে অভিন্ন দেখেছি।

অবিকল গন্ধবহ ফুল্লমুখি নারী
রজনীগন্ধার মত অভিমানে নিত্য নতমুখি
মুখোমুখি দেখা হলে বাক্য জমে যায়
কি এক বয়েসী বোধে হঠাৎ নিশ্চল হয়ে উঠি
তোমাকে ব্যথা দিলে
রজনীগন্ধার দল ব্যথা পাবে ভেবে।

প্রিয়তমাসু

প্রাণের আকাশে জ্বলো পূর্ণিমার চাঁদ
কি করে ঘুমোই প্রিয়তমা
নৃশংস সময় পেতেছে নিপুণ ফাঁদ
দৃষ্টিতে ঘনায় রাত্রির অমা
প্রিয়তমা আহা প্রিয়তমা।

তোমার চোখের কাজল রেখায়
দূর বনানীর ঈষৎ ছায়া
নিখুঁত ধরেছি প্রাণের পর্দায়
স্বপ্নে কেঁদেছে ঘরের মায়া
প্রিয়তমা আহা প্রিয়তমা।

কি করে দাঁড়াব শিরদাঁড়া মেলে
বাইরে আঁধি ভেতরে ঝড়
সবদিক রেখে কোন্ যাদু বলে
সাজাব সাধের বাসরঘর
প্রিয়তমা আহা প্রিয়তমা।

হুহু করে হাওয়া ধুধু বালুচর
চাইলে কোথাও মেলে না জল
এইখানে মানুষ পশুর দোসর
তরাসে পালায় মৃগের দল
প্রিয়তমা আহা প্রিয়তমা।

এই মাঠে জোছনা প্রেতলোক বিলাসী
দুঃস্বপ্নেরে খুলে দেয় খিল
দিবালোকে জাগে হায়েনার হাসি
ন্যাকড়া মলিন দরাজ দিল
প্রিয়তমা আহা প্রিয়তমা।

জানি না কি করে নিখিল কঠিনেও
হাসিটি জাগাও মন্দমধুরে
বেঈমান কাল চরম দুর্দিনেও
স্বপ্নে ভাসাও পরাণ বঁধুরে।
প্রিয়তমা আহা প্রিয়তাম।

সুন্দরের সান্নিধ্যে

এমন সুখদ অনুভূতি আজ রাতে নেমে এল
শরীরে আমার— আমি যেন আমি নই
এক ঝাঁক চটুল শফরী
তরল আনন্দভরে অভ্যন্তরে লাফাচ্ছি কেবলি।
মায়াময় এ শহর দুধের সরের মত ভাসমান
রাস্তাগুলো যেন নদী, মানুষ জলের ধারা
ছায়া ছায়া অন্ধকারে বইছে সুদূরে।

যতদূর চোখে দেখি লেগে থাকে চোখ
এই রাতে আশ্চর্য শহর বুঝি ছাড়ছে নির্মোক।
অপরূপ লাগে আজ যাহা কিছু শুনি।
সত্তার চাতাল জুড়ে লক্ষ লক্ষ কিন্নরের ধ্বনি বাজে
প্রতি রোমকূপে মোর রোমাঞ্চিত আনন্দ অঙ্কুর,
ঘাসের শিশুর মত অপলক জেগে থাকে
হিমানী জ্যোস্নায়।

এমন নিটোল রাত আসে নাকি কাহারো জীবনে
শোলের পোনার মত সোনা রঙ কামনার ঝাঁক
অন্তরের শান্ত হ্রদে কেমন নিশ্চিন্তে করে কেলি
এই রাত যেন শান্ত ছোট্ট জলাশয়
বেবাক জীবনও বুঝি এরকম ঘনীভূত
সংশয় সংঘাতহীন, ভূত বর্তমান নেই
শুধুই হৃদয় আছে— হৃদয়ে আকাঙ্ক্ষা আছে
আর আছে আকাঙ্ক্ষার বেগ
মনে মনে চাইলেই সব পাওয়া যায়।
যদি ডাকি মৃদুস্বরে
নীরবে প্রেয়সী এসে
দাঁড়াবে শিয়রে
খাটের বাজুতে হাত
হাতে রুলী,
কানে দুল
আননে পুলক।

সর্ব অঙ্গে সঞ্চারিত প্রেমের লাবণী
অনুরাগে যদি তার হাতে হাত রাখি
প্রতি স্পর্শে কম্পান্বিত হবে বর তনু
এত সুখ বল আমি রাখব কোথায়।

পথ

পথকেই আজীবন বন্ধু বলে জানি
দ্রুত পায়ে অবিরাম শশকের বেগে
পথ চলি সঙ্গীহীন জলের আবেগে
সিগন্যালের মত জ্বলে বুকে হাতছানি।

চিকন রেখায় পথ জীবনের অস্পষ্টতা ঘেঁষে
ম্যাপের দাগের মত দিক হতে দিকে
ছুটে গেছে কোন্ লোকে ঠিকে কি বেঠিকে
কি জানি— জটিল পথ ঘোলা চোখে হাসে।

বোধ—১

হ্যালমেট পরা গ্যারিলার মত
বুনো আঁধারে লাফিয়ে ওঠে
ইচ্ছা আমার স্বেচ্ছা সেনা
অসম্ভবের প্রাসাদ লোটে।
স্বপ্নেরা সব রূপোলি ইলিশ
পদ্মা-জলের কাজল ধারায়
জোছনা প্লাবিত নিতল গাঙে
সোনালি বালুর চর খুঁজে যায়।

বুকের ভেতর মোমের প্রদীপ
অপরূপার চোখের আলো
কি যেন ধেয়ায় বুঝিনে হায়
চাঁদবদন কি চুলের কালো!

বোধ—২

এই শ্যামল কোমল তৃণ, শিহরিত লতা
জীনের জীবন থেকে মানুষের সাজানো সংসারে
যেন অদৃশ্য রোদের ছটা
অক্ষৌহিনী প্রাণকণা চরে
নানান গহন তত্ত্ব অন্ধকার সৃজনের প্রায় গুপ্তকথা
আমার চেতনলোকে কি সুখে মর্মরে।

কি করে বোঝাব আমি এইসব বাক্যবান জীবে
জীবন সংক্ষিপ্ত জামা নয়, আকাশের ধার থেকে
নক্ষত্র অবধি জীবনের ব্যাপক বিস্তার।
ধাতব চেতনাময় সুসভ্য সমাজে, কি করে বোঝাব আমি
নিসর্গ সান্নিধ্যে এলে
মৌনতার শিরাজালে অপূর্ব বাঁশরী
চরাচর ভেদ করে জাগে।

সমর্পিত কণ্ঠে যদি বলি, কেউ কি আমাকে দেবে
সন্তের সম্মান— আকাশে নক্ষত্র দেখে নক্ষত্রের মতন
না হয়ে পারিনি আমি। নদীতীরে বসে তার
ঢেউয়ের কাঁপন বেজেছে আমার বুকে বেদনার মত—
ঘাসের হরিৎ রসে ছেয়েছে হৃদয়।

বোধ—৩

কাউকে দিইনে জন্ম
প্রতিদিনে প্রতিক্ষণে
নিঃশ্বাসের প্রতিটি নিঃস্বনে
আমি নিজে জন্ম লই;
নব জাতকের মত নির্মল আবেগে
ছুঁড়ে দেই নিঃশঙ্ক রোদন ধ্বনি
স্পষ্টত জানিনে কিছু
কাহার স্নেহের অঙ্গীকারে।

যতটুকু পরিচিতি গতকাল ছিল
গোধূলির যে আলোক প্রাণ ছুঁয়েছিল

অদ্য দিন দ্বিপ্রহরে
নিহত প্রাণীর মত লুটোয় রোদ্দুরে!

হিতৈষী বান্ধবজন করে কানাকানি
আমার বলার নেই
নির্বিকল্প শুনে যাই শুধু—
দ্রুপদীর শাড়ির মত প্রতিদিন দীর্ঘ হয়
গাল-গল্প তিরস্কার লোকের রটনা
কি হবে ওসব শুনে শান্ত হও মন
স্থিরতর চোখে দেখো দুর্গম গহন।

বোধ—৪

আশ্চর্য ভাল লাগছে আমার এই কান্তিমান
প্রভাত। মনের ভেতর পূর্ব জন্মের বেদনার মত
ক্ষণে ক্ষণে ঝিলিক দিচ্ছে স্বপ্নের আভা।

বিশাল আকাশে অবারিত মুক্তি, বড় বড় মেঘ
দক্ষিণ সমুদ্রের দিকে ছুটে চলেছে...আকাশ গাঙের
দৃষ্টিশোভন চিত্রলেখা। তরুশীর্ষে শিশু রোদের
সোনালি ফোয়ারা, জলের মত তরল আলো
সূর্যের কলস উপচে ধারায় ধারায় বেরিয়ে আসছে।

ঘাসের প্রাণে কোমল গভীর শিহরণ, পাখি
অবাক কথা কয়, প্রজাপতির পাখনায় গাঢ় রঙের
প্রলেপ, ফড়িঙের চোখে ক্ষুদে নক্ষত্রের দীপ্তি।

আমার চোখের সামনে ভাপিয়ে ওঠছে— বেবাক জগত;
বড়ই মসৃণ সুরে আকাশ নিসর্গ ব্যেপে যেন
কোন গুণীজন অপার্থিব বেহালা বাজায়।

আজ আমি সম্পূর্ণ নির্ভার, এই পৃথিবী যেন
আত্মীয় বাড়ি, ক'দিন বেড়াতে এসেছি, চিনি চিনি
মনে হয়, তবু ঠিক চিনে ওঠতে পারিনি— এর গলি ঘুঁজি
অন্ধকারের জমাট রহস্য, প্রাণ পাতালের ক্ষুধা

চোর কুঠুরীর নির্মম ডাকাত।
আজ আমি পাখির মত স্বাধীনতা ফিরে পেয়েছি
ডানায় আমার দুর্নিরীক্ষ গতি, মন উষ্ণতায় ছেয়ে গেছে
ভোরের রাঙা আলোর স্পর্শে ঠিক সেতারের মত
বেজে বেজে ওঠছি আমি।

কারা যেন এই পৃথিবীর রত্নভাণ্ডার লুট করে
সমস্ত মণি-কাঞ্চন কাঁচা আলোর ঢলাঢল লাবণী স্রোতে
গুলিয়ে দিয়েছে। আলোর স্পন্দমান কণিকার
নিপুণ ঝঙ্কার বাতাসের শরীরে থরথর প্রেমের
প্রথম স্পর্শের মত কাঁপছে।

নিজের ভেতরে টের পাচ্ছি আমার মস্তক
হাওয়া ঠেলে উর্ধ্বদিকে কাঞ্চনজঙ্ঘার শিখরের
মত ওঠছে, আর ভোরের আলোক এলানো
কেশগুচ্ছে খেলা করছে। আপন মহত্ত্বের
ঔজ্জ্বল্যে তুষার ঢাকা ধবল গিরিশৃঙ্গের
মত ঝলমল করছি আমি।

বোধ—৫

জাল পেতেছি কালের স্রোতে
কিসের আমার ভয়
ইচ্ছে আমার হীরের ছুরি
ঝিকিয়ে জেগে রয়।

হাত রেখেছি কালের শিরায়
মন রেখেছি মনে
বন্ধু যেজন প্রেম দিয়েছি
কান দিয়েছি গানে।

বীর্য আমার রসে রাঙায়
দুঃসময়ের আঁশ
মধ্যদিনের আগুন ভরা
আমার দীর্ঘশ্বাস।

সাহস আমার অন্ধকারে
রক্ত-উষার দিশা
লাল মোরগের আজান যেমন
হঠাৎ কাটায় নিশা।

ঠাঁই দিয়েছি বুকের তলায়
অগ্নিগিরির লাভা
তরল তরুণ দুঃখের সোনায়
মন গলানো আভা।

নাম রেখেছি সেতার আমার
দুঃখ জাগে ধ্বনি
ডাক দিয়ে যাই কালের কুক্কুট
আর কি আমি জানি।

এই শহরে বোবার মত
ঝুলছে নীরবতা
বুকের নদীর ঢেউয়ে জাগে
মাছের মত কথা।

প্রাণের ভেতরে শেকড় ছড়ায়
দিগ্বিজয়ী প্রাণ
শোণিত-কণায় কান্না এলায়
ভীষণ অভিমান।

আষাঢ়স্য প্রথম দিবস

আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে
পৃথিবীর প্রকাশিত অলস আঁচল
বিন্দু বিন্দু বর্ষা মেঘে দুলে ওঠে
হাস্যমুখি লাস্যময়ী নদী কলকল
পিতৃগৃহ প্রত্যাগতা তরুণীর চক্ষুয়ে
বয়ে যায় নীলিমার নীল অন্তঃপুরে।

রুদ্ধ বাতায়ন ঠেলে দূরে বহুদূরে
অসংবৃত হৃদয়ের প্রগলভ কথা

উড়ে যায় নামহীন কোন্ অলকায়।
আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে
হৃদয় যাচক হয়ে হৃদয়ের দেশে
যা চেয়েছে যা পেয়েছে
রাঙা শতদল হয়ে ফোটে আহা ফোটে
বিগত কথারা সব কথা নয় যেন
স্মৃতির নির্বাক বৃন্তে প্রস্ফুটিত ফুল।

আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে
মনের গহন কোণে বিহ্বল রাগিনী
সুরে সুরে কারে যেন ডাকে
কোন কেশবতী কন্যা বুঝি
ধূসর বর্ষণভরা সন্ধ্যার আকাশে
পেলব গহন কালো লুটিয়ে আবেশে
নরম চিকন কেশে ঝরে আহা ঝরে
অবগাহনের স্বচ্ছ তরল সলিল।

আমার হৃদয়ে সখী
আছে কি পাঁজর!
ভুলে যাই, ভুলে যাই
আমি যেন আমি নই
আমি যেন কোন এক রাজার কুমার
হারিয়েছি মন্বন্তরে হীরের মুকুট
তাই বুঝি শক্রপুর অচেনা শহরে
অতন্দ্র-প্রহর গুনি
আর গুনি ঘন ঘন ডাকছে দামিনী
আর্দ্র বাতাসে ভেসে
বহুদূর হতে আসে
বিরহিনী যক্ষিণীর করুণ নিঃশ্বাস
আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে।

দুঃখের দিনের দোহা

[প্রথম প্রকাশ : ১৯৭৫]

উৎসর্গ

"মুনিগণ ধ্যান ভাঙি দেয় পদে তপস্যার ফল"
তোমাকে

গ্রন্থটির নামকরণের জন্য প্রিয় সুহৃদ কবি আবুল হাসান এবং
কবি নির্মলেন্দু গুণের কাছে ঋণী।

মাত্র একজন

একজন মানুষের বড় প্রয়োজন
যার স্নেহ দৃষ্টিমুখে
হৃদয়ের এই সব আশ্চর্য বঙ্কার
আমার কবিতারাজি
শব্দে শব্দে স্পন্দনিত প্রাণ
লোহিত রক্তের গাড়ে কেঁপে ওঠা
যৌবনের গান
মূর্ত হবে মমতায়
আমার অন্তরচেরা বেদনার
এইসব কোমল সন্তান।
আমার ভাবনা-রেখা, অর্ধোচ্চার ধ্বনি
জন্ম দেবে কারো প্রাণে শান্ত অনুরাগ
যেন মসৃণ প্রস্তর বক্ষে সুবর্ণের দাগ।

কৈফিয়ত

পাছে লোকে কবি বলে
এই ভয়ে
বহুদিন কবিতা লিখিনি।
উহারা অকর্মা জীব
লাগে না সংসারে কাজে
অনর্থক বাড়ায় ঝামেলা।
ভীষণ একরোখা চিত্ত
গ্রানিটের মতন কঠিন,
জেগে থাকে নিশিদিন
আকাশের স্তবে কাটে বেলা।
কী আস্পর্ধা,
সদর্পে ঘোষণা করে
গোধূলি গেলাস ভরে
নীলিমাকে করবে নাকি পান।

কুপথ্যে অরুচি নেই
মজে থাকে নেশা ভাঙে
চঞ্চল মেজাজ
ঠিক নেই কখন কি করে।
কবিদের ঘর নেই
ঘরেতে ঘরণী নেই
নড়বড়ে তক্তপোষে চামচিকা উড়ে।

সমাজ করুণা করে,
কেউ কেউ কখনো-সখনো
আহ্লাদে বাজিয়ে পিঠ
দন্তপাটি ব্যক্ত করে বলে
বাহা বাহা বেশ বেশ
এই তো লিখেছ তুমি
আনকোরা একখানি উজ্জ্বল সনেট।
ফিনফিনে প্রশংসা শুনে
চঞ্চলিত প্রাণ
অথবা নিন্দার হুলে
হৃদয়ের বিরস সংগীত
যেন ঝরে প্রান্তরের পথহারা হাওয়া।

শব্দকে চরিয়ে বাঁচে
শব্দমন্ত্রে প্রাণ
বংশীরব শুনে নাচে যেমন সাপিনী।
নরম নারীর মত শব্দের জঙ্ঘায়
বুলোয় ব্যাকুল হাত
ডুবুরির মত ডুবে অগাধ সলিলে;
অক্লান্ত বেড়ায় খুঁজে সারা দিনমান
কোথায় শব্দের স্তন, পুঞ্জীভূত ননী
সেই আকাঙ্ক্ষিত তীর্থ তনুর গৌরব।
কোন্ গৃহে দিব্যি শুয়ে সুখে নিদ্রা যায়
জাতিস্মর অগ্নিবর্ণ শব্দের হৃদয়।

শুধুই খোঁজাই সার
অর্থহীন নিছক খ্যাপানো
দৃষ্টিতে পড়ে না ধরা পরশ পাথর।

এই ব্যথা বুকে নিয়ে কবিকুল মরে
যেন লোক লোচনের অগোচরে ঝরে
আলোলাগা একবিন্দু তরল শিশির।

ইত্যাকার পরিণতি ভেবে আমি
বহুদিন কবিতা লিখিনি।

ফাল্গুন

কি করে ফেরাই চোখ
চারদিকে ফাল্গুনের উজ্জ্বল পোস্টার
জ্বলছে তরুর শীর্ষে
বসন্তের রঙের আগুন
বাতাসে পড়ছে ফেটে
পুষ্পকণ্ঠে কোমল ঘোষণা
পাতা ঝরো, পাতা ঝরো,
বুড়ো পাতা ঝরো।

কি করে ফেরাই চোখ
শিমুল ছেড়েছে গুটি
আকাশে জ্বলছে যেন আকাশ প্রদীপ
লাল চোখে রক্ত-বর্ণ আগুনের কণা
আকাশ কাঁপছে ডরে
আকাশের গায়ে রাঙা জামা।
কি করে চুপচাপ থাকি
বেবাক নিসর্গ গায় যৌবনের গান
পাতা ঝরো, পাতা ঝরো
বুড়ো পাতা ঝরো।

কোথায় সরাবো নাক
আমের চঞ্চল বউল
দশদিকে ছুঁড়ে মারে ঘ্রাণ
ভাপানো পিঠের মত
আমাদের পৃথিবীর প্রাণ
ডানা ঝেড়ে নড়ে ওঠে

প্রাণের পাতালে রটে কম্পমান বাণী
পাতা ঝরো, পাতা ঝরো,
বুড়ো পাতা ঝরো।

কি করে বধির থাকি
শ্রবণ উঠছে নেচে
বিহঙ্গের কণ্ঠে ঝরে অপূর্ব কূজন
বাতাসে তানপুরা ধ্বনি
আলোড়িত বিলোড়িত প্রাণ
নীরবে মিলাতে চায় ধ্বনিময়তায়
এমন সুন্দর দিনে ঘরে কেবা যায়
বিদ্যুৎবরণী সুরে গর্তের বাসায়
সর্পকুল উঁচিয়েছে ফণা
জুড়েছে উদ্দামনৃত্য সুখবড়
পাতা ঝরো, পাতা ঝরো,
বুড়ো পাতা ঝরো।

কোকিল

কে আর বাজাতে পারে যৌবনের সুরেলা বাঁশরি
হে পাখি, তোমার মত, যখন রাত্রির হিম ভয়ঙ্কর
সুতীক্ষ্ম শীতল নখে ছিন্ন-ভিন্ন করে ফেলে কোমল পঞ্জর
কেমন ডাকিয়া ওঠ প্রাণ-সখা বসন্তের প্রিয়নাম ধরি।

হে পাখি, শীতার্ত রাত্রির বুক বিদ্ধ করে তোল কণ্ঠধ্বনি
শিমুলের মত লাল যৌবনের রক্তিম কামনা
বেজে যাও অবিরত চঞ্চলিত নিসর্গের বীণা
রাত্রির নিভৃত রন্ধ্রে ব্যাপ্ত কর অনুপম শাণিত রাগিণী।

হে পাখি, তোমার কণ্ঠে নিখিলের জাগর সঙ্গীত
কি আবেগে ঝরে পড়ে যখন সমস্ত অচেতন
ঘুমন্ত মৃত্যুর দুর্গে সহর্ষে উড়াও তুমি প্রাণের কেতন
জমাট আঁধার তলে ছুঁড়ে দাও কম্পমান কণ্ঠের তড়িত।

হে পাখি, তোমার শরীরে নাকি সংখ্যাহীন জখমের দাগ
শীতের নির্মম শরে সর্ব অঙ্গ জড় জড়

অবিরাম নিষ্পেষণ, হাড়-মাংস ব্যথায় পাথর
তবুও গানের স্বরে কি করে জাগিয়ে রাখ এমন নির্মল অনুরাগ।

হে পাখি, আমার হৃদয়ও এক শঙ্কাতুর গায়ক কোকিল
সুকুমার, ধরে না স্পর্শের ভার কেঁদে ওঠে প্রতিটি আঘাতে
ফুলের বসন্ত ডেকে গেয়ে ওঠে থমথমে শব্দহীন রাতে
আঁধারে ঠোকর হেনে সপ্রাণ ঝঙ্কারে খোলে জীবনের খিল।

এক সন্ধ্যা

পোষা কালো বেড়ালের মত
সন্ধ্যা এসে ধীরে
লুটোলো চরণপ্রান্তে
দেখলাম চেয়ে
ব্যস্ত নগরীর স্রোত
গাড়ি ঘোড়া ছুটন্ত মানুষ
শোনলাম
গৃহগামী বায়সের কর্কশ চিৎকার।
সন্ধ্যামণি
যখনি চোখের পরে চোখ রেখে
তুলিয়াছ ধ্বনি
খঞ্জনের পুচ্ছ প্রায় নেচেছে ধমনী।

আকাশে আবীর জ্বলে
নারকোলের পাতা কাঁপে ধীরে
নিঃসঙ্গ নক্ষত্রপুঞ্জ দীপ্তি দিল ফিরে
রজনীগন্ধার মত নত হয়ে
ম্লানমুখী রক্ত সন্ধ্যাকালে
রাখিলে কোমলদেহ আসনের কোলে
টুংটাং কুণ্ঠিত হাতে চায়ে দিলে চিনি
পলকে সেতার হল নির্জন ব্যালকনি।

সন্ধ্যার নিঃশ্বাস প্রায় পুষ্পিত বচন
এঁকে দিল গাঢ় পটে সোনালি লেখন
অকালে বৃষ্টির মত বাক্যের লাবণী
তৃপ্তির প্রশান্ত পথে হাত ধরে ধরে

নিয়ে গেল মৃদু স্রোতে গাহণের নীরে
শোণিত শিখার মত সীমন্তের টিপ
হৃদয়ের জলতলে জন্ম দিল দ্বীপ।

প্রলাপ

ঘুমিয়েছ একাকিনী বিষণ্ন বিছানে
অথবা রয়েছ জেগে?
শিথানে জ্বলছে ম্লান সকরুণ আলো
একমনে আছ রত গ্রন্থ্ অধ্যয়নে?
ভাবছ গম্ভীরে কিছু
রাঙা বুদবুদ রাশি ফাটছে অন্তরে
আমার মলিনমুখ পড়ে নাকি মনে?

হয়ত ভেঙেছে ঘুম
মাঘরাত্রে কোকিল বড় চক্রান্ত বিলাসী
নিথর নিদ্রার বুকে ছুরি হেনে তীব্র সুখী।
চকিৎ স্বপ্নের ঘোরে
দুই হাতে চোখ ঘষে যখন দেখেছ
শহর ঘুমিয়ে গেছে
আকাশ নেমেছে এসে জানালার ধারে
টাইম পিসে নিরিবিলি রেডিয়াম জ্বলে
হালকা হাওয়ার টানে কাঁপছে মশারি
নীরবে তারকাপুঞ্জ কাঁপিয়া জ্বলিছে।
চারদিকে নির্জনতা
এমন ব্যাকুল ক্ষণে
শোণিতে কি জন্মায় না প্রখর পিপাসা?
হৃদয়ের কণ্ঠ থেকে শিশিরের মত
ঝরেনি কি টুপটাপ গাঢ় শব্দরাশি
শব্দের হৃদয়ে কাঁপা ভালবাসাবাসি?

একজন

বিনিয়েছ যত্নে বেণী বেঁধেছ কবরী
অলকের তাজা পুষ্পে বনের মহিমা

চরণে আলতার দাগ মরাল ভঙ্গিমা
সন্ধ্যার সোপান বেয়ে চলেছ সুন্দরী।

গোধূলি নির্মিত তনু ওষ্ঠাধরে হাসি
স্তনগুচ্ছে কম্পমান যৌবনের শিখা
ললাটে নক্ষত্র প্রায় নাচে রক্ত লিখা
রাঙা কুয়াশার মত ঝরে রূপরাশি।

নিতম্ব নীরবে দোলে শরীরে সঙ্গীত
মধ্যদেশে আন্দোলিত মৃদঙ্গের বোল
অঙ্গে অঙ্গে অনঙ্গের জ্বালা উতরোল
দৃষ্টির প্রদীপে জ্বালো কিসের ইঙ্গিত।

একরাত

এখন গভীর রাত— ঈশ্বরের পৃথিবী শান্ত নিসর্গ নিশ্চুপ
নক্ষত্রের চোখে ঘুম, পশু-পাখি গাছ-পালা ঘুমে অচেতন
আমার নিভৃত প্রাণে নিশাচরী তুলেছ কেতন
জ্বালিয়ে দিয়েছ হু হু দাবানল এই রাতে পুড়িছে অন্তর
কি করে সুস্থির থাকি কোন্ মন্ত্রে শান্তঘূর্ণি ঝড়
টুপটাপ ঝরে পড়া পাতাছোঁয়া শিশির জানে না
শোণিতের মত লাল এ কেমন ডাকাত বেদনা
ছড়ায় সুতীক্ষ্ম দাহ সমস্ত শরীর জুড়ে জ্বলে যেন ধূপ।

এখন গভীর রাত পৃথিবী নিদ্রার ঘোরে ওলটে পালটে
ঘুমন্ত শিশুর মত, শান্ত বড় সুখাবেশমাখা সারাদেহ
ভাঙা হেমন্তের চাঁদ কৃশতনু নারী যেন দেয় ক্ষীণ স্নেহ
কনকচাঁপার বৃন্তে মাটির গোপন মধু কি আবেগে ঝরে
এসব প্রাচুর্য বৃথা বেদনার গান শুধু হৃদয়ে মর্মরে
নিশা যেন কৃষ্ণছুরি তনুমন অনুক্ষণ ফালি করে কাটে।

ভাস্কর

[শামীম শিকদারের ভাস্কর্য প্রদর্শনী দেখে]

তরল কাদার পিণ্ড অশ্রুত ভাষায়
মানুষের কানে কানে যেন কয় কথা
দৃষ্টির ব্যঞ্জনা যেন কঠিন রেখায়
ধরে রাখে সর্বক্ষণ আগুনের ফুল।

প্রাণের শাণিত স্বপ্ন মূর্ত কর পাথুরে অক্ষরে
অঙ্গে অঙ্গে লাবণ্যের জল যেন ঝরে।
বিপ্লবের রক্তবীজ বিদ্যুতের মত
নীরবে চারিয়ে দাও মুখের আদলে।
ক্রোধের প্রখর কান্তি বহ্নিমানতায়,
আনন্দে জ্বালিয়ে তোল উজ্জ্বল শিখায়।
দুঃখের জমাট রূপ ব্যক্ত কর কাঠের ফলকে
শিলীভূত প্রতিমায় ঝলকে ঝলকে এঁকে দাও প্রতিবাদ।
রঙধনু বেঁধে রেখে দৃষ্টির তারায়
ভঙ্গিতে ফুটিয়ে দাও প্রেমের গোলাপ।

নক্ষত্রের আলো ছেনে ধৌত কর বাউল বদন
আরশিনগরে খোঁজে পড়শি যেজন
সর্ব অঙ্গে বুনে দাও অমৃত পিয়াস, অঙ্গুলি আঘাতে
যেন মৃত তারে ঝরে
বাঙলার অন্তহীন দুঃখের ঝঙ্কার।
ধরে আন সেই নদী সমুদ্র বাহিনী
নারীর সন্তান স্নেহ
ধাতু কিংবা কাষ্ঠখণ্ডে লিখে রাখ
চিরন্তন সবুজ কাহিনী।
মূর্তি গড় নম্রহাতে
দুইখানি শান্ত-শুদ্ধ মন্ত্রপূত হাতে
সৃষ্টির কম্পন রেখা
বয় যেন এঁকে-বেঁকে বনের ঝরণা
পাহাড় দাঁড়ালে পথে তোল তীব্র ফণা।

মূর্তি গড় স্বপ্নিল আঙুলে
জড়ের হৃদয় থেকে নরম নিপুণ স্পর্শে

ধাত্রীমাতা, টেনে আন কান্তিমান
শিশু স্বাধীনতা
মাতৃ জরায়ন ভেঙ্গে শিল্পের বালক
দেখুক পুত্তলিপিণ্ড দিনের আলোক।

মূর্তি গড় অখণ্ড বিশ্বাসে
অহল্যা পাষাণ যেন প্রাণ পেয়ে জাগে
শিহরিত ফাল্গুনের প্রথম আবেগে
অনাদৃত বাঁকা আঁশ কাষ্ঠের কায়ায়
সরল সৌন্দর্য দাও, দাও দীপ্তিরাশি
অঙ্গে অঙ্গে পূর্ণিমার বিকশিত হাসি
স্বল্প আয়তনে দাও অনন্তের ছোঁয়া
দেখে যেন মনে হয়
স্বর্গ হতে দলে দলে দেবতারা এসে
সুকুমার করাঙুলে বাজান বাঁশরী।

মূর্তি গড় দৃঢ় প্রতিজ্ঞায়
ধাতু পাথরের বুকে
হৃদয়ের তাজা অহঙ্কার
শিল্পীত পেশীতে যেন জ্বলে ওঠে
বলীয়ান শুভ্র সৌরকর— নিপুণ
পৌরুষ গড় স্বতন্ত্র স্বাধীন
নীলিমার নীলে রাখে মস্তক উড্ডীন।

গানের পাখি

আমার গানের পাখি কোন্ ডালে বাঁধবে বাসর
গীতরিক্ত বাঙলাদেশ চারদিক হাওয়া করে হু হু
সজলতা অপগত ফাল্গুনী কোকিল কণ্ঠে ঝরে আহা উহু
যাহারা সঙ্গীতভোজী বেশিরভাগ স্বভাবে পামর।

পাখি তো শিখেছে শুধু বেপরোয়া স্বাধীন ঝঙ্কার
ক্ষেতে কিষাণের বুক আকাঙ্ক্ষায় দুলে যেত বলে
সরল আবেগে পাখি মধুকণ্ঠে সুধা দিত ঢেলে
এখন দেখছে পাখি শহরের পথে সেই কিষাণের করুণ পাঁজর।

আমার গানের পাখি কারখানার শ্রমিকেরে করেছিল মিতা
ভীষণ বাসত ভাল স্বেদ সিক্ত শরীরের দর্পিত দুলুনি
এখন শ্রমিক বস্তিতে থাকে সবন্দুক নামজাদা খুনী
পাখির গানের রাজ্যে থানা গেড়ে বসে আছে রূঢ় নৃশংসতা।

আমার গানের পাখি কণ্ঠে তুলে নিয়েছিল যৌবনের তাজা অনুরাগ
কালের কুটিল চাকা ঘোরাবার স্পর্ধা দেখে তুলত কূজন
দেখল ঝাপসা চোখে সেইসব তরুণের ঝরে গেল খুন
বাকহীন স্তব্ধ পাখি প্রাণ জুড়ে নেমে এল কালো কালো দাগ।

আমার গানের পাখি শুনেছিল বিপ্লবের অশান্ত গর্জন
লাল মেঘে ঘষা লেগে নবযুগ ফেটে বুঝি পড়ে
সেই স্বর্ণ সম্ভাবনা হঠাৎ উধাও হল নির্মম ধূসরে
বিপ্লব না যদি বাঁচে পাখিরে নিশ্চিত জানিস তোর সাক্ষাৎ মরণ।

দুঃসময়

নদীতে বইছে বেগে খরতর খরস্রোত
দুকূলে নামছে ধ্বস, অবিরত চলছে ভাঙন
ভাঙন ভাঙন শুধু চারদিকে ভাঙনের ক্ষণ।

বইছে কুটিল জল তটরেখা করে না শাসন
এই জলে পলি নেই, নেই কোন গর্ভের সঞ্চার
জাগবে না স্রোতোপথে চরের আদল।

প্রতি বর্ষে রাশি রাশি প্লাবনের জল
রেখে যায় সমতলে খরখরে বালি
ভীষণ জীবনরোধী শুষে নেয় শস্যদের প্রাণ।

দুঃসময় শিকারী বাজের মত চঞ্চু মেলে গুণছে প্রহর
গ্রামগুলো সর্বস্বান্ত বৃক্ষপত্রে জাগে আর্তস্বর
বলির পাঁঠার মত চোখ মেলে কাঁপছে শহর।

নিদারুণ পরিস্থিতি চারিদিকে মহামারী-সন্ত্রস্ত মানুষ
এই মৃত অর্ধমৃত দেশে শুধু কথার ফানুস
রঙিন প্ল্যাকার্ড যেন অহরহ জ্বলছে সুন্দর।

অবন্ধু বন্ধুর বেশে প্রতিদিন কত রঙ্গ করে
প্রাচীন ভাঁড়ের দল অধুনার নাটমঞ্চে
টেরিকাটা কুশীলব সেজে, অশ্লীল ধ্বনির ঝড়
শব্দের তাণ্ডব ইঙ্গিতে জাগিয়ে দেয় যখনি তখনি
ইহাদের চেনা তাল পরিচয়ে হালাকু বাহিনী।

কোন নারীকে

ইচ্ছে করে তোমাকে সুন্দর করে লিখি কবিতায়
হে নারী পুষ্পিত লতা দোলা দাও বসন্ত বাতাসে
শোণিত উতলা কর শ্রী অঙ্গের চঞ্চল পরশে
বড় সাধ তনুর তনিমাখানি বেঁধে রাখি কঠিন শিলায়।

হে নারী সুন্দরীতমা ইচ্ছে করে কণ্ঠে নিই তুলে
হৃদয় উজাড় করে শব্দ ছেনে গান রচি নিশিদিন
অক্লান্ত বুলবুল যেন সারাবেলা বিরামবিহীন
গেয়ে যাই স্তবগীতি মুক্তকণ্ঠে সবকিছু ভুলে।

হে নারী ঘৃতের দীপ ইচ্ছে করে প্রাণের শিখায়
তোমাকে জ্বালিয়ে রাখি হৃদয়ের মণিদীপ ঘরে
নিশান্ত নক্ষত্রপ্রায় জ্বল জ্বল জ্বলবে অন্তরে
চাঁদ বদনের ধ্যানে কেটে যাবে গোটা রাত স্বপ্নময়তায়।

আত্মকথন

গোপন কলঙ্ক ভেবে লিখছি কবিতা
বলিবার নয় কিন্তু না বলে না পারি
ভাল বল মন্দ বল একান্ত আমারই
তারি বেদনার কথা জাগে মহানন্দে
পুষ্পল কাহিনীপ্রায় সুর লয় ছন্দে
ভালবাসিয়াছি তারে অস্থিমজ্জাসহ
জানি না ধীমানজন তোমরা কি কহ
অমৃত সমান মানি এই পাপ কথা।

কলঙ্কের খনি থেকে অপযশ ছেকে
শব্দ তুলি বাক্য গাঁথি সাজাই আবেগে

কবিতার ক্ষীণতনু তাজা অনুরাগে
আম্রমুকুলের ঘ্রাণ কোকিলের ধ্বনি
তীব্র সুখে মেখে দেই প্রাণের লাবণী
হিয়ার গোপন বাঞ্ছা কালো পাপ ছেঁকে।

রবীন্দ্রানুসরণ

[কীর্তন]

প্রাণের হরিৎ কথা ভেসে আসে পথ চিনে চিনে
কালিন্দী নদের তটে শ্যামল বকুলমূলে বাজায় বাঁশরি
কোন্‌জন শ্রীমতি রাধিকার মধুমাখা প্রিয়নাম ধরি
কাহার অঙ্গের ঘ্রাণ জেগে রয় দিনমান যমুনা পুলিনে।

সুবাসিত বাণী কার মৃদুমন্দ স্রোতে ধায় উল্লসিত ধারা
সোনার শরীর ভাসে শরীরী হৃদয় ভাসে ফুটন্ত চম্পক
কম্প্র পায়ে অবেলায় বারে বারে আউলায় অবাধ্য অলক
সঙ্গীতে যমুনা ছুটে গোপবালা দললুটে আকুল পাগল পারা।

অল্প বয়সিনী রাধা হৃদয়ে অনেক বাধা তবু তাতে ডাকে কুঞ্জবন
ভূতলে আঁধার রাশি আয় আয় ডাকে বাঁশি ব্যথিত অন্তর
চরণে চাপিয়া চলে নুপুরে কি বোল বলে বড়ই মুখরা তার স্বর
অনুরাগ পূর্বরাগ প্রাণে প্রণয়ের দাগ ভাসে যেন সোনার স্বপন।

পড়শি কি কথা কয় কানাঘুষা প্রকাশয় লোকে লোকে কানাকানি
কালো কলঙ্কের হার লাগে না যে গুরুভার প্রেমপন্থ জটিল কঠিন
সকল তত্ত্বের সার গাঢ় প্রণয়ের ধার সুমসৃণ করুণ রঙিন
কীর্তনের সুরে সুরে বেদনার্ত এ দুপুরে ভাসে সেই ফুল্ল হাতছানি।

সে

বাঁধাকপির ডিমের নাহান গোল
দেখেছি তার পেলব কোমল মুখ
রৌদ্র লাগা শিশির কণার বুক
চাঁদির মত চমকরত গাল দুখানির টৌল।

কালো শিখায় যুগল মানিক চোখ
স্নিগ্ধরেখায় ভরিয়ে দিল আলো
নীরদবরণ মেঘের ফাঁকে বিজুলি চমকালো
জাগিয়ে দিল বুকের তলে স্বপ্ন লোকের শোক।

দীঘল কেশ তুঙ্গ করা এল শিথিল খোপা
কাঁপল যেন বাঘের ভীষণ হৃদয়
বিজন রাতে বনের পথে জমকালো একভয়
ঘাড়ের পিছে দোল-দোলানো কালো চাঁপার খোপা।

বুকের ওপর শয়নরত কবুতরের ছানা
পালক বিহীন উষ্ণ ওমের আদর ভরা কায়া
স্তব্ধ নিথর জ্যোস্নালোকে হেলানো দুই ছায়া
চীনাংশুকে শঙ্কা মগন গুটিয়ে ছিল ডানা।

অঙ্গে ছিল মধুর মত অনঙ্গেরই রেশ
তরল তিমির চুঁইয়ে পড়া পূর্ণ চাঁদের প্রভা
স্নায়ু-শিরায় লোহিতবরণ তরুণ রক্তসভা
দেখল যেন স্বপ্ন হেন উর্বরা একদেশ।

নিরিবিলি

তোমাকে প্রাণের ঘরে কি করে আড়াল দিয়ে রাখি
নিরিবিলি পুষ্পপ্রায় দীর্ঘশ্বাসে ঝরে পড় তুমি
আমার চকিত স্বপ্নে আলোকিত কর মনোভূমি
কেউ দেখে এই ভয়ে উজ্জ্বল প্রাণের পট প্রাণপণে ঢাকি।

নির্জনতার স্পর্শে মূর্ত হও অনাবিল সরল সুন্দরী
আমার দৃষ্টিতে ভাসে অনুপম গণ্ডস্থল ললাট চিবুক
ভুরুর বাঁকানো রেখা কমনীয় মেধাশান্ত মুখ
ইচ্ছে করে আবেগে ডাকিয়া বসি বালিকাবয়েসী নাম ধরি।

তুমি

তুমি এলোমেলো ধ্বনিপুঞ্জে মুকুলিত সঙ্গীত সুন্দর
জোছনারাতে উচ্চারিত অমলিন আকাঙ্ক্ষার স্বর।

তুমি আধ ফোটা চাঁপা ফুলে তরল সোনার কান্তি
নিবিড় পাতার ঝোপে নিথরে ছড়ানো শান্তি।

তুমি শ্রাবণে প্লাবন বাঁধ-ভাঙ্গা জলের উল্লাস
মদালসা যামিনীর ক্লান্তিহর সজল নিশ্বাস।

তুমি বসন্ত সমাগমে মন্দ মন্দ গন্ধবহ হাওয়া
পাখ-পাখালির বিচরণ সুখ সারাবেলা গান গাওয়া।

তুমি পাহাড়ে পাথর ছোঁয়া ফটিক জলের নদী
মন-পবনের নাও পূবাল হাওয়ায় ভেসে যাওয়া নিরবধি।

তুমি উদাস দুপুরে জেগে থাকা কালো কাকচক্ষু সরোবর
রজনীর সুখস্বপ্ন দিবসের যন্ত্রণার তীব্র আর্তস্বর।

তুমি চলিষ্ণু ঝর্নার ধারা ছুটে যাও মাঠ চিরেচিরে
ঈশ্বরীর মহিমায় জেগে আছ সমস্ত অন্তরে।

তুমি লতাগুল্মে আন্দোলিত সুকুমার গতি
হৃদয়ে পদ্মের মত ফুটে থাকা ফুলের মুরতি।

তুমি শিশুহাতে গড়া কাঁচা বালুচরে ক্ষণস্থায়ী খেলাঘর
দাবদাহ ক্লিষ্ট ক্লান্ত প্রাণ জিরোবার সুশীতল অবসর।

পাহাড়ি স্মৃতি

।১।

কাঁচলং বয়
কাঁইচামতী বয়
পথ কেটে বয়

পথ বেঁধে বয়
কেটে কেটে শিলা
পাথুরে পাহাড়
পাহাড় কঠিন;

ক্ষুরধার স্রোতে
পাড়-ভাঙ্গা স্রোতে
স্রোতে বয়ে যায়
একটানা অবিরাম
কাঁচলং বয়
কাঁইচামতী বয়।

।২।

বেজেছে মাদল ডুম ডুমা ডুম
মিলেছে পাড়ার সকল কুটুম
শূকর কাটা হয়েছে শেষ
ধারায় বয়েছে তরুণ খুন।

বস্তিউজাড়

প্রাণধারণের টানে দলে দলে গ্রামীণ মানুষ
চৌদ্দ পুরুষের ভিটি লাঙলের মায়া
মাটির নিবিড় টান— শরিকী বিবাদ
গরুর মুতের ঘ্রাণ, বীর হানিফার সেই
পুঁথির জগত আর জ্যোৎস্নালোকে ভাসমান
কন্যা সোনাভান সমস্ত পেছনে রেখে
মধুতে পিঁপড়ের মত
এ শহরে ভিড় করে বেঁধে আছে নীড়।

কার ছেলে কার নাতি কে রাখে হিসেব
ট্রেনে চেপে বাসে চড়ে, লরীতে নৌকোয়
আঁকাবাঁকা হাঁটা পথে, দুর্ভিক্ষের থাবা দেখে
জুল্জুল বাঘের মত বেরহম ক্ষুধার পীড়নে
অজন্মার অত্যাচারে, বন্যার ডাকাত স্রোতে

ভেসে ভেসে পাহাড়ি আগাছা প্রায়
ভ্রষ্ট নীড় গ্রামীণ মানুষ
রসাল গল্পের মত মুগ্ধ চোখে পড়েছে শহর।

আলোকের মালা জ্বলে, রাজপথে ফুল্লমুখী
পরীদের ঝাঁক, দুপুর বিকেল কেমন মাতিয়ে রাখে
শ্রীচরণে স্পন্দমান সঙ্গীতের তান।
বাষ্প হাওয়া জল আর আসমানের চঞ্চল বিজুলি
বিনীত সেবক সেজে এ শহরে দিচ্ছে অঞ্জলি
গাড়ি ঘোড়া বেগে ধায়, কল টিপে জল
হাওয়া ঝরে হাওয়া-কলে
আঙুলের মত সুখ থোকা থোকা ঝুলছে শহরে
শহর চমৎকার।

মা-হারা সন্তান প্রায় গ্রামহীন মানুষেরা এসে
জড়ো হয় শহরের ফাঁকা মাঠে সভ্যতার কীট
বারোয়ারি প্রয়োজনে প্রাণে প্রাণে গিঠ
বেঁধে বাঁশ কাঠে গড়ে তোলে নড়বড়ে নতুন নিবাস।

মিস্ত্রি কেউ মোট বয়, রিকশা টানে
যোগালির কাজ করে অফিসে আর্দালী
এটা আনে সেটা বেচে, ছাতা মেরামত করে খায়
প্রকাণ্ড চাবির রিং ঘুরে ঘুরে ঝিমঝিম দুপুরে বাজায়,
গহনরাতের চোর, সুদক্ষ জুয়ারি ভাগ্যবান কেউ কেউ
পকেটে চালায় কাচি, বেশ্যার দালালি করে
কালো সন্ধেবেলা। সোমত্ত সধবা দল মাতারির
কাজ করে গিয়ে বাড়ি বাড়ি, রান্না করে
আবিয়েতা মেসে— মেসজীবী সাহেবেরা
অবসরে শিখে নেয় ডাগর-ডোগর প্রেমের সুমধুর পাঠ।
ধর্মভীরু আছে কেউ, হাওয়ায় অমঙ্গল দেখে দুবেলা রাঙিয়ে চোখ
ক্রুদ্ধ কণ্ঠে করে ওঠে অসার তর্জন, মিলাদ লাগায় জোরে
গোটা রাত ভোর ধর্মকণ্ঠে ঝরে একটানা অশান্ত চ্যাচানি।
মানে না বারণ তবু পাপস্রোত হু হু করে বাড়ে
যেমন নদীর জলে লেগেছে জোয়ার।
মাঝে মাঝে মারামারি চাঁটগা কিংবা নোয়াখালী
বরিশাল ফরিদপুর ইত্যাকার নামগুলো

জ্বল জ্বল জ্বলে ওঠে মানে না শাসন
একটুও আশ্চর্য নয় দুয়েকটা হয়ে যায় আচমকা খুন।

এই তো জীবনরঙ্গ কিষাণের স্বপ্নের শহর
এখানে জীবন কাটে স্বপ্নহীন, তবু আছে স্বপ্নের তলানি
রাঙা বুদবুদের মত প্রাণের গভীরতল ভেদ করে
জেগে ওঠে জীবনের অন্তহীন আকাঙ্ক্ষার ফুল,
বস্তিতেও সঙ্গীত শিহরে, বুকে বুকে ভালবাসা
জোনাকির মত ভিড় করে
নিবিড় নিদ্রার পটে ছেড়া কাঁথা ফুঁড়ে
কম্পিত নক্ষত্র-শিখা স্বপ্ন হয়ে ঝরে।

মুলিবাঁশ দিয়ে গড়া খোপ খোপ ঘরগুলো
যেন মধুচক্র, ভরে রাখে শিশুকণ্ঠ নারীর কাকলি
সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না পালাক্রমে করে লুকোচুরি
হাজার নালিশ তবু, ঘরকান্না চলে নিরিবিলি।
চারদিকে মন্বন্তর দেশ জুড়ে সেয়ানা আকাল
তেলে ঘিয়ে একদর, মৃত্যু কি জীবন ভাল
পায় না তো খুঁজে কোন তাল। বড়বেশি চোখাস্বরে
হাওয়ায় চিৎকারে ভাসে রক্তময় যুগের রোদন
বস্তিবাসী মানুষের চোখে ঘন পিচুটির মত
হতাশার গাঢ় আবরণ ক্রমে ক্রমে শক্ত হয়ে জমে।

মৃত্যু কিংবা জীবনের গন্তব্যবিহীন— এইসব গ্রামহারা মানুষের
মনে

কখনো-সখনো হানা দেয় বেপরোয়া দামাল জীবন,
চঞ্চল স্রোতের বেগে জেগে ওঠে অগণন মানুষের সারি
সম্মুখে ধাবিত হয়, বিক্ষোভে মুখিয়ে ওঠে
ঝাণ্ডা তোলে হাতে, চ্যাংড়া শোলের মত
লাফ দিয়ে প্রখ্যাত নেতার নামে করে জয়ধ্বনি—
শতবর্ষ বেঁচে থাক তুমিই ধর্মের বাপ তুমি মা জননী।
জ্বলজ্বলে তাজা স্বপ্ন রক্ত বমনের মত
উত্তাপিত কণ্ঠস্বরে বৃথা শুধু ঝরে।
শত্রুর শঠতাচক্রে বিশ্বেসকে করে বলাৎকার
মিথ্যে দেবতার স্তবে হৃদয়ের উজ্জ্বল কুসুম
ছিঁড়ে খুঁড়ে অর্ঘ্য দিয়ে— ঘরে এসে
নিরুত্তাপ নারীর শরীর জড়াজড়ি করে শুয়ে থাকে।

এইসব মানুষেরা পথে পথে ভাসন্ত শ্যাওলা
জীবনের খরস্রোতে নেহায়েত খড়কুটো মানবিক বন্ধনবিহীন
মরুতে উদ্যানকুঞ্জ ছায়াময় ঘর পাবে কই?
ঘর— সে তো অতীতের সুখস্বর্গ স্মৃতি, কদলী তরুর ঝোপ
নারকোলের হেলে পড়া ছায়া, আম কাঁঠালের বনে
নবীন ফাল্গুনে জাগা কচি কচি পল্লবের মায়া
কাকচক্ষু সরোবর মুগ্ধ চোখে আকাশ নেহারে
নদীর বঙ্কিম ধারা, বাছুরের হাম্বারব
হেমন্তে মাঠের বুকে সোনারঙ ধানের জোয়ার।
নির্বাক মৃত্তিকাতলে নিরিবিলি নিদ্রা যায়
উর্দ্ধতন চতুর্দশ পুরুষের প্রাণ, রত্নের ভাণ্ডার যেন
কোলে করে শুয়ে আছে দীনহীন সরল কবর।
ঘর নেই, তবুও ঘরের মায়া প্রাণে বিঁধে আছে সর্বক্ষণ
স্বপ্নে শোনে পিতৃপুরুষের স্বর, শোনে দেয়ার গর্জন
নদীর ছলছল স্রোত চোখে ভাসে, নতুন ধানের ঘ্রাণ
মগজের কোষে, সমীরিত মাঠ জাগে মনে
রক্তের স্পন্দনে বাজে বৃষ্টির ঝঙ্কার।
শহরের ফাঁকামাঠে বাঁশে কাঠে গড়ে তারা
ঘর নয়, ঘরের বিদ্রূপ— হাওয়ার দাপটে কাঁপে
এলোকেশী বৈশাখের ঝড়ে ছত্রখান, মাঘের দীঘল রাতে
হিমেল ভালুক ঢুকে বিঁধায় নখর
উদ্বাস্তু গ্রামের লোক বেআব্রু জীবন
বেঁধে রাখে যেইখানে অতিকষ্টে মনে করে ঘর।

ধীরে ধীরে পেকে উঠে আসন্ন সময়, একদিন
বস্তিবাসী মানুষের চোখে টুটে ঘুম, অলক্ষ্যে ওপর হতে
জরুরি হুকুম নেমে এল, হঠাও জঞ্জাল সব রাবিশের স্তূপ
নগরী নিশ্চিন্ত হোক, চাঁদের কলার মত বাড়ুক লাবণী।
কেননা সংবাদ গেছে এইসব বস্তির মজুর
ফিরিঅলা মিস্তিবাহাদুর একজোটে ফন্দি আঁটে
প্রথম সুযোগে নাকি বিস্ফোরণে ফাটাবে শহর;
নীল আসমানের থেকে অগ্নিময় বজ্র টেনে
নিষ্ঠুর নগর বক্ষে ঢালবে কহর। গ্রাম খারিজের
শোধ নেবে, সোনালি শস্যের নামে লাগাবে তাণ্ডব
বইয়ে দেবে রক্ত নদী, লালে লাল হবে রাজপথ
ক্ষেপা তরঙ্গের মত সহিংস আঘাতে

খুলে নেবে সভ্যতার ফ্যাকাশে কফন।
পাড়ায় পাড়ায় চলে প্রদীপ্ত মহড়া, কারা নাকি
নীল-নকশা দেখে, ঘুটঘুটে অন্ধকারে
শোণিতের মত লাল ফুটন্ত সকাল কারা নাকি
টেনে আনে, অমর আশার তরুচিহ্নতে
রোপন করে বজ্রাহত হৃদয়ের তলে, আঁটে হুল।
অতঃপর মেষের শিশু নখে-দন্তে হয়ে ওঠে খল
কি জানি কখন, তরুণ সিংহের মত একসঙ্গে করে বসে প্রচণ্ড
গর্জন।

চারদিকে চাপা ভয়, বাতাসে ব্যাকুল করে
তুমুল রটনা, এই বুঝি প্রকম্পনে ফেটে গেল শিলা
মাটির জমাট কান্না মুক্তি পেয়ে হয়ে গেল
বীর্যবান জীবন সঙ্গীত
ঝাঁঝরা বুকের তলে হৃদপিণ্ড বাজে যেন জয়ের দামামা।
ইত্যাকার বার্তা শুনে বুলডোজারেরা এল
নরম মাটির বুকে এঁকে দিল সুগভীর দাগ
ক্ষুব্ধ রুষ্ট লোহার গজায়, ঘুমভাঙা কুম্ভকর্ণ
অন্ধরাগ নির্মম হিংসায় ছোটে ছোটে স্নেহনীড়ে
তুলে দিল ক্ষমতার ভার
দলামোচা হয়ে ভাঙে ঘরহারা মানুষের ঘর।

অস্থিচর্মসার ন্যাংটো কালো কৌতূহলী শিশু
দেখল অবাক চোখে মানুষের আরো এক লুকোনো স্বরূপ
মারণাস্ত্রে তাক করা কালো কালো চোখ
লাজুক পাখির তুল্য নির্বাক রমণী
নিষ্প্রাণ চিত্রের মত নিথরে দাঁড়িয়ে আছে, জানে না
শুকোনো কবে অশ্রু উৎসে পানি।
বুড়োরা ঠোঁটের ফাঁকে বিড়বিড় করে উচ্চারণ
খণ্ডাতে পারে না কেউ ললাট লিখন।
অধোমুখে অপরাধী যুবাদের দল নির্বিকার সহ্য করে
বড় ব্যথা, যেন জীবন্ত ছাগল থেকে তুলে নেয় খাল।
বস্তির কুটুম সেই নির্লজ্জ কুকুর
মোটা তাজা হাড় ফেলে ঘুরে ঘুরে জুড়েছে চিৎকার।
শালিক ব্যথিত অতি ভুলে গেছে কথা
সুঠাম শিমুল তরু প্রসারিত ছায়া মেলে করে আছে চুপ

আবেগে কুসুমদল লাল অশ্রুকণা হয়ে ঝরে।
কাঁথা-বালিশের স্তূপ, হাড়ি কুড়েঘরের ভেজানো ঝাপ
খাঁচায় পোষিত পাখি, বাসন-কোসন
বালতি-মগ-হ্যারিকেন, সন্ধের চেরাগবাতি
আকাশে চক্কর দেয়া ডোরা-কাটা শান্ত কবুতর
দিশেহারা দুগ্ধবতী ছাগল জননী
দুঃখী মানুষের দুঃখে তোলে আর্তধ্বনি।

বাসাভাঙা পাখি প্রায় তাড়াখাওয়া গ্রামীণ মানুষ
কুয়াশার পথ বেয়ে কোন্‌দিকে যায়?
কম্পিত চরণ পাতে কোন্ কথা লিখে রাখে পাথুরে রাস্তায়?
জাগ্রত হৃদপিণ্ডতলে বিদ্যুৎ চমকে
সর্বহারা হৃদয়ের অগ্নিগর্ভ বাণী
হাড়ে হাড়ে বহ্নিমান কথার ফোয়ারা
সমাচ্ছন্ন অন্ধকারে কি আবেগে ফেটে পড়ে।
মমতার লেশহীন গর্বময়ী নিষ্ঠুর শহর
ক্ষমতার ক্রীড়াক্ষেত্র অবশ্য তোমাকে দেব
দরিদ্রকে ছলনার বর, আমরা যাব না গ্রামে
শিশু কি কখনো যায় মাতৃজরায়ণে?
দলিত মথিত হব হাড়ে হাড়ে পিষ্ট হব
বিষাক্ত ভীমরুল প্রায় গুপ্তঘরে
সারারাত করে রবো চুপ।
রজনী প্রভাতকালে বহির্গত হব সব
যেন ঝাঁক ঝাঁক বোমারু বিমান।
হে শহর গর্বোদ্ধত নিষ্ঠুর শহর
তোমার সঙ্কীর্ণ বক্ষে সবান্ধবে একদিন
ঢেলে দেব মারাত্মক আজব কহর
গ্রাম খারিজের শোধ নেব, সোনালি শস্যের
নামে লাগাব তাণ্ডব, বইয়ে দেব রক্তনদী
লালে লাল হবে রাজপথ, ক্ষেপাতরঙ্গের মত সহিংস আঘাতে
খুলে নেব সভ্যতার ফ্যাকাশে বল্কল।

বস্তি উজাড়ের স্বকৃত ইংরেজি অনুবাদ

The Eviction of the Shanty Town dwellers

Driven by the mad urge of livelihood.
These rural folks, throng after throng, leaving
The homesteads of forefathers,
Burning love for ploughshare,
Intense hunger for soil, family feuds
Smell of cattle urine
The ballad world of warrior Hanif,
And the tale of sonavan, the folk princes;
Leaving everything behind;
These rural folks crowd in the city
Like innumerable ants drawn towards honey.
Who cares, who is whose son or grandson
They make their way by trains, by buses,
By lorries, or through zigzag route on foot.

Because terrible famine chased them
Cruel hunger threatend them like wrath of tiger.
Drought dried them up and flood carried them away
Like jungle weeds.
The village driven people, first looked at the city
As if it is a funny folk story come to life.
Streets bathe in abundant light,
Playfull fairies move around,
Sweet music oozes out of their footsteps.
In the morning, at noon and in the afternoon.
Steam, air, water and lightning flash of the sky
Serve the city like faithful slaves.

Vehicles steer the street in speed
Water trickles out when button is pressed.
Machines produce air,
Happiness hangs here like bunch of grapes.
Ah! this is the city
And city is the abode of wonder
Village forsaken people flock together
Here in the open space of the city,,
Like motherless children, these parasites
Of civilization hasten to build their
Unstable homes, with bamboo, stick whatever they can get.
Some carry loads, some pull rickshaws
Some work as mason assistants and factory hands,
Some peddle, some deal with petty articles
Some manage by repairing old umbrellas.
Some roam the streets jingling a bunch of keys
Some steal deep in the night, some gamble
Some are really lucky, they pick pockets
Some become the pimps of prostitutes.
Women folks work in houses as domestic hands
And often cook in the bachelor messes
Where unmarried clerks have their first
Lesson in the voluptuous love.
Among them, there are God-fearers too,
Who arrange religious congregation to stop sin,
Priests shout whole night with bloodshot eyes.
But the force of sin gathers fresh momentum
like forceful tide of the river;
Often quarrels breakout
Among the people of Noakhali, Chittagong,
Either Barishal or Faridpur.
No wonder occasional murders create
Ghastly atomosphere all around.
Ah what fun of life, the city is the dreamspot of rural peasants
But peasants themselves pass the night without any shred of dream.
Even then, life has its own miracle
Deepest cravings of soul make their way
Songs murmur in the shanty town.

Love spreads its wings like fireflies in the hearts of men and women.
Under the thick quilt in deep blissful sleep
Shivering starlight throws its spell.
Bamboo made tiny huts are like honey-combs
Filled with children's-laughter and women's giggles.
Amid pain and pleasure life rotates
Suffering and worry are there
Still life continues in smooth rhythm.
Famine casts its horrible shadow
And in the whole land crisis crops up acute
Very often confusion makes inroad into their minds.
They compare, which is better : life or death.
Poignant blood stained cry of time
Vibrates ceaselessly with the movement of air
Thick layers of helplessness
Gradually darken the eyeballs of the shanty town-dwellers.
These village deprived people
Who are undestined for life or death
Sometime stir up with daring spirit.
The violent processions make the street tremble
Angry men jump out like young *shoal* fish
Banners flutter, chant slogans
'Long live the leader, who is our father and mother both.'
In their heated voice, vainly the fragments of
Bright dream are spilled out like blood vomiting,
As if they have raped their own dreams
By the crafty design of the foe.
After offering the blossoming flower of heart
As homage in the service of the false gods,
Only one business is left to them.
They embrace cold emaciated women bodies,
These people are like floating algae
Moving around the streets, devoid of any human bondage
Home? Where is home?
The symbol of peace and happiness
Oasis in the midst of desert
Ah home, the pleasure of lost Eden is echoed in that word·
Banana bushes, slanting coconut shade

Beauty of the hanging foliage of green mango and jack fruit groves
In the month of sweet Phalgoon,
Still water of tanks gaze at heaven with utmost wonder
Curved flow of river, impatient call of calves
And the golden paddy abound in the autumnal field
Within the cover of simple modest graves
Forefathers rest eternally in blissful sleep.
As if these graves are but the store houses of jewel.
In the hearts of these homeless people pangs for home
burns like fire
They hear in dreams, the voice of forefathers
And the roar of thunder Flow of river dazzles their gaze.
And in the neuron cells creep up the smell of new thrashed paddy.
Their minds become flat fields full of air.
And the sweet sound of unceasing rain beats in the very rhythm of
blood.
In the open space of city with bamboo and wood
They build the caricature of homes.
These totter as the wind strikes and in the
Month of fiery Baishak devastating storm uproots the poles and
pillars.
In the month of Magh claws of unkind cold
Pierce their skin like wild bear.
The places, where the homeless rural folks
Station their wretched existence
Pretend with much effort as the make-belief of homes.

Gradually time matures, then one morning
The shanty town-dwellers had to wake from sleep
For orders came from the authority
Remove the heaps of dirty rubbish,
So that the city feel secure and beauty
Can be enhanced like the phases of moon.
Secret reports already reached the bosses
These peddlars, coolies and the wage labourers
All in secret hatch plot to destroy the city with blast after blast
At the first chance, they are planning to snatch
Fiery thunders from blue heaven

To hurl in the heart of the cruel city like scourge.
They are planning to avenge the deprivation of village
And create havoc in the street for the claim of golden harvest.
Blood shall flow and the street shall be dyed with red,
Like the stormy rage of the sea, the battle cry shall be raised
We shall smash the pale shell of civilization with angry strikes.
Silent preparations are ahead in every nook and corner.
Report says, invisible beings write blueprint
For bringing blood red blooming morning
Plant unvanquished saplings of hope in the soil of the Crushed heart
Lambs turn in to smirt and fierce, with claws and teeth.
It is settled, all in one voice shall roar out like angry lions.
Suppressed fear reigns around
Wild rumours afloat in air
It seems, suddenly hard stone shatters with violent tremor.
Condensed wails of soil transform into life giving songs.
Pounding hearts beat like war trumpet
When reports passed
Bull dozers leaving deep imprint on soft soil
Started moving like mechanical elephants
Blind with rage and anger
Began to crush the home of homelss destitutes.
Skinny naked dirty curious children had the chance to look at
An unveiled identity of man.
With terror in heart they saw the fixed black eyes on the barrels of killing machines
Mute-women like tamed birds
Stand like still paintings
Failed to feel, when tears dried up in their eyes.
The elders mutter, none can escape the write of fate
Younger people with bowed heads undergo the process of torture
The pang is deep — deep indeed
As if they are skinning a goat alive.
The shanty town friend, shameless stray dog leaving aside
porous juicy bone makes melancholy sound.
The bird "*Shalik*" is sad stricken, forgot to sing suddenly growss quiet
In deep anguish the flowers drop as drops of red tears
Bundles of quilts, pillows utensils, hurricane and pitchers

And the evening lantern and hovering pigeon in the sky
And below the milch nunny goat
All lament in chorus for the sorrow of suffering humanity.

These rural folks are like the birds of spoilt nest
Whither thy go, by following the path of mist?
With their shaking feet what message they write on stony streets.
In their crushed hearts, with flash of lightning
And in their bones and marrows what fire of deprivation
Strives to make way in impending darkness.
Oh proud cruel city
The theater of power game and devoid of human feeling
To thee we shall return the prize of deprivation to the poor
Again we shall not go back to the village
Does the child over return to mother's womb?
We shall be tortured and be molested
Our bones and marrows shall be crushed but we shall keep alert whole night.
At day break, we shall burst forth like the squadrons of bombardment planes.
Oh city, proud cruel city
In your narrow cruel heart one day we shall hurl unprecedented scourge
And shall avenge the deprivation of village
Create havoc in the name of golden crop.
Blood shall flow and the streets shall be dyed with red
Like the stormy rage of the sea, we shall
Smash the pale shell of civilization.

The poem was written in 1975 when Nilkhet *Basty* -(Slum) was evicted by *Rakshi Bahini-(para military troop)* of the then Government of the People's Republic of Bangladesh.

একটি প্রবীণ বটের কাছে প্রার্থনা

[প্রথম প্রকাশ : ১৯৭৭]

উৎসর্গ

বেগম হুসনে আরা হক

এই কাব্য-তরুটির অঙ্কুরণ মঞ্জুরণে একাধিক নেপথ্য যোগাযোগ বর্তমান। প্রকাশ না করলে স্বস্তি পাব না বলেই কথা ক'টি বিবৃত করছি। আমাদের দেশের অনন্য প্রতিভাশালী চিত্রশিল্পী এস. এম. সুলতানের 'নিসর্গ ও মানুষ' চিত্রাবলির প্রদর্শনী দেখে আমি বিস্ময়ে অভিভূত হই। সেই সময়ে আমার মনে হয়েছিল এই চিত্রসমূহের চাইতে সুন্দর এবং প্রাণসমৃদ্ধ কোন বস্তু কোথাও দেখিনি। আর শিল্পীকে মনে হয়েছিল ইউরোপের রেনেসাঁ চিত্রকরদের মত এক দেদীপ্যমান পুরুষ। বলা বাহুল্য, এই দুই বোধ অদ্যাবধি আমার মনে সক্রিয়। এই প্রাণসুন্দর শিল্পী প্রকৃতি এবং প্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত সবকিছু তুলির টানে এমন প্রাণবান করে সৃজন করেছেন যে, তার রেশ আমার মনের ভেতর একটা গভীর ও দীর্ঘকালস্থায়ী দোলার সঞ্চার করে। একটা আবেগ আমার মধ্যে জন্মলাভ করে নিরুদ্ধ আক্রোশে গর্জাতে থাকে অনেকদিন। চিত্তের এই শান্তিনাশা বস্তুটিকে নিয়ে কি করব দীর্ঘদিন মনস্থির করতে পারিনি। মাসখানেক যেতে না যেতেই অনুভব করলাম স্বগ্রামের শৈশবের বুড়ো বটগাছটি উন্মথিত আবেগরাশি একটু একটু পান করে বুকের ভেতর শেকড় ছড়াচ্ছে, ডালপালা বিস্তার করছে। এই প্রবীণ তরুর সম্ভ্রম বিনষ্ট করব এই আশঙ্কায় তখনো তার ছন্দিত প্রকাশ ঘটাতে সাহসী হইনি। সেই সময়ে আমি জার্মান কবি গ্যোতের অমর কাব্যনাটক 'ফাউস্টে'র বাংলা অনুবাদে রত ছিলাম। এই অনুবাদ করার কালেই আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটে সে বস্তুর, যার প্রসাদে পঙ্গুও গিরি লঙ্ঘন করতে সাহসী হয়, গুণবানজন যার নাম রেখেছেন প্রেরণা।

শরৎ হেমন্ত এই দু'ঋতুতে অনেকখানি লেখার পর শীতে কলম আপনাআপনি থেমে গিয়েছে। শত চেষ্টা করেও একটি পংক্তি রচনা করতে পারিনি। মানবমনের ওপর প্রকৃতির প্রভাব তো সর্ববাদীসম্মত। মাঘ মাসের একরাতের শেষের দিকে কোকিলের কূজন শুনে বাকি অংশ শেষ করতে পারব এমন একটা বিশ্বাস মনের মধ্যে ঘনিয়ে ওঠে এবং পাঁচ সাতদিনের মধ্যেই লেখাটি শেষ করে ফেলি। প্রকৃতির ওপর বিশ্বাস রাখলে কাউকে যে ঠকতে হয় না, এই প্রতীতি মনে আরো গাঢ়মূল হয়েছে। বাংলা একাডেমীর সংকলন বিভাগের সহকারী অফিসার নুরুল ইসলাম একুশে ফেব্রুয়ারি সংকলনে প্রকাশ করার জন্য অর্ধেক লেখা প্রেসে পাঠিয়ে রচনাটি শেষ করার জন্য ঘনীভূত চাপ তৈরি করেছেন, তার জন্য এই হৃদয়বান তরুণটিকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

আহমদ ছফা

প্রবীণ বয়সী বট
তরুণ সমাজে তুমি
অতিকায় জটাধারী
রবীন্দ্রঠাকুর;
বাড়িয়ে ব্যাকুল গ্রীবা
নীলিমার জানালায় রেখেছ চিবুক
পাতায় পাতায় বাজে
যুগান্তের রোমাঞ্চিত সুর।
ঝিলিমিলি নীলে
আলোক নিখিলে
পত্রপুঞ্জ পুচ্ছ নাড়ে
দুরন্ত সাঁতার কাটে আকাশে উড্ডীন মীন
সাঁই সাঁই সাঁই
বৃন্তে বৃন্তে গাহে পাখি
ছুটে চলা সময়ের গান
দোদুল ঝুরিতে বাজে
কালের শানাই।
গ্রামের সীমান্ত প্রান্তে আঁকাবাঁকা স্রোতে
কালো জল ক্লান্তি ভরা নিথর চরণে
চুপি চুপি অতি ধীরে হাঁটে যেইখানে,
রোগা রোগা দিনগুলো ঝাঁ ঝাঁ রোদে নীরবে ঝিমায়।
যেইখানে সময়ের ধেনু
বছরে বছরে শীর্ণকান্তি বছর বিয়ায়
হস্তীর বিষ্ঠার মত স্তূপাকার শতেক বছর
নিদ্রা যায় অচেতন মাটির ওপর।
যেইখানে ইতিহাস করুণ গোঙায়
কুয়াশার মত এসে
চুপিসারে ঘুমন্ত অতীত
অতর্কিতের আগামীরে খুন করে যায়।
অবিরাম ভাঙাগড়া চলেছে যে নাটে
কেবল দুখের পণ্য বিকোয় যে হাটে

যেখানে কচিৎ ঘটে প্রাণ উন্মীলন
টল টল শিশির যেন ঝরন্ত জীবন
যেখানে হাওয়ায় ভাসে ভাঙনের গান
পত্র পতনের শব্দে ধ্বংসের বাঁশরি বাজে
মুখবোজা ছায়া ঠেলে মৃত্যু দেয় শীষ
মহামারী নিত্য করে নাম সংকীর্তন,
গোলগাল থালার মত
আকাশ পৃথিবী মেশা এক চিলতে দিগ্বলয়ে
যুগান্তের বার্তাবহ
প্রবীণ মনীষীবৃক্ষ বৃদ্ধ পিতামহ
জানি না কেমন করে
ধরে আছ এত প্রাণ উদ্ভিদ শরীরে
ভীষণ ঝঞ্ঝায় যুঝে
বিশাল আকাশে মুখ গুঁজে
পাতালে প্রবেশপথ খুঁজে
নীলিমার খড়খড়িতে প্রাণের ফোয়ারা
কি করে জাগিয়ে রাখ
ছলকে ছলকে বহে সবুজের ধারা।
পদতলে প্রসারিত প্রশান্ত ছায়ায়
অতীত মহিমা এসে দু'দণ্ড জিরায়।
ফড়িঙের মত চরে হরিৎ জীবন।
ধাবমান ক্লান্তিহীন প্রাণের বাহিনী
দলে দলে সবুজের সেনা
আকাশের চরে দেয় হানা।
ডালেমূলে পত্রপুঞ্জে পল্লব মুকুলে
প্রাণের কেতনরাশি ওড়ে দুলে দুলে;
নৃপতির মহিমায় মস্তকে মুকুট
ধারণ করেছ তুমি
অঙ্গে অঙ্গে অভ্রলেখা
পিতামহ বনস্পতি সাক্ষী শতাব্দীর।

আমাকে স্মরণে রেখ
মাননীয় বৃদ্ধ তরুবর।
আমারে হৃদয়ে রেখ, মনে পড়ে?
ভীষণ দরদ ভরা মুগ্ধ শিশু এক

তোমায় দীঘল শাখা কার্তিকের ঝড়ে
ভেঙে গেলে চুপে চুপে কেঁদেছে অনেক।

মনে পড়ে ছিপছিপে চঞ্চল কিশোর
খুঁজেছে টিয়ার ছানা ডালের খোড়লে
হাঁসের পাখার মত তুলতুলে ভোর
দেখেছে চরণ রাখে নদীর কোমলে।

মনে পড়ে? এতটুকু হাঁট ফেরা ছেলে
মাথায় ধরে না বোঝা, ভাতঘুম রাতে
সুরা এখলাস্ মুখে বড় রাস্তা ফেলে
নেমেছে ভূতের ভয়ে বিলচেরা পথে।

মনে পড়ে? একজোড়া বালক-বালিকা
নিঝুম দুপুরবেলা সাজাল বাসর
তেলতেলে লাল ফলে গাঁথিল মালিকা
একমনে খেলা করে বধূ আর বর।

মনে পড়ে? সেদিনের রাঙা বেনারসি
কিশোরী পাল্কিতে চড়ে কিশোর নীরব
বজ্রাহত শিশুতরু ধীরে বাজে বাঁশি
না বলা ব্যথায় কাঁদে আহত পল্লব।

মনে পড়ে? অসময়ে হল পিতৃহারা
জনক জান্নাতে যায় পড়শিরা এসে
কাফন পরালো লাশে, দুখে আত্মহারা
কে বালক নয়নের জলে যায় ভেসে।

ছেলেটি প্রবাসে যায় পেছনে জননী
তোমার পাতার ফাঁকে চোখ মেলে চায়
মনে পড়ে তার মুখ! বড় একাকিনী
লখিন্দর সোনা যার কোল ছেড়ে যায়।

মনে পড়ে? মনে পড়ে? বৃদ্ধ তরুবর
কে যুবক জননীর প্রিয়মৃত মুখ।
দেখেছে নিথর চোখে শান্ত নিরুত্তর
অধম সে ভাগ্যহত শোকার্ত অমুক।

প্রভাত বেলায় তরুর মেলায়
পাতায় পাতায় আলোর নাচন
উদাস দুপুরে জলের নূপুরে
শুনেছি কেমন মধুর মাতন।

একেলা বিজনে শাখার গহনে
বিরহী বিহগ তুলেছে কূজন
দেখেছে গোধূলি সিঁদুর সোনালি
অবাক নয়নে আমরা দু'জন।

তরল তিমিরে রাতের নিবিড়ে
তারায় তারায় বেজেছে ঘুঙুর
নিথর গামিনী নিঝুম যামিনী
বাঁশিতে ফুকারে তুলছে কি সুর।

ফাগুনে এমন ধরেছে বরণ
দোদুল শাখায় দুলেছে হরিৎ
কঠিন শিকড়ে ছুটেছে কি করে
তরল ধারার সরল শোণিত।

জটা অরণ্য অতি বরেণ্য
শিহর জাগিয়ে শতেক নাগিনী
নেমেছে মাটিতে ললিত গতিতে
বনস্পতির বয়েসী রাগিণী।

যখন ফাগুনে ফুলের আগুনে
সেজেছে নিখিল বন ও বনানী
উতলা পবনে ভেসেছে সঘনে
কোকিল পহেলা খুঁজছে জবানি।

চৈত্র দিবসে বিহগ হরষে
শাখায় করেছে ফলের আহার
ঝাঁকড়া মাথাতে দখিনা দোলাতে
দেখেছি তোমার জটার বাহার।

মরেছে চাঁদিনী গভীর যামিনী
তারার চেরাগে ভরেছে পুকুর

গ্রামীণ মানুষ নিশীথে বেহুঁশ
প্রহরা মগন পাড়ার কুকুর।

কিষাণ কুটিরে হাতের মুঠিরে
পাকিয়ে শিশুরা তুলেছে কাঁদন
আঁধার পাথারে নীরব সাঁতারে
বাণীরা খুঁজেছে ভাষার বাঁধন।

আপন কুলায়ে পাখাটি বুলায়ে
বায়স করেছে নিশিরে জরিপ
রাতের কপাটে দিনের ললাটে
আকাশে ফুটেছে তারার প্রদীপ।

বোশেখে ধরণী ভীষণ বরণী
তাতানো বাতাসে ফুটন্ত ফুল্কি
আকাশ ভূতলে অগ্নি উথলে
খরার ছুরিতে এঁকেছে উল্কি।

মেঘের ডমরু বাজে গুরু গুরু
ঝিলিকে ঝলেছে বাঁকানো বিজুলি
যমের সাঙাত আকাশ ডাকাত
অগ্নিলোচনে তাকানো ত্রিশূলি।

ঝড়ের কেশরে মড়মড় স্বরে
তোমার শাখায় বেজেছে বাজন
দেখেছি নিরখে লটকে ঝটকে
বয়সী জটার মরমী নাচন।

জ্যৈষ্ঠ প্রহরে মেঘের চিকুরে
কালোতে লেগেছে আলোর চমক
পাতায় খোপাতে শ্যামল শোভাতে
দিঠিতে আমার নাচেনি পলক।

নবীন মেঘের প্রথম জলের
ধারায় ভেসেছে উজানী মাগুর
বিজুলি ঝিলিকে চিলিক মিলিকে
দেবতা হেঁকেছে গুড় গুড় গুড়।

আষাঢ়ে বরষা নেমেছে সহসা
হাত-পা ছুঁড়েছে জলের শিশুরা
শ্রাবণ ধ্বনিতে পেয়েছি শুনিতে
গহন গীতিকা পরাণ বিধুরা।

শরতে হাসিটি ভরেছে বাঁশিটি
তরুরা পরেছে নতুন কামিজ
মাঠের শিথানে কাশের বিতানে
দেখেছি সফেদ ফুলের শেমিজ।

ঢলন্ত আভাতে হেমন্ত প্রাতে
কনকবরণ মাঠের তনিমা
ব্যাকুল নয়নে যেমন স্বপনে
দেখেছি তোমার বিরাট মহিমা।

ধানের সাগরে সোনালি জোয়ারে
ভেসেছে যখন গাঁয়ের কিষাণ
ঝুড়িটি নাড়িয়ে মাথাটি বাড়িয়ে
গেয়েছ মধুরে গভীর কি গান।

শীতের পরশে প্রবীণ বরষে
শরীর ঢেকেছ কুয়াশা চাদরে
অধিক বয়সী প্রবীণ তপসী
জপের মালাটি ধরেছ আদরে।

দেখেছি অনেক কখনো ক্ষণেক
কখনো ভরিয়ে সারাটি নয়ন
আবেশে মেতেছি হৃদয়ে গেঁথেছি
মরমে মরমে করেছি চয়ন।

ভাবনা দুলেছে জোয়ার ফুলেছে
স্মৃতিরে কাঁদায় লিলুয়া বাতাস
কালেরি ধারায় সকলি হারায়
পারিনে হারাতে তোমার আকাশ।

আমি তোমার পাঠশালাতে
পাঠ নিয়েছি শব্দ-ধ্বনির

রঙ লেগেছে চোখের তারায়
স্বাদ পেয়েছি কথার ননীর।

মর্মরিয়ে দখিন হাওয়া
পাতায় পাতায় ফোটায় বাণী
পরাণ মন উদাস করা
তরুর ভাষার অর্থ জানি।

চৈত-ফাগুনে শাখার ফাঁকে
কোকিল যখন মুখ খুলেছে
দোলদোলানো ঝুরির মত
বুকের ভেতর সুখ দুলেছে।

খেলে বেড়ায় নদীর জলে
কুলু কুলু ধ্বনির পোনা
চাষ করেছি মাছের মত
হাজার হাজার যায় না গোনা।

শ্যামল চিকন দূর্বাদলে
টলমলানো শিশির কণা
গলার ভেতর ঢেউ খেলিয়ে
উসকে গেছে গানের ফণা।

নবীন হাওয়ার আমেজ মেখে
গর্ত থেকে সহুঙ্কারে
বেরিয়ে এল কালনাগিনী
আওয়াজটিও প্রাণের তারে

ঠিক ধরেছি আশীবিষের
হনন ভরা মুখের বচন
গোপন ঘরে ঠাঁই দিয়েছি
শব্দ-ধ্বনির অরূপ রতন।

ঋতুরাজের রংমহলে
পাখপাখালির কল কূজনে
চারিয়ে গেছে গানের বিছন
প্রাণের মাটির এই ভুবনে।

ধুলোর সাদা ওড়না পরে
চৈত্র মাসের বউ টুবানী
চটুল পায়ে নাচ করেছে
জানি আমি সঠিক জানি।

এই চাতালে মিশে আছে
সোনাভানের ধূপের শরীর
কালো কেশের গন্ধ ছড়ায়
রূপকুমারী চম্পাবতীর।

সুনীলবরণ আকাশখানি
যেই নেমেছে মাটির পানে
বনের ঘুঘু কাঁদিয়ে দিয়ে
সীতা গেলেন নির্বাসনে।

বেহুলাকে ভেলার পিছে
স্রোতের টানে নদীর বাঁকে
দেখতে আমি পেয়েছি গো
বিষ কাটালির ফাঁকে ফাঁকে।

রঙ মেহেদির দাগ মোছেনি
কারবালাতে কাশেম খুন
সখিনার সে মর্মবেদন
ঢেউ দিয়েছে চতুর্গুণ।

বীর হানিফার অশ্বরাজের
ঠক ঠকা ঠক খুরের ধ্বনি
জোছনা রাতে চমকে বেড়ায়
কালো মেঘের লাল অশনি।

গহন দু'খে কাতর নিমাই
অঙ্গে বসন সন্ন্যাসীর
গেরুয়াতে শরীর ঢাকেন
নগ্ন চরণ নগ্ন শির।

ছবির মত পাড় দুখানি
গহন কালো নদীর নীর

চরণতলে সোনার জুতো
জলের ওপর গাজী পীর।

দিন গিয়েছে গল্পগাছার
তবু রসের গোপন ধারা
একটুখানি নাড়া পেলেই
মধু বিলায় বেবাক পাড়া।

এইখানেতে ঢাকের বাজন
বড়সাধের গরুর লড়াই
বলী খেলার মরশুমেতে
অনেক কিছুর ধানাই-পানাই।

মাঘসপ্তমী মেলার দিনে
সিক্তবসনে যুবতীরা
নদীর জলে কলকলিয়ে
যেই করেছে তরল ক্রীড়া।

কাঁকন চুড়ির পরশ পেয়ে
সাদা সাদা ঢেউয়ের ফেনা
ভেসে বেড়ায় ফুলের মত
সে তো অনেকদিনের চেনা।

তরু তোমার খাস তালুকে
মলিন বদন কিষাণীরা
অতিবৃষ্টি খরার মারে
জানিয়ে গেছে মর্মপীড়া।

তোমার তলায় সমাজ নমাজ
ভূঁইয়ের আলের ঠেলাঠেলি
'কান ছেদানি' 'মুসলমানি'
মলুদ শরীফ বেলাবেলি।

বিবি তালাক জমি দখল
কুল মজানী নারীর নালিশ
সায়ংবেলা তামুক টেনে
চ্যাংড়া ছোঁড়ার প্রেমের সালিশ।

৬—

দেশের কথা দশের কথা
যুগের হাওয়ার ফিসফিসানি
কথার আলোর মশাল জ্বেলে
পঞ্চরকম মন ভাঙানি।

সোভিয়েতের আজব খবর
যাদুর ঘোড়ায় নবীন চীন
সাক্ষী তুমি শুনছে তারা
ভাবছে এল নতুন দিন।

এমনি করে, এমনি করে
দিনের পরে দিন গিয়েছে
নতুন কথার প্রেমে পড়ে
গাঁয়ের কিষাণ মার খেয়েছে।

মনে আছে একাত্তরের
বাংলাদেশে রক্তরোদন
নদীর মাজা কাঁপিয়ে এল
স্বাধীনতার অকাল বোধন।

ডালে ডালে পাতায় পাতায়
সেই কি তোমার পাগলা নাচন
একপলকেই খসে গেল
হাজার সনের জরার বাঁধন।

যুগান্তরের মহীরূপে
ফুটি ফুটি নতুন মুকুল
মরা গাঙে জলের জোকার
তরঙ্গিছে ভরা দু'কূল।

তরুর নায়ক জানো বটে
স্বপ্ন দেখার পরিণাম
মাছির মত প্রাণ হারাল
মনে আছে— সেসব নাম।

তাগড়া জোয়ান চাষার বেটা
শালের মত সুঠাম শরীর
কেউ বা সবে বিয়ের লায়েক
কেউ বা খসম গাঁয়ের পরীর।

ঘর জ্বলেছে দোর জ্বলেছে
ঘরের লক্ষ্মীর শরম খুন
যেদিকেতেই চোখ রেখেছ
আকাশ ধাঁধায় লাল আগুন।

কার কপালে মরণ লেখা
কেই-বা হল আলবদর
কার করুণার শকুন করে
পংক্তি ভোজন গ্রাম-শহর।

রুধিরে লাল ঝলমলানো
মুক্তি প্রমাণ, অশ্রু-গাঁথা
নরমুণ্ডের মাল্য গলায়
নাচনরত স্বাধীনতা।

রূপে দেখেছ মূর্তি কেমন
যুগান্তরের হরিৎ লোচন
যদি বলি শতেক মুখে
দুখের কথা হয় না মোচন।

তারপরেতে তুমি আমি
জানি অনেক খবর জানি
মারী মড়ক মন্বন্তরও
বানের জলের রাহাজানি।

হাজার পরত মাটির নিচে
গভীর শোকের গতিবিধি
সাধ জাগে এই লেখনীরে
শানিয়ে বানাই প্রতিনিধি।

হে সৌম্য ধীমান, প্রবীণ,
অনাদিকালের তাপসতরু।
হে অকলঙ্ক কৈশোর
অনিন্দ্যসুন্দর দর্পিত যৌবনকান্তি
প্রজ্ঞাস্নিগ্ধ বিনয়ী বার্ধক্য!
হে উত্তুঙ্গ মহিমা শিখর

ফলবান সহিষ্ণুতার মূর্ত প্রতীক।
হে নীলিমা বিলাসী প্রশান্ত সাহস
দিগ্বিদিক ধাবমান নিরন্তর প্রাণ-প্রবাহ
চলিষ্ণু জীবনের ঝিরঝির মৃদুনিনাদ,
হে সময়ের সংগীত যন্ত্র
আকাশ-পাতালে সংযোগ রক্ষাকারী
হরিৎলোচন মনীষী মহীরুহ
পিতামহ বৃদ্ধ বনস্পতি—
তোমার গ্রন্থিল শাখাবাহু মেলে
আরো একবার আমাকে
প্রিয় পৌত্রের স্নেহে আলিঙ্গনে বেঁধে
প্রবীণ হৃদয়ে গ্রহণ কর।
আরো একবার তোমার শেকড় জানুতে
স্থাপন কর আমাকে।

গলা ছেড়ে দিয়ে গাও সেই গান,
সন্ধ্যা সাগরের মোহনার রাঙা মেঘের মত
নয়নে উদ্ভাসিত কর নয়নাভিরাম দৃশ্যরাজি।
শাখার ব্যজনে ডেকে আন
স্বর্গলোকের বার্তা বহনকারী নরম ফুরফুরে সেই হাওয়া।
তোমার ঘুমন্ত রাখালদের মন্ত্রবলে ফিরিয়ে দাও
যাদের হৃদয় নবনী প্রাণ আনচান করা বংশীধ্বনিতে
মাঠে-বাটে রচনা করে রঙিন কুয়াশা।
নীল শৃঙ্গ পাহাড় থেকে নেমে আসা
নদীটির ছলোচ্ছল হাস্য মুখরিত
তরঙ্গ চঞ্চল গতিধারায় অঙ্কুরিত করে ধ্বনির যাদু;
সলিল শরীর আন্দোলিত করে
নদীর প্রাণে সৃষ্টি করে উজানে চলার পুলকিত প্রেরণা
— সেই বাঁশিগুলো আবার দাও বাজিয়ে।
আরো একবার ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আমাকে আকর্ষণ কর,
কানে কানে স্নেহময় বচনে বল
যুগান্তের বার্তাবহ বৃদ্ধ বনস্পতি,
পিতা-পিতামহদের জীবনের অমৃত কাহিনী।

বল কোন্ আকাঙ্ক্ষা তাদের তাড়িয়ে নিয়ে গিয়েছে
কোন্ বেদনা হৃদয়ে দিয়েছে দোলা,

জন্ম-মৃত্যুর কোন্ রহস্য অন্তরে গেঁথে নিয়ে
তারা সারি সারি কবরে ঘুমিয়ে পড়েছে।
নিস্তব্ধ নিথর সুপ্তির রাজ্যে জীবনের অপর প্রান্তে
নিদ্রারত স্বজনের স্বপ্নে জোনাক পোকার মত জ্বলে কোন্ উজ্জ্বল কামনা!
কোন্ বাসনার মায়াবী শিহরণে
সংকীর্ণ পরিসর মরণ কারার আড়াল ঠেলে
জীবনের সন্নিধানে তরঙ্গের মত তারা ফেটে পড়তে চায়।
সূর্যের আলোকে দুরন্ত ফড়িঙের মত
লাফিয়ে পড়ার স্বপ্ন তাদের করোটিতে অন্ধকারে ভিড় করে,
আমাকে বল সেই কথা
তোমার গাঢ় কোমল মেঘমন্দ্র কণ্ঠস্বরে
আরো একবার উচ্চারণ কর সেই মন্ত্র
অঙ্গুলি নির্দেশে দেখিয়ে দাও সেইসব পবিত্র স্থান
যেখানে মনুষ্যজীবন জন্ম নিয়েছে বুনো আগাছার মত।
কর্মিষ্ঠ কৃষক শস্যক্ষেত্রে
সোনালি ধান্যের মঞ্জরিতে ফলবান করেছে জীবনস্বপ্ন
এবং কানে কানে বল-
এইখানে তোমার জন্ম, এইখানে তোমার বিলয়
এই তোমার পৃথিবী, এই তোমার স্বর্গ।

নদী সাগরে বিসর্জন দিয়েছে গতি
সাগর সাগরে প্রবিষ্ট।
পথ মিলেছে পথে
লতানো পথের রেখায় তেপান্তরের ইশারা
ছলনার পুষ্পের মত ফুটে আছে সুন্দর।
গিরিরাজি উদার সমতল প্রান্তরের সম্মোহনে
হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে গেছে।
জগতের সমস্ত কিছুর অন্ত আছে।
সমস্ত চরাচরে যখন নেমে আসে অন্ধকার যবনিকা
এই সেই স্থান
প্রবাসী সন্তানের জন্য সর্বক্ষণ উন্মুক্ত করে রাখে মধুময় কোল।
আমাকে নিয়ে চল আবার
সেই প্রাঙ্গণের উপান্তে যেখানে স্তূপাকারে সাজানো
মাঠ থেকে সদ্য কেটে আনা দুধকমল চন্দ্রমণি নামের
ধানেই মাড়াই।
সেই কুটিরের দাওয়ায়

যেখানে দিনের বেলা পোষা কুকুর নাক ডেকে ঘুমোয়
গৃহস্থের পালিত মোরগ-মুরগি 'আধার' ঠুকরে খায়
অপলক নয়নে দেখি পরাক্রান্ত প্রেমিক মোরগের অলজ্জ প্রেম সম্ভাষণ,
লালসালুর মত চককচে তাদের পালক
মস্তকে লাল নিশেন— অপ্রতিহত বীর্যবত্তার প্রতীক।
গোয়ালে বাঁধা দু'টি গরু পরম তৃপ্তিসহকারে
জাবর কাটায় মগ্ন,
একপাশে হেলান দেয়া লাঙল-জোয়াল চাষের যন্ত্রপাতি।
সেই কিষাণ কুটিরে যেখানে শিশুর ক্রন্দন
অভাবের কর্কশ বিষদাঁত, লালচালের মোটাভাত
আধশুকনো লাকড়ি সহযোগে রান্না হয়
কচুরলতি কিংবা পোড়ামরিচে সমাধা হয় চমৎকার ভোজন।
নিয়ে চল সেই নদীর পুলিনে
জোনাক পোকার পিদিম জ্বালানো নিবিড় নিকুঞ্জে
ভরা আশ্বিনে রূপবতী আঁধার যেখানে
শবরী বালিকার কাঁচা যৌবনের মাধুরীর মত ঘন হয়ে নামে।
সেই আকাশ পানে সজল গহন কালো চোখ মেলা
আধমজা দিঘিটির ধারে
কচুরিপানার আচ্ছাদনে অর্ধেক যার পড়েছে ঢাকা।
বামপাশে শ্মশান
নৈঋত কোণে বহু পুরনো হেলানো তেঁতুলগাছ
মোচড় খাওয়া শাখাটিতে যুগ যুগ ধরে বাসস্থান রচনা করে আছে
বয়সী অনাথ স্ত্রী-পুত্রহীন একেবারে অসহায় একটি ভূত
আঁধারের কালো আঁশে গড়া কবন্ধ শরীর।
নিয়ে চল চৈত্র-রজনীর উতলা নিশীথে
সেই চালতা গাছের কিনারে, সেই ফুটফুটে
মনোরম জ্যোৎস্নায়
হৃদয়ের গভীরে কেঁপে ওঠা প্রণয় শিহরণে তাড়িত
ইরান বোস্তানের পরীরা দলে দলে যেখানে বিহার করতে আসে
তারা গোল হয়ে নাচ করে
রাতুল পদচারণে সোনার ঘুঙুরের বোল ফোটে
সমস্ত মাঠ সারা রাতভর
অপার্থিব আনন্দ আস্বাদনের মধুর স্বপ্নে মশগুল থাকে।
আমাকে চাক্ষুষ করাও, সেই দোআঁশ মৃত্তিকার বিস্তৃত নাবাল ভূমি
অনেক অনেক পূর্বে নদী আপন গর্ভ থেকে মুক্ত করেছে যাকে।
হরিণের মাংসের মত লাল পাহাড়ি মাটি

নদীর স্রোতে রসায়িত হয়ে শুভ্র মখমলের বরণ ধরেছে।
আলবাল চিহ্নিত অধিকারের সীমানা আঁকা
এই স্থলখণ্ড জলের প্রবাহে জর্জরিত হয়ে
একদা জলের বুকে যখন আত্মসমর্পণ করেছে
দুই তীরের মানুষ ছিন্নতার
দোতারার মত কেমন কঁকিয়ে কেঁদেছে।
তথাপি বসতবাটি হন্তারক নদীর প্রতি বিশ্বাস কদাপি স্খলিত হয়নি।
নদী তাদের দুঃখে অভিভূত হয়ে ততোধিক বিশ্বাসে
অনুতপ্ত হয়ে অবশেষে এক শরতে প্রসব করেছে এই চর।
মিহি চিকন মোলায়েম আঁশের মাটি
চরণছাপ ধরে রাখে পরম অনুরাগে।
লাঙলের হলা প্রবিষ্ট হয় গভীরে
ঠিক যেন যৌবনবতী গ্রহণ করে প্রেমিক পুরুষ।
মৃত্তিকা তৃষিত মানুষ এই নাবাল ভূমিকে দেখেছে সে চোখে
যেই চোখে তারা দেখে স্তনভারে ঈষৎনতা আপন বনিতাদের।
বাঁশ, কাঠ, শনে গড়ে উঠেছে কুটির
কুটিরে কুটিরে নির্মিত হয়েছে এই জনপদ।
সেই কিষাণীদের কেউ একজন সামনের
হাজার বছরের দিকে তাকিয়ে
হাজার বছরী কীর্তি স্তম্ভস্বরূপ
অতিশয় সরু, অতিশয় ক্ষুদ্র-উদ্ভিদ শিশু
তোমাকে সযত্নে রোপণ করেছে।
গৃহসঞ্জাত উপাদেয় গোময়ে রচিত হয়েছে তোমার আহার
নিদাঘ দিনে নিত্য জল ঢেলে নিবারণ করেছে তিয়াস।
হে বয়োবৃদ্ধ স্মৃতি ভারাক্রান্ত তরু
একদা তুমিও ছিলে শিশু
হাস্যময় কৈশোর তোমাতেও করেছিল ভর
যৌবনের প্রখর চেতনা দিয়েছে ডাক।

তুমি শৈশব অতিক্রম করে শিশুত্ব ধারণ করেছ
কৈশোর অতিক্রম করে কিশোরতা
যৌবন পেরিয়ে ধারণ করেছ অক্ষয় যৌবন ভাও
বুড়োত্বের সিঁড়ি পেরিয়ে বার্ধক্য।
আপন সৃষ্টিশক্তিতে জয় করেছ
শৈশব কৈশোর যৌবন বার্ধক্য—
আর সবকিছুকে এক সঙ্গে ধারণ করে

এই জনপদের সম্মিলিত প্রাণ-প্রবাহে এক হয়ে মিশে রয়েছ।
এখনো পান্থজনে ছায়া দিয়ে সেই কিষাণীর
আদি ঋণ শোধ করে চলেছ মহিমান্বিত তরুবর।

সহস্রবাহু অযুতলোচন তরুবর
আমাকে নিয়ে চল সেই যূথচারী কিষাণ সমাজে
যারা দল বেঁধে বাস করে
শরীরের স্বেদবিন্দু মিশিয়ে মাটিকে করে উর্বরা,
ফসল ধারণের যোগ্যা।
লাঙলের সুতীক্ষ্ণ হলে পাতাল থেকে টেনে আনে মর্মমধু
বীজের অন্তরে যারা সঞ্চারিত করে অঙ্কুরণের স্বপ্ন
কোমল শীষের কানে কানে দেয় বেড়ে ওঠার অঙ্গীকার
যারা শ্রমের ব্যঞ্জনায় মাঠকে করে সর্বাঙ্গ সুন্দর
নদীর কটিদেশে পরিয়ে দেয় ফুলে ফুলে চিত্রিত শাড়ি
দোলায়িত সবুজে রচনা করে জীবনের জয়গাথা।
নিয়ে চল আমাকে সেই বিজ্ঞ বিষাণের জীবনের একেবারে একান্তে
যারা বোঝে আলো-ছায়ার রহস্য
নদীর গতিধারার সঙ্গে যাদের দীর্ঘ পরিচয়
আকাশের পূর্বে রামধনু দেখলে যারা বন্যার
আশঙ্কায় শঙ্কিত হয়
ধূসর জলবাহী মেঘ দেখে বোঝে
ফুটি ফুটো মাঠের যন্ত্রণা অবসান,
নামবে বৃষ্টি অঝোর ধারায়।
হেমন্তের সোনার মত কান্তিমান রোদে
গ্রামসুন্দরীর ভুবন ভোলানো রূপ দেখে তৃষিত নয়নে।
বনের মর্মরে পূর্ব-পুরুষের পদধ্বনি কান পেতে শোনে
পাহাড়ে পাহাড়ে প্রহৃত আওয়াজে দূরস্মৃতি
শ্রবণে মায়ালোকের যাদু রচনা করে।
আর্যত্বের গৌরবে স্ফীত নয় যাদের নাসারন্ধ্র
ইরান-তুরানের স্বপ্ন হানা দিয়ে মনে তরঙ্গ জাগায় না যাদের
আভিজাত্যের অভিজ্ঞান লিখিত নেই যাদের ঠিকুজিতে
সেই জারুল পলাশ আশশ্যাওড়ার আত্মীয়
খেয়ালি নিসর্গের স্বভাবজ সন্তান;
পাহাড় যাদের করেছে কঠিন
জল করেছে কোমল
বাঁকা নদী ও উন্মুক্ত প্রান্তর গলায় ঢেলেছে গান;

সেই কিষাণ সমাজের একেবারে অন্তপুরে নিয়ে চল আমাকে
আমার হৃদযন্ত্র স্পন্দিত কর তাদের জীবনের ছন্দে
উন্মোচন কর সমস্ত অন্তরাল।

নাড়ির গতি পূর্ব-পুরুষের রক্তধারার সঙ্গে মিশিয়ে
সৃষ্টি কর দুরন্ত কল্লোল।
আমাকে আমার আপন জন্মের প্রতি সৎ এবং কর্তব্যশীল হতে দাও।
নিয়ে চল আমাকে করুণ বেহালার মত
সেইসব মানুষের জীবন রঙ্গভূমিতে
কায়িকশ্রম বংশপরম্পরা যাদের উত্তরাধিকার।
যাদের কাছে আমি রক্তের ঋণে ঋণী
এবং যাদের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছি বলে গর্বিত।
সার্থক কর জন্ম আমার।
আমাকে পান করতে দাও বেদনার তীব্র হলাহল।

পূর্বসূরি স্রষ্টাপুরুষের মত
দহিত কর দুঃখের দহনে।
কঠিন করুণ খণ্ড খণ্ড নির্মম বাস্তবতার আঘাতে
আমাকে ভাঙ, আমাকে ছিন্নভিন্ন কর।
ভেঙে-ভেঙে-নতুন করে সৃজন কর।

আপন মস্তকে সমস্ত ভূখণ্ড তুলে নিয়ে
ক্ষুরের মত চিক্কন পিছল পথে পারে হেঁটে যেতে।
তরু ত্রিকালেশ্বর! দাও সেই আশিস
যার স্পর্শে দুঃখের সমস্ত গরল
মধুময় অমৃতে হয় রূপান্তরিত,
আমি স্বজনের অধরে তুলে ধরতে পারি যেন
মরণ বিজয়ী সুধার পেয়ালা।
দীঘল শাখার তরু দুলে দুলে তুমি সৃষ্টি কর
সেই নরম চিকন হাওয়া
যা সঙ্গীতের পংক্তিতে আনে পেলবতা
আমি গাইব মরণ বিজয়ী গান
আপন স্বজনের উদ্দেশে।

হলুদ পাখির মত ভীষণ লাজুক
জন্মেছে হৃদয়ে যার সুন্দর নবনী

হাসিলে গলিয়া যায় এমন রমণী
বেতস লতার ফাঁকে যেমন ডাহুক।
কিষাণকুলের গর্বকন্যা রূপবতী
স্বপ্নে আস আলো করে সমস্ত শয়ন
বদন মণ্ডল 'রিদ্রে' করেছি চয়ন
হেনেছ কুসুম শর মানিনী যুবতী।

চাচর চিকন কেশ বুকে ঢলে পড়ে
বঙ্কিম গাঙের মত ঢেউ ঢেউ মেয়ে
বড় সাধ ভিজে উঠি সেই জলে নেয়ে
মন উচাটন বালা হৃদয়ের জ্বরে।
মানিনী লো একদিন নেব মহাদান
সেই সুখ আগাম ভেবে গাহিলাম গান।

শিয়রে মরণ বসে কেশে রাখে হাত
জন্মের যমজ জান কৃষ্ণকান্তিধারী
নিশব্দ চরণ তার—চিনে নিতে পারি
আয়ুতরু মূলে যেবা টানিছে করাত।

এলোকেশী সে আমার প্রাণের পারানি
ধরেছে তিয়াস ভাণ্ড অধর সীমান্তে
প্রগাঢ় চুম্বন মাগে প্রতি নিশা অন্তে
একদিন কণ্ঠে নেব জানি আমি জানি।

যদি প্রেমে বাঁধা পড়ি নিধুয়া পান্তরে
ভাওয়াইয়া সঙ্গীতে কর শেষ উপাসনা
সহজে প্রকাশ করি অন্তিম বাসনা
এই কথা রাষ্ট্র কর যুগে যুগান্তরে।

যদি মরি কোনদিন নদীর উজানে
আমার কাফন কারো ভাটিয়ালী গানে।

বাড়িতেছে অন্তরের ছোট্ট পরিবার
আমার শবর রক্তে ধরেছে নাচন
ঘুমন্ত দ্রাবিড় প্রাণে নামে জাগরণ
আমাতে বেঁধেছে বাসা নিখিল সংসার।

যেদিকে নয়ন রাখি সব বাসি ভাল
শিশু-নারী-বৃদ্ধ-যুবা যা কিছু সপ্রাণ
সাদা-কালো-পীত বর্ণ মনুষ্য সন্তান
পশু পাখি আর এই গোধূলির আলো।

হৃদয় পাতিয়া রাখি যে আস সমুখে
শত্রু হও, বন্ধু হও অনায়াসে এস
অন্তরে প্রবেশ করে হৃষ্ট মনে বস
স্বদেশি বিদেশি হও ভাই বলি মুখে।

যেখানে তিলেক মাত্র স্থান পায় প্রাণ
সেই প্রাণের বন্ধুর লাগি গাহিলাম গান।

শিশুকালে অসম্ভব ভাল লাগা মনে
তোমার উদাত্তকণ্ঠে গাঢ় উচ্চারণ
শুনেছি প্রবীণ বৃক্ষ সরল আবেগে
ঝিরঝির মিরমির পাতার ভাষণ
গগনে গুঞ্জরি যায় মুক্ত সাম গান

শান্ত স্বর, শুদ্ধ নাদ নিটোল শরীর
শাখায় ছন্দের দোলা দীঘল গম্ভীর।
অকস্মাৎ নৃত্যরত মুক্ত প্রভঞ্জন
জটায় ঘূর্ণির বেগ
আগুয়ান অন্ধকারে ওড়ে ধূলিরাশি
চকিত চমকি যায় বিদ্যুতের হাসি।
অম্বরে ডম্বরু ধ্বনি কাঁপে কড়কড়
রক্তিম আগুন ভরা মেঘমন্দ্র স্বর।
অসীম নীহারজাল গতিমান পাখার স্পন্দনে
তাড়িয়ে আকাশে ভাসে শুভ্র বালিহাঁস
ধবল সুন্দর ডিঙা দ্রুত ধাবমান
পথিক পাখিরে ডেকে শুনিয়েছে গান
সুবর্ণ রেখায় আজো উদ্বেলিত সুর
মুক্তির পিয়াস ঢালে মধুর, মধুর
মূর্ত করে দিব্য চোখে বিশ্বের বন্ধন
শ্রবণে প্রবল হানে মাটির ক্রন্দন।

আকাশে উড্ডীন হংসে যেন সব স্বর্ণগামী প্রাণ
জটার সঙ্কেতে পথ দিয়েছ সন্ধান।

দেখেছি খেয়ালে চরে মেঘের শিশুরা
দলে দলে ক্রীড়াশীল শুভ্র হস্তীযূথ
বিচরণরত দেখে কৌতুকে মুখর
বলেছ রহস্যভরা যেই মৃদু বাণী
চেতনার সরণীতে করে কানাকানি।

শরীরে কুয়াশা মেখে করে আছ চুপ
ধ্যানমগ্ন যোগীবর
দেখেছি সে দিগম্বর প্রকাণ্ড স্বরূপ
পাতালে চরণ গাঁথা মেঘলোকে শির
প্রাণের দর্পণে জাগে নিখিল জগৎ
অতল সুপ্তির কানে বলেছ যে কথা
মহামৌনে মজ্জমান সব বাচালতা,
আতঙ্কে উঠেছে কেঁপে নদীর অন্তর
আকাশ নিয়েছে বুকে সেই সান্দ্র স্বর।

দেখেছি সবুজ পত্রে ঘন আন্দোলন
প্রান্তরের প্রান্তে বাজে প্রসন্ন বাঁশরি
খুলেছে নন্দন লোকে দখিন দুয়ার
ধরায় বসন্ত নামে, উচাটন মন্ত্রে মুগ্ধ মন
তরুশীর্ষে অপরূপ সুন্দর স্বপন,
দ্রুতগামী অশ্বারূঢ় আনন্দের গান
শ্রবণে প্রবিষ্ট হয়ে মাতিয়েছে প্রাণ
আজো সেই শব্দ সেই ধ্বনি
বিদায় উদাস ক্ষণে চিক্কন লাবণি।
আমার নাবাল মনে বিদ্যুৎরেখায়
এঁকেছ যে চিত্রলেখা
তার রাঙা স্বরূপ গোবিন্দা
ঢেকে রাখে বাম হাতে
অসুন্দর আকাশের সীমা।
নিরন্ত অসিরে চলে
মহাকাশে মত্তোদর যেন মন্দ্রতরী
কখনো নির্জনে আসে মর্ম সহচরী

গো-হাকিম

[প্রথম প্রকাশ : ১৯৭৭]

উৎসর্গ

প্রিয়া, মুনা, মিঠু, ভানিয়া, সোনিয়া
সাশা, বিথিয়া, শুচি, দীপু সবাইকে

গো-হাকিম

একদিন এক মাস্টার বুড়ো
দুপুরবেলা ইস্‌কুলে
মনের ভিতর জমে থাকা
পিত্তথলির বিষ তুলে।

দাঁত খিচিয়ে বেত উঁচিয়ে
করতে গিয়ে গালমন্দ
গরু ডাকেন গাধা ডাকেন
যখন যেমন পছন্দ!

ছাত্র সবাই সুবোধ বালক
বড় রকম হা করে—
যা শোনে তা গিলে ফেলে
বুদ্ধি এমন খড়খড়ে।

চোখ পাকালে প্রশ্ন জিগান
বল্‌ত ওহে ছেলেরা—
গরমকালে জোব্বা ঝোলায়
কোন্ সে দেশের লোকেরা।

থ্যাবরা নাকা চ্যাপ্টা মুখো
মানুষ কোথায় বাস করে
এই দেশের হালের বলদ
ইংলিশে কি নাম ধরে।

পাঁচে ত্রিশে গুণ করে বল
ফল দাঁড়াবে কয় শত
কোন্ পশুটি বাঘের মাসী
জবাব দেবে ঠিকমত।

শোনামাত্র ছাত্রদলের
থামল হঠাৎ অট্টরোল

চমকে চোখে শর্ষে ফুল
বুদ্ধির গোড়ায় গণ্ডগোল।

হাসিখুশির মাঝখানে কেউ
প্রশ্ন শুনেই বেয়াড়া
হাতের থেকে মারল ছুঁড়ে
পাকনা নরম পেয়ারা।

আঁকাবুকির খাতা থেকে
একটুখানি জাগিয়ে মাথা
ভাবল এসব খটরমটর
বেবাকগুলো ফালতু ছাতা।

কেউবা আবার ঘটা করে
বিদ্যারাশি করল জাহির
সেসব শুনে লাভ হবে না
একেকটা ভাই মস্ত হাসির।

এমনি করে বালক সকল
একের পর এক পেরিয়ে
বেঞ্চির ওপর দাঁড়িয়ে গেল
দেয়ালেতে পিঠ ঠেকিয়ে।

মাস্টার বুড়ো মেঝের পরে
দাঁড়িয়ে ভীষণ একলাটি
হাঁদা ছেলের পাল এসে
বিদ্যা হল সব মাটি।

রেগে তেতে ডাহিন হাতে
টেনে নিয়ে বেতখানি
এক ধারসে পিট্টি দিলেন
সঙ্গে ঘাড় মটকানি।

উল্লুক আর গর্দভ বলে
দিলেন কষে গালাগাল
এমনি করে বারে বারে
ঝেড়ে দিলেন মনের ঝাল।

অবশেষে ঠোঁট ফুলিয়ে
রাঙা পানের পিক ফেলে

বললেন এই বানর দলে
ফেলছে ভারি মুশকিলে।

মার কাট জবাই কর
মরি মরি চমৎকার
এসব ছেলে ছেলে তো নয়
চামড়া মোটা জানোয়ার।

তার বদলে সকাল বিকেল
গরুর কাছে পাঠ দিলে
বিদ্যা গিলে চতুষ্পদের
আক্কেল হত ঝিলমিলে।

মোটা-সোটা হাকিম হয়ে
আদালতের এজলাসে
প্যান্টালুন আর হ্যাট বাগিয়ে
দিন কাটাত মজাসে।

সেই ক্ষণেতে বিজন পথে
মন্দমৃদু চরণ ফেলে
উদয় হলেন কানু মোড়ল
একটুখানি সামনে হেলে।

মাস্টার বুড়োর দুখের কথা
দোল খেলানো বাতাসে
তীরের মত কানুর কানে
বাজল এসে ফিসফাসে।

চমকে গিয়ে ভাবল কানু
ভারি আজব কথা বটে
গো-বরাতে হাকিমগিরি
এমন কাণ্ড কেমনে ঘটে।

এই সে মানুষ গুণীর সেরা
দেখা হল শুভক্ষণে
ঘরে রাঙা বাছুর আছে
সেই কথাটি এল মনে।

ভাগ্যগুণে পণ্ডর বেটা
পেয়ে গেলে গুরুর দয়া
আদালতে হাকিম হয়ে
মাথার ওপর দেবে ছায়া।

কি হবে গো ফিকির করে
সিকি নয়া পয়সার টানে
তার চে' খোঁজ নেয়া ভাল
গরু হাকিম কী-বা মানে।

ভক্তিভরে সালাম করে
পাঠশালাতে পা রেখে
কানু মোড়ল কুশল শুধোয়
আলাপনে রস মেখে।

বিদ্যাসাগর নাচার বড়
একটুখানি কৃপার তরে
ঘরের পোষা বাছুরটিরে
দিতেন যদি মানুষ করে।

বেঁচে যেতাম ভালই মত
গরুর ভাগ্যে ভাগ্যমন্ত
দয়ার শরীর কবুল করুন
দরাজ দিল বিদ্যাবন্ত।

মাস্টার বুড়ো মাথা নেড়ে
বললেন বটে ঠিক কথা
মাসে মাসে নব্বুই টাকা
হবে না তার অন্যথা।

খড় বিচুলি তুমিই দেবে
আমি দেব সহজ পাঠ;
বরাত যদি থাকে গরুর
হতে পারে লাট-বেলাট।

দিলেন পক্কে হাকিম হবে
বলছি আমি খাস দিলে

ন'মাস অন্তে জানতে পারে
আদালতে খোঁজ নিলে।

মনের সুখে কানু ঘোড়ল
বাঁকা চোরা পথ বেয়ে
বাতাস কেটে ফিরল বাড়ি
মধুর মধুর গান গেয়ে।

খেয়ে দেয়ে অল্প রকম
টানল একটু গুড়গুড়ি
মাথার ভেতর সেই সে কথা
দিচ্ছিল খুব সুড়সুড়ি।

দিবানিদ্রা বন্ধ রেখে
পরের দিন বিকেল বেলা,
বাহনটিরে বেঁধে ছেঁদে
পথের পরে করল মেলা।

সূর্য তখন ডুব মেরেছে
অস্তাচলের কোনখানে
ঝাঁকে ঝাঁকে ফুল ফুটেছে
রাতের আকাশ বাগানে।

গরুসমেত একলা কানু
চাঁদের আলোর পথ চিনে
বড় সড়ক বাঁয়ে রেখে
ঘুরল একটু দক্ষিণে।

পেরিয়ে গেল ছোট্ট নদী
তারপর গ্রাম বাঁকতালা
কলাপাতার ফাঁক ফিরিয়ে
দেখা গেল আটচালা।

মাঠের মুড়ো ঘরে বসেই
শণের সুতো গোল দিয়ে
পাকাচ্ছিলেন শক্ত রশি
বড় বড় দম নিয়ে।

দেখেন চেয়ে দীপালোকে
ছাত্রসহ অভিভাবক
দাঁড়িয়ে আছে দোর গোড়াতে
মোড়ল পুত্তুর গো-শাবক।

খুশির চোটে দু'চোখ ফেটে
জলের ধারা গড়াল
অনেক পরে ওপরঅলা
আকুল প্রাণ ভরাল।

যেমন তিনি চেয়েছিলেন
একেবারে তেমন রকম
শান্ত সুবোধ গরুর বেটা
স্বভাবটিও বড্ড নরম।

গরু কুলে জন্ম হলেও
ছাত্র এমন মেলে কার
লাঙ্গুল টেনে তার বারে বারে
বললেন বাহা চমৎকার।

পিঠে দু'হাত বুলিয়ে দেখেন
পশুর শিশু নড়ে না
তাই না দেখে মাস্টার বুড়োর
আনন্দ আর ধরে না।

বলেন, ওহে মোড়ল বাবা
পাকা কথা এই দিলাম
উত্তম-আলি মাস্টার আমি
চতুষ্পদের ভার নিলাম।

বিদ্যাসাগর রাজি হলেন
শুনে ভীষণ আনন্দ
গরু হবে জেলার হাকিম
তাতে এমন কি মন্দ।

নয় মাস তো পেরিয়ে গেল
কেমন হল বিদ্যাভ্যাস
ভাবল কানু দেখা উচিত
গরুর ক'টা জুটল পাশ।

খইল ভুঁড়ো গুছিয়ে নিয়ে
আনন্দেতে মন খুশি
জাপান দেশের খাবার কিনে
বাঁধল সখের পুটুলি।

যেতে যেতে ভাবনা করে
কানু মোড়ল রাশভারী
গরুর গুণে জুটেই যাবে
বেবাক পাড়ার সর্দারী।

সারা দুপুর জোরপায়ে
চেকন মোটা পথ হেঁটে
বিকেল নাগাদ এসেই গেল
মাস্টারদের তল্লাটে।

মেঠো পথে গমনরত
গামছা কাঁধে দুলিয়ে
মাস্টার যান বাজারেতে
ক্লান্ত চরণ বুলিয়ে।

সালাম আদাব করে কানু
আসল কথা শুধোল
সেই যে আমি রেখে গেলাম
গরুর ব্যাটার কি হল।

কানুর কথায় দাঁত কেলিয়ে
মাস্টার দিলেন অট্টহাস
খবর কিছু রাখ মিয়া
গরুর কিবা বিদ্যাভ্যাস।

খোঁজ নাওগে আদালতে
হাকিম হয়ে বসেছে

গরুর মাথায় এলেমদারির
সাত শো মানিক জ্বলেছে।

খোশখবরে পেট ভরেছে
রত্ন গরুর কর্তা বটে
জিভে চেখে ভাল দেখে
কিনল গুড় চটচটে।

খড় বিচুলি সঙ্গে নিল
আর নিল সেই পুঁটুলি
সূর্য তখন পাটে গেছেন
নামছে ধীরে গোধূলি।

পরের দিন ভোর না হতে
কানু মোড়ল অগ্রগণ্য
আদালতে জুটল এসে
আওয়াজ তুলে ধন্য ধন্য।

লোক ধরে না কাচারিতে
জলের মত আসে যায়
বদ্ধগুমোট অট্টালিকায়
বারে বারে পথ হারায়।

উকিল দেখে মোক্তার দেখে
সারি সারি মুহুরি
বেড়ায় খুঁজে হাকিম কই
কাজটা বড় জরুরি।

অগত্যা তাই নামটি ধরে
বড় করে হাঁক দিল
গরুর রাজা হাকিম গরু
তোমার সঙ্গে কাজ ছিল।

আমি তোমার পুরাণ মনিব
দেখলে তবে চিনতে পাবে
যেথায় থাক ছুটে এস
খড় বিচুলির নাস্তা খাবে।

খাস কামরায় ঘুমায় হাকিম
দুয়ার ধরে আরদালি
ভাবল এমন হাঁক ছাড়ে
কার বা এমন কর্তালি।

মুখ বাড়িয়ে দেখল চেয়ে
পাগলা মত গাঁয়ের লোক
মাথার ওপর খড়ের বোঝা
তেরছা বাঁকা চলার ঝোঁক।

জলদ্‌স্বরে আরদালিটি
বাঘের মত হুঙ্কারে
বলল কে রে চেচাঁস বেটা
বিচারঘরের দুয়ারে।

খাস কামরায় ঘুমায় হাকিম
বলে দিলাম খবরদার
এমন করে চেঁচাস যদি
হয়ে যাবে জান কাবার।

বাঘা হাকিম শয়ন ঘরে
আমি হলাম আরদালি
বাপের ছিল চুরির পেশা
নিজের নাম নফ্‌রালি।

বলল কানু তা হলে তো
কূল মিলল অকূলে
কানের সঙ্গে মস্তক আছে
বুঝতে পেলাম সব খুলে।

তুমি তো ভাই আপন মানুষ
রাখছি বলে আবডালে
তোমার মনিব আড়াই বছর
ছিলেন আমার গোশালে।

গরুর ছানা হাকিম হল
জাগছে মনে খটকাটি

শুনলে তুমি বলতে পারি
কে নেড়েছে কলকাঠি।

তোমার মনিব আমার বাছুর
বিবি জানের হাতে পোষা
হাকিম হওয়ার বায়না ধরে
করল সেবার এমন গোঁসা।

মনের দুঃখে গরুর ছানার
কত রকম কইছালি
একটি টেরে থাকত পড়ে
ছুঁইত না খড়-বিচালি।

অনুমানে বুঝেই গেলাম
গরুর বেটার আকাঙ্ক্ষা
সেই অবধি দিন রজনী
মনের ভেতর কি শঙ্কা।

পোড়া দেশে কোথায় মেলে
যোগ্যমত পাঠশালা
কপাল-গুণে পেয়ে গেলাম
উত্তম আলির আটচালা।

উত্তম আলি মাস্টার বটে
আসল নিবাস খুলনা
গরু পিটে হাকিম বানান
কোথায় এমন তুলনা।

জলজ্যান্ত প্রমাণ দেখ
শয়নরত তোমার মনিব
ওপরঅলার মেহেরবাণী
বাকি বেটার ফর্সা নসিব।

আমার খবর লাভ কি জেনে
মাসে মাসে নব্বুই টাকা
খড়-বিচুলির খরচসহ
যুগিয়ে গেছি একা একা।

পরাণ আমার ভরে গেছে
সকল দুঃখ সফল মানি
হাকিম সাহেব আমার গরু
ধন্য ধন্য গুণ বাখানি।

আরদালি ভাই বিনয় করি
বুড়ো লোকটির কথা রাখবে
এসব কথা চেপেই যেয়ো
তোমার হাকিম লজ্জা পাবে।

খাস কামরায় শুয়ে হাকিম
শখের আরাম চেয়ারে
গলগলিয়ে নাক দু'খানি
ডাকাচ্ছিলেন যেই হারে—

দালানবাসী মশক পাড়ায়
রীতিমতই ভূমিকম্প
টিকটিকি এক এই সুযোগে
লেজ দুলিয়ে মারল লম্ফ।

বিরাট মুখের বারান্দাতে
আছাড় খেয়ে টিকটিকি
নাকের গর্তে লেজ ঢুকিয়ে
দেখছিল বেশ মন্দ কি।

হ্যাঁচ্ছ করে হাকিম সাহেব
চুলকে পায়ের গোড়ালি
হাঁক দিল রে আছিস কই
চোরার বেটা নফ্‌রালি।

ভয়ে ডরে আরদালিটি
সামনে মেলে যুগল কর
বলল তবে আদেশ করুন
মহামান্য হাকিম বর।

রেগে দ্বিগুণ মেজাজ আগুণ
দেখিয়ে হাতের দস্তানা

বলেন বেটা কই ছিলি তুই
করে দেব চোখ কানা।

চোখ হারাবার আশঙ্কাতে
ভীত করুণ আরদালি
বলল হুজুর ক'দিক দেখি
বাইরে ভীষণ গোলমালই।

আদালতের সিংদুয়ারে
পাগলা মত গাঁয়ের মানুষ
খড় বিচুলির আঁটি মাথায়
ছুঁড়ছে সে কী কথার ফানুস।

বলছি তারে বিনয় ভরে
চোপ রও ভাই একটুখানি।
এখন হুজুর নিদ্রা দিচ্ছেন
ওই শোন তার নাক ডাকানি।

মানবে কেন আমার কথা
আরদালিরে ডরায় কে
হুজুর যারে চোর ঠাওরান
অন্য লোক তার মান রাখে?

ছাড়ান দিলাম মানের দাবি
বেল্লিক বেটা নাম ধরে
বলছে যেসব নোংরা কথা
শুনলে গায়ের লোম ঝরে।

ভাগ্য বেটার বেঁচে গেছে
আমি নেহাত আরদালি
হুজুর যদি শুনতেন কানে
ছুটিয়ে দিতেন লাল কালি।

উচিত মত সাজা দিতেন
একেক টানে দশ বছর
মেয়াদ খেটে বুঝত বটে
এই রকমই হয় রগড়।

হাকিম শুধোন কেমনতর
লোকটা তোমার নফ্‌রালি
চিকন চাকন লম্বা গড়ন
মাথার একটা ধার খালি।

দাঁত পড়েছে তিনটে যেমন
মুখের আগায় চাপ দাড়ি
ঘন ঘন নাক ঝাড়ে কি
তোতলায় কিনা বারবারই?

অবাক ভীষণ মুখ দিয়ে আর
রা সরে না আরদালির
বলল হুজুর ঠিক ধরেছেন
সেই রকমই তার শরীর।

তোতলায় বটে বারে বারে
গলার আওয়াজ ভারাল
মুখের বচন যেন একেক
কুড়োলের কোপ ধারাল।

বলেন হাকিম নফর আলি
সুখের কথা নয় কিছু
অনেক বছর এই মানুষটি
লেগে আছে আগ পিছু।

তখন আমি হইনি হাকিম
হওনি তুমি আরদালি
বাপের সাথে দুপুর রাতে
করতে চুরি এজমালি।

নবগ্রামের উকিল ছিলাম
এক সময়ে ভাগ্যদোষে
গরু চোরের জামিন হয়ে
পড়ে গেছি আইনের রোষে।

বুঝে নিও নফর আলি
কেমন করুণ অবস্থা

দশটি হাজার দণ্ড দিলাম
সঙ্গে ভীষণ হেনস্থা।

ঐ যে দেখ কানু মোড়ল
সেই সময়ের প্রতিবেশী
এক লাগোয়া বাড়ি ছিল
তাতেই আরো রেশারেশি।

ধূর্ত কানু সুযোগ বুঝে
আশে পাশের দশ গেরামে
গরু উকিল খেতাবখানি
রটিয়ে দিল আমার নামে।

যেদিকে যাই জোয়ান বুড়ো
ঠাট্টা হাসি চিৎকারে
বড় বড় আওয়াজ তুলে
গরু উকিল ডাক মারে।

কেউ বুঝে না আমার দুঃখ
চারদিকেতে অট্টহাসি
বুকের তলে পরাণ কাঁদে
দুঃখ জমে রাশি রাশি।

এমনি করে নফর আলি
দিনের পরে দিন গিয়েছে
শক্ত মনের মানুষগুলো
আমার ওপর শোধ নিয়েছে।

ভুল করিনি নফর আলি
বাপের ভিটির টান কাটিয়ে
পথে নেমে দেখতে পেলাম
ভাগ্য হাসে খিলখিলিয়ে।

চলনবলন পড়েই গেল
ওপরঅলার নেকনজরে
হাকিম হয়ে এসে গেলাম
এক সকালে এই সদরে।

বিচার আচার করছি ভাল
লোকে আমার সুনাম করে
তাই না দেখে শত্রুদলের
কাঁচা অঙ্গে ফোস্‌কা পড়ে।

কানু যারে দেখছ তুমি
মুখে হাজার খারাপ ধ্বনি
নবগ্রামের নিন্দুকদের
বেটা একজন শিরোমণি।

বুদ্ধি করে মাথার ওপর
চাপিয়ে ক'খান খড়ের আঁটি
আদালতের মাঠে এসে
ইজ্জত-শরম করছে মাটি।

নফর আলি বলি তোমায়
বিনয় করে ভাই ডেকে
এই হারামি মোড়লটাকে
লাঠির ঘায়ে দাও ফেঁকে।

বলল হুজুর জানলে আগে
খেদিয়ে দিতাম কোন্ কালে
মাসে মাসে নব্বুই টাকা
ফেল্‌ছে একটু গোলমালে।

কিজানি কোন্ বিপদ আসে
টাকা পয়সার গণ্ডগোল
নইলে হুজুর অনেক আগে
উড়ে যেত মাথার ঢোল।

হুজুর নিজে ভেবে দেখুন
ঘটলে কাণ্ড এমনটি
আদালতের ভিত কাঁপিয়ে
বাজবে তবে জোর ঘণ্টি।

বলবে লোকে যেমন হাকিম
তেমন তাঁর আরদালি

বিচার আচার কথার কথা
টাকা মারার ফাঁদ খালি।

বলেন হাকিম থাম ওহে
বুঝতেই পেলাম বিত্তান্ত
হাজার টাকা গচ্চা দেব
জানিয়ে দিলাম সিদ্ধান্ত।

এই যে ধর নগদ নগদ
বন্ধ কর কানুর মুখ
নিন্দুক বেটা সরলে পরে
শান্ত হয় ত্রস্থ বুক।

দিন-দুপুরে কানুর হাতে
শুধু শুধুই হয়রানি
সেই তুলনায় হাজার টাকা
শিশুর হাতের জলপানি।

বলল নফর খবর আরো
গিন্নী মায়ের নাম করে
গাঁয়ে যেতে বলছে কানু
দেখবে নাকি চোখ ভরে।

পাঠ্যশালে আসার পরে
শোকে নাকি চোখ কানা
আপন বৌয়ের পক্ষ হয়ে
করছে দাবি সান্ত্বনা।

বলেন হাকিম আরদালিটি
রইল আজো রামবোকা
দুষ্ট কানুর ফাঁদে পড়ে
কইছ কথা একঝোকা।

বেটা পাজি মনের ভেতর
পোষে নানান মতলব
বাগে পেলে টের পাওয়াবে
বন্দী করার ফন্দি সব।

তার চেয়ে ঢের বলা ভাল
একটুও সেই অবসর
মায়ের নামে দুঃখ পেলেন
দেখতে যাবেন পর বছর।

হাজার টাকার তোড়াটিকে
এই সুযোগে হাতের ফাঁকে
গলিয়ে দিয়ে বলবে কানে
নিতেই হবে আপনাকে।

খড়-বিচুলির সামান্য দাম
ঋণ শোধে তার কি সাধ্য
বাছুর আছে আগের মত
হয়নি মোটেই অবাধ্য।

আরদালিটি কায়দা করে
সুযোগ মত ক্ষণ গণে
কানুর পাশে লেপ্টে বসে
দূর্বা ছাওয়া প্রাঙ্গণে।

বলল কানে কানু ভায়া
শুনেই ম্যায়ের কাহিনী
দু'চোখ ঝেপে নামল কেঁপে
অশ্রুজলের বাহিনী।

এজলাসেতে মামলা চলে
আমি তখন কি করি
বলে দিলাম হটো সবাই
কাজ পড়েছে জরুরি।

খাসকামরায় নিয়ে তাঁকে
বলি ওহে মনিব মশায়
কানু মোড়ল বসে আছে
দেখা করার আশায় আশায়।

কাজ হয়েছে আমার কথায়
সামনে ছুটির দিন ঘনালে

ঠিক হয়েছে গাঁয়ে যাবেন
গিন্নী মায়ের হাকিম ছেলে।

কানু ভায়া বিশ্বাস করুন
বাছুর আছে আগের মত
আমায় দিয়ে পাঠিয়ে দিল
সালাম আদাব শত শত।

অবশেষে আমার হাতে
গছিয়ে দিয়ে এই তোড়া
মুক্ত হলেন জেলার হাকিম
নামল বোঝা বুক জোড়া।

তবে এখন গ্রহণ করুন
বাছুর প্রেমের পুরস্কার
সুনাম সে তো রটেই গেছে
দিগ্বিদিকে একাকার।

আনন্দিত কানু মোড়ল
আদালতে দাঁড়িয়ে
হাসল একখান বাঘা হাসি
বেবাক শরীর নাড়িয়ে।

যে দেখেছে ভড়কে গেছে
এমন বিকট হাসির ধারা
নৃত্য করে কানু মোড়ল
মনের সুখে পাগল পারা।

লেনিন ঘুমোবে এবার

[প্রথম প্রকাশ ১৯৯৯]

উৎসর্গ

একমাত্র জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা
মরহুম আবদুস সবুর
আমার ছবি ভাই
সাহিত্য-সাধনার প্রারম্ভিক প্রেরণার উৎসে
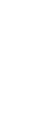
লেনিন ঘুমোবে এবার

ভলগা নদী ধীরে বয়
রেড স্কোয়ারে পুরু হয় বরফের স্তর
ধূসর কুয়াশা ঢাকা ক্রেমলিন শিখর।
বছর বছর ধরে একটানা এক ঠায় দাঁড়িয়ে একাকী
লেনিনের বোবা চোখ প্রশ্ন করে আর কত বাকি।
কেটে গেছে বহুকাল, ঘটে গেছে বহু যুদ্ধ-বহু মন্বন্তর
লেনিনের বুকে বিঁধে কালের নখর।
অগাধ প্রত্যাশা নিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বড় ক্লান্ত
শ্রান্ত জানু ঢলে আসে, আর সাধ্য নেই দাঁড়াবার
লেনিন ঘুমোবে এবার।

লেনিন ঘুমোতে চায়
লেনিন ধূলির শিশু ভূমিশয্যা বড় ভালবাসে
সিমেট্রির গভীর থেকে জননীর ডাক ভেসে আসে
আয় যাদু ফিরে আয়। ডেকে ডেকে ভাইটি অস্থির ;
মা ও ভায়ের মাঝে ভাইজান পেতে দাও নশ্বর শরীর।
জেগে জেগে লেনিনের দুচোখে ভ্রূকুটি
রাত নেই দিন নেই একঘেয়ে অক্লান্ত ডিউটি
ফুরোয় না, ফুরোবে না— তাই চায় ছুটি।
লেনিনের ছুটি প্রাপ্য তাই
সময় পাহারা থেকে মুক্ত হওয়া চাই।
কেননা জননী ডেকেছে তাকে, ভাই ডাকে আয়
বড় সাধ ঘুমোবার পৃথিবীর পুণ্য মৃত্তিকায়।
অনেক সময় গেছে— সময় সাগর গেছে
একাকী দাঁড়িয়ে, আর সাধ নেই দাঁড়াবার
লেনিন ঘুমোবে এবার।

ভলগার কনকনে হাওয়া হিংস্র ভালুকের মত রোমশ আঁধারে
ক্রেমলিনে ঝুলে থাকা চাঁদ আর তারার বিলাপ
লেনিন শুনেছে চুপে, সারারাত ঝিঁঝির কীর্তন

শুনে শুনে লেনিনের ক্ষেপে গেছে মন।
প্যাঁচা আর ইঁদুরেরা যেই পথে যাওয়া আসা করে,
লেনিনও পালাতে চায় সেই পথ ধরে।
কঠিন ইস্পাত ভল্ট নড়ে ওঠে,
আকাঙ্ক্ষার তীব্র তাপে ফেটে যেতে চায়
নিস্পন্দ পাষাণ মমি থরথর কাঁপে।
নিশ্চল শান্ত্রীর দল আগ্নেয়াস্ত্র হাতে হাঁকে হুশিয়ার
থিরে রহ— খাড়া হয়ে ইস্পাত জঠরে,
লেনিন পালাতে চায় সব বাধা সব ধাঁধা করে একাকার
লেনিন ঘুমোবে এবার।

ভুলভ্রান্তি মেনে নিয়ে লেনিন জানাতে চায় সহজ ভাষায়
বিপ্লবের লাল স্বপ্ন— তার মৃত্যু নাই।
ভালবাসা অন্তঃস্থ স্রোতের বেগে পথ কেটে চলে
ফুটন্ত উত্থানমন্ত্র জেগে রয় মানুষের প্রাণের অতলে।
স্তব্ধ হোক জাগরণ, সাময়িক বিপ্লবের কেটে যাক ধার
তবুও প্রথম চোটে মুমুক্ষু মানুষ উঠে দাঁড়াবে আবার।
দোর্দণ্ড পাশব ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষায় প্রভু হতে চায়
লেনিন বইবে কেন সেইসব ক্রুরকর্মা ঠগীদের দায়।
কেন লেনিনকে সাজতে হবে আধুনিক ফারাওর সঙ
বুকে পিঠে পাথর ইস্পাত বর্ম এবং এবং।
কোটাল স্রোতের মত পরিনির্বাণের বেগ অন্তরে ঘনায়
লেনিন মানুষের ইতিহাসে মানুষের শিশু হতে চায়
তার আগে শুধু একবার মা ও ভায়ের পাশে
বিছায়ে শরীর— পেতে চায় মানবিক উত্তাপের স্বাদ
লেনিন ঘুমোবে এবার।

লেনিন সঠিক জানে মানবিক সম্ভাবনার
অনন্য সম্ভবা বীজ শক্তির ভাণ্ডার তিনি,
মাটিই গন্তব্য তার। মাটির সে উর্বরতা আছে,
নবজন্মে ঝলসে তোলা শুভ্রবুদ্ধ নবীন মানুষ।
ভল্টের আড়ালে বসে ঠিক পায় টের
মাটি পারে পূর্ব পূর্ব প্রজন্মের কলঙ্ক কলুষ
ধুয়ে মুছে-শুদ্ধতর সৃজনের বেগ
ফুৎকারে প্রমূর্ত করা উদ্ভিন্ন অঙ্কুরে।
সর্বাঙ্গীণ বিপ্লবের বোধিসত্ত্ব হয়ে
লেনিন জন্মাতে চায় আরো একবার।

তাই তুষারের ফাঁকে ফাঁকে পথ চিনে চিনে
লেনিন পালাতে চায় মাটির গহীনে।
জননী ডেকেছে তাকে ভাই পাশে চায়
লম্বা ঘুম দিতে হবে পৃথিবীর পুণ্য মৃত্তিকায়
লেনিন ঘুমোবে এবার।

কবি ও সম্রাট

[মীর তকি মীর, উর্দু-সাহিত্যের একজন মশহুর কবি। মীর্জা আসাদুল্লাহ খান গালিবের মত একজন নাক উঁচু স্বভাবের মানুষও তাঁকে অগ্রজের প্রাপ্য সম্মান দিতে কোনরকম কুণ্ঠা প্রদর্শন করেননি। মীর ছিলেন খুবই প্রতিভাবান একজন কবি। আর স্বভাবে ছিলেন উড়নচণ্ডি। তাঁর ছিল প্রখর আত্মসম্মানবোধ। তাঁর ব্যাঙ্গাত্মক রসিকতা করার ক্ষমতা ছিল অসাধারণ। এ নিয়ে অনেক গল্প চালু রয়েছে। আগ্রহী পাঠকের পক্ষে সেগুলো খুঁজে নেয়াও খুব দুরূহ ব্যাপার হবে না।

আমাদের দেশে মীর একেবারে অপরিচিত একথা বলা বোধ হয় ঠিক হবে না। বিখ্যাত গজল গায়ক মেহেদী হাসান, শামসাদ বেগম, গোলাম আলি প্রমুখের কণ্ঠে গীত হয়ে তাঁর বেশ কিছু গীতিকবিতা সঙ্গীত পিপাসু মানুষের মনে স্থান করে নিতে পেরেছে। মীরের সাহিত্যকর্মের উৎকর্ষ বিচার করে বাংলাভাষায় বিশেষ কাজ হয়নি। এটা নিশ্চয়ই সুখের সংবাদ নয়।

এই নাট্য সংলাপটিতে মীরের যে চরিত্র খাড়া করা হয়েছে, তার সঙ্গে মীরের যে ঐতিহাসিক চরিত্র মিল সন্ধান করতে গেলে খুঁটিনাটি তথ্য সন্ধানী পাঠককে অবশ্যই হতাশ হতে হবে। পৃথিবীতে জন্মানো রক্ত-মাংসের আসল মানুষের সঙ্গে কবির হৃদয়ে জন্মানো মানুষের ফারাক তো অবশ্যই থাকবে। পাঠ করার সময় এ বিষয়টি মনে রাখলে কবির কৃত অনেক অপরাধের মার্জনা মেলে।]

সম্রাট : তাহলে এসেছ তুমি মীর!

মীর : জাঁহাপনা, খোদাবন্দ্ ভারত ঈশ্বর
গোটা হিন্দুস্থানে কার কাছে আছে এমন হিম্মত
কার ঘাড়ে দু'টি মাথা সজ্ঞানে অমান্য করে
বাদশার ফরমান!

সম্রাট : বলেছ যথার্থ মীর, একটুও মিথ্যে নয় ·
শুধুমাত্র সম্রাটের ইচ্ছে আকর্ষণ জোর করে
টেনে আনে মনুষ্যমণ্ডলী।

মীর : জাঁহাপনা, সুরুচিরক্ষক, তাই পশুরা জঙ্গলে থাকে
বিহঙ্গ আকাশে ওড়ে, নইলে পশু আর পাখিদের
মিলিত চিৎকারে জমকালো দরবার কক্ষে
কান পাতা দায় হত। সম্রাটের দয়ার শরীর

জলকে দেন না কষ্ট তাই নদী নিম্নদিকে ধায়।
অন্তরে জন্মাত যদি আকাঙ্ক্ষা অঙ্কুর, স্বকীয়
স্বভাব ভুলে কল্লোলিত যমুনার ধারা, উজানে
তরঙ্গ তুলে উর্ধ্বে ছুটে যেত।

সম্রাট : মীর তকি মীর অনর্থক বাজে বকো
তথাপি কবুল করি, তোমার কথায় আছে
তীব্র সংবেদন, আকর্ষণ এড়ানো কঠিন বড়
শুনে মনে হয় বনতলে সঙ্গোপনে ফেনিল ফোয়ারা
প্রতি বাক্যবন্ধে যেন দিতেছে টঙ্কার—
তথাপি সম্রাট আমি, আমার কর্তব্য আছে।

মীর : জাঁহাপনা, এই দীন ধনপতি সেনাপতি নয়,
করযোগ্য ভূমি যার এখতিয়ারে নেই। একটি
পৈত্রিক বীণা, খাগের লেখনী আর কিঞ্চিৎ সেহাই
এই মাত্র পুঁজিপাট্টা। অন্ধকার চক্রান্তের পথে
যে ভুলেও বাড়ায়নি পা, তার কী কসুর হতে পারে!

সম্রাট : বেখবর মীর, কী কসুর জান না এটা
আরেক কসুর। নগরের কোতোয়াল প্রত্যহ লেখে
তোমার খবর। অহরহ গাঁজা চণ্ডু খাও, শরাব
খানায় কর নরক গুলজার, রেণ্ডিবাড়ি কর
তুমি নিত্য গতায়াত। সবচে' আপত্তির প্রত্যহ দিচ্ছ
ছেড়ে লাউডগা সাপের মত অবাধ্য কবিতা।
হৃদয়ের বোঁটা ধরে টান দেয় এরকম ফলাযুক্ত তীর।
তোমার শব্দের বিষ উপমা ঝঙ্কার কেড়ে নিচ্ছে
যুবকের ধর্মে কর্মে মতি। নারীরা নিষিদ্ধ চীজ
বেশি ভালবাসে, তাই সবাই আশঙ্কা করে
তাবত শরীফ গৃহে অগ্নিকাণ্ড হবে। বল
এসব কসুর নয়? কিংবা বল কোতোয়াল
অসত্য লিখেছে?

মীর : জাঁহাপনা, কোতোয়াল সম্রাটের নিমক হালাল বড়
সৎ কর্মচারী, যা দেখে সকল লেখে, এক বর্ণ মিথ্যে
নয় তার। তবু আমার ভাগে অনুগ্রহের ভার
কিঞ্চিৎ অধিক বলে মনে হয়।

সম্রাট : কোতোয়াল পক্ষপাতী এই চিন্তা কী কারণে
স্থান পেল মনে?

মীর : জাঁহাপনা, খাকসার নালায়েক নাচীজ বান্দা
জন্ম গুনাহ্‌গার সবিনয়ে শ্রীচরণে নিবেদন রাখি
আমার সহজ বাক্যে না নিন গোস্তাখি।

সম্রাট : মীর তকি মীর, শশকের মত শুধু ডানে বামে হেলো
নিজস্ব বয়ানটুকু মুকতসর বল।

মীর : যেহেতু সর্বশঙ্কা হন্তারক সম্রাটের হুজুরে হাজির
দ্বিধা ভয় দূরে গেল বাকরুদ্ধ কবির।
সিংহাসন সাক্ষী রেখে মুক্তকণ্ঠে বলি, সম্রাট
সূর্যের মত, তবে সূর্য অস্ত যায়। কিন্তু সম্রাট
দীপ্তি জেগে থাকে সর্বক্ষণ দিবস-শর্বরী।
সম্রাটের দিব্যদৃষ্টি বিলাইছে আসমুদ্র হিমাচলে
নিত্য বরাভয়। নিরীহ কবির কর্ম কেন হবে
সম্রাটের চর্চার বিষয়? নাদানের কর্মকাণ্ড জানিনে
কী কারণে সম্রাটের মনোযোগ টানে।

সম্রাট : মীর তকি মীর, বক্তব্যের প্রথমাংশ অতি চমৎকার
অন্য অংশে অসঙ্গতি ঘটেছে বিস্তর। সম্রাটের
ভাবকল্প আর রক্ত-মাংসের আসল সম্রাট,
দুই বস্তু এক নয়। সেকথা থাকুক অভিপ্রায় ব্যক্ত কর।

মীর : জাঁহাপনা, আপনার অদৃশ্য চোখ সর্ববস্তু দেখে,
গুপ্তকান সবকিছু শুনে। সম্রাট সকল জান্তা,
তাতে আমি যৎকিঞ্চিত সংযোজন করি।
যত মসজিদ আছে দিল্লি নগরীতে শুঁড়িখানা
কম নয় তার চেয়ে ঢের ঢের বেশি। যত লোক মধ্যরাতে
করে ইবাদত তার চে' মাতাল বেশি পাওয়া
যাবে শরাবখানায়। আমি তো খান্দানি নই
ধারকর্জ পেলে পান করি। অথচ এমন বহু
এ শহরে আছে, চৌদ্দ পুরুষের অর্থ রসে করে ক্ষয়।
এমন কী তত্ত্ব নিলে সম্রাটের পরিবারে কতিপয়
পাওয়া যেতে পারে। অতি বেলেহাজ কথা ঠোঁট থেকে
ফসকে গেল। শাস্তি দিলে শাস্তি মেনে নেব।
তথাপি নসিব ভাল নিজ চোখে
দেখলাম সম্রাটের নুরানী সুরত।

সম্রাট : মীর তকি মীর, তোমার জিভটি খুব
সুবিধের নয়, শাখের করাত যেন আসতে যেতে
দুই দিকে কাটে। তারিফের ছলে কর দিব্যি শেকায়েত।
আবার ঔদ্ধত্য মধুর কর বিনয়ের রসে। এও এক শিল্পকর্ম।
তোমার গোস্তাখি যত, সম্রাটের ক্ষমা গুণ
ধৈর্যশক্তি তার চেয়ে ঢের ঢের বেশি। সে কারণে না চাইতে
ক্ষমা পেয়ে গেছ। নইলে কালো মাথা মাটিতে লুটোত।

মীর : বাদশাহ আলম্পনা ঘাড়ে হাত দিয়ে যখন নিশ্চিত হই, ধড়েতে
মস্তক আছে, টের পাই সবটাই সম্রাটের দয়া।

সম্রাট : মীর তকি মীর তুমি এক আজব লোক
তারের যন্ত্রের মত টোকা দিলে বেজে ওঠ।
কিন্তু মনে রেখ সদা স্বতঃস্ফূর্ত ভাব
আসলে দুশমন, পলকে লঙ্ঘন করে বিপদ সীমানা।

মীর : জাঁহাপনা, মজে থাকি সর্বক্ষণ অন্তর্গত ধূনে।
আপদ বিপদ আসে কোথা দিয়ে অন্ধ চোখ রাখি
কিছুই দেখিনে কিছুই বুঝিনে আমি, কষ্ট পাই কষ্ট পেয়ে যাব
কষ্টের অমৃত দিয়ে জিন্দেগির পেয়ালা ভরাব।

সম্রাট : মীর তকি মীর, তুমি কবি
আশা করি অনুভবে বুঝে নিতে পার।
তোমার তাবত কালো জ্বলে ওঠে— আরো কালো হয়ে
উচ্চারিত কথার আলোকে। নারী ও পুরুষের
মনের গোপন ঘরে, যেইসব বিস্ফোরক দাহ্যবস্তু থাকে
চকিতে চকমকি ঠুকে লাগাও আগুন
যার তেজে আনন্দে কুমারী করে সতীত্বকে খুন।
তুমি স্থির হয়ে এক দণ্ড থাক না কোথাও।
নগরে, বন্দরে তুলে তীব্র সংবেদন, ছুটে যাও
দেশ থেকে দেশান্তরে অশান্ত ঘূর্ণির মত
যেন এক জ্যান্ত মহামারী।

মীর : জাঁহাপনা, আপনার অন্তর্দৃষ্টি অত্যন্ত প্রখর
হা করলে দেখে ফেলে অন্তর্গত সমস্ত মানুষ।

সম্রাট : ভেবে দেখ আমাকে ফেলেছ তুমি কেমন মুশকিলে।
মোল্লারা তোমার নামে জুড়েছে চীৎকার,
কাটা মুণ্ডু দাবি করে, তা নইলে ধর্ম নাকি
যাবে রসাতলে। সব ক'টা ধর্মস্থানে
বর্শার ফলার মত ধারাল চকচকে প্রতিবাদ
উঠছে জেগে। সবাই সম্রাটের কাছে চায়
যোগ্য প্রতিকার, প্রজাদের ধর্মরক্ষা সম্রাটের
কাজ, অতএব সব দায় সম্রাটের বর্তায়।
তাই আমি মনে মনে দোলাচলে আছি।
আইনগ্রন্থে সায় নেই, কী করে এমন দণ্ড
করি উচ্চারণ।

মীর : জাঁহাপনা, সত্য ন্যায় সুবিচার স্বভাবে প্রোথিত
অন্তরে বিরাজ করে অধরা সুন্দর, এমন সম্রাট
যিনি তাঁর কণ্ঠে উচ্চারিত গুরুদণ্ড ভার

মেনে নেব প্রতিভার যোগ্য পুরস্কার। কিন্তু
তার আগে সবিনয়ে করি প্রণিপাত
অক্ষমের সৃষ্টির প্রতি সম্রাটের হোক দৃষ্টিপাত।

সম্রাট : মীর তকি মীর, কণ্ঠে কণ্ঠে ঘসা লেগে
ফুঁসে ওঠা জনমত নিচ্ছে গতিবেগ। সঠিক
উস্‌কানি পেলে দাবানলে রূপ পেয়ে যাবে
সম্রাটকে সবকিছু বিলক্ষণ জ্ঞাত থাকতে হয়।
তোমার কবিতা দিয়েছে হানা শয়ন মন্দিরে।
মাঝে-মধ্যে ফাঁক পেলে বুলিয়েছি চোখ
মাটি ঘেঁষা ভাষা আর মর্মভেদী সুর,
পুরাতন কবিদের ছন্দ অলঙ্কার তাজিম করনি।
সবকিছু একযোগে ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়ে
আলাদা জগৎ এক করেছ সৃজন, হতে পারে
সুন্দরের এও এক নব্য-নিদর্শন। একে কী কবিতা
বলা যায় অনেক ভেবেছি আমি, কাটেনি সংশয়।
তবে আমাদের রাজকবি, ভিন্ন কথা বলেন। তাঁর মতে
কবিতার সব শর্ত পূরণ হয়নি। কবিতা হয়েছে
কী না আমার বিচার্য নয়। আমি অতি নিরীহ
পাঠক, পাঠ করে প্রীত হলে মনে করি লাভবান হলাম।
শোন আরো এক সুসমৃদ্ধ
অভিজ্ঞতার কথা বলি। এক মধ্যরাতে ঘুম
ভেঙ্গে গেলে তোমার কবিতা হয়েছে বিনিদ্র
রাতের সাথী। অবাক হয়ো না কিছু, সুনিদ্রা
সম্রাট ভাগ্যে কদাচিৎ ঘটে। আতঙ্কেরও কিছু নেই
তাহলে তো সম্রাটকে বনে যেতে দীক্ষা নিতে হয়।
আপাতত সে সময় এখনো আসেনি। শোন তোমার
কবিতা আনন্দে হেসেছি পড়ে, ব্যথায় কেঁদেছি
তালুতে মস্তক রেখে নীরবে ভেবেছি। মনে
হল শিশুবেলা ফিরে পেয়ে গেছি।
কবিতা হয়েছে কী না আমার বিচার্য নয়।
তবু আমি বলতে পারি অকুণ্ঠ সাহসে, আশ্চর্য
ক্ষমতা এক অধিকারে এসেছে তোমার।
আমি হই হিন্দুস্থানে একচ্ছত্র ক্ষমতা প্রতীক, তাই
ক্ষমতার চরিত্র জানি। সে কারণে
মুখ ফুটে না বলতে আমার হৃদয়, আলিঙ্গনে
তোমা পানে ছুটে যেতে চায়।

মীর : জাঁহাপনা, গুণবন্ত বাদশাহ্ সালামত
তেজোদ্দীপ্ত মহিমার সাক্ষাৎ প্রকাশ।
সবিনয়ে মস্তক নামায়ে, আমি দণ্ডবৎ করি
আকাশে উড্ডীন থাক শ্বেতবর্ণ রাজছত্র যুগ যুগ ধরে।

সম্রাট : মীর তকি মীর, অধিকন্তু বাক্যব্যয়
নেই প্রয়োজন। তোমাকে দাওয়াত করি
চলে এস দরবারের শান্ত ছায়াতলে।
দরবারই প্রকৃষ্ট স্থান, সমস্ত গুণের ঘটে
সম্যক বিকাশ, পায় সমাদর। এই হিন্দুস্থানে
যেইখানে যত ক্ষমতার বিস্ফোরণ ঘটে—
ধর্মতত্ত্ব শিল্পকলা অথবা বিজ্ঞান
সম্রাটের উৎস থেকে সমস্ত সম্ভবে।
সম্রাটের মহিমাকে আনন্দে বেষ্টন করে
বিকশিত হয়। যেমন কল্লোলিত নদীধারা
সমুদ্রকে চায়। সম্রাট তো সমুদ্রেরই মত।
দয়াময় নিরঞ্জন আল্লাহ রহমান
সম্রাট আল্লাহর ছায়া করেন ধারণ।
চলে এস দরবারের প্রশান্ত প্রশ্রয়ে।
মুক্ত কর তোমার লেখনি। আমি ধরি
রাজদণ্ড, তুমি তাকে ভবিষ্যতে কর স্থিতিবান
সেই সঙ্গে সম্রাটের মৃত্যুঞ্জয় নাম।

রাজকবি : (অস্ফুটে একজন দরবারির কানে কানে)
আদব লেহাজহীন এক আস্ত ভবঘুরে
দরবারে আসছে তবে, বুঝিবা সময় হল
এইবার পাততাড়ি গুটানোর পালা।

দরবারি : (নিম্নকণ্ঠে)
ভায়া একে বলে কালের গরদিশ
সব খান্দানি শরীফজাদা ঠেকে গেছে ভীষণ মুশকিলে।

রাজকবি : আখেরি যামানা তার দেখাইছে দিব্য নিদর্শন
বাদশাহর খানদান নেই শরীফ গোষ্ঠীর প্রতি খড়গহস্ত তাই
ফাঁক পেলে শরাফতে হাত দেয়া চাই।

দরবারি : ভায়া আস্তে কথা কও, কেউ যদি শুনে ফেলে
দানাপানি মারা যাবে, সেই সাথে মস্তক খোয়াবে।

রাজকবি : পরোয়া করিনে ভায়া বাঁচি কিংবা মরি।
তিনকাল অতিক্রান্ত এককাল আছে।
এরকম সংসারের সম্মানে বঞ্চিত, বেঁচে থেকে
কীই-বা হবে? লাদিয়া কাফিয়া দুই ছন্দের ফারাক

বোঝে না যে আহম্মক দেহাতি বর্বর,
দেখলে আপন চোখে কত সমাদর।
বাঁচব কেন? বাঁচার কী মজা আছে?

দরবারি : আমি ভায়া বাঁচতে চাই।
বাঁচার যে মজা আছে হাড়-মাংসে করি অনুভব
সম্প্রতি চতুর্থবার সাঙ্গ হল শাদীর উৎসব।
নওজোয়ান খুবসুরত সুতনুকা নতুন বেগম
দৃষ্টির আড়ালে গেলে বন্ধ হয় দম।
(কবির কাছ থেকে নিরাপদ দূরত্বে সরে বসল)

মীর : জাঁহাপনা, জান্নাতুল ফিরদাউস হতে জনক জননী
পাঠাচ্ছেন নিত্য শুভাশীষ, করেন কামনা সম্রাটের
সর্বাঙ্গীণ কুশল কল্যাণ। আয়ুষ্কাল সম্রাটের
দীর্ঘস্থায়ী হোক, সহস্র বছর হোক সাম্রাজ্যের আয়ু।
হাশরের মাঠে নবীর শাফায়েতরাশি ঝরুক
বৃষ্টির মত সম্রাটের শিরে। শেষ বিচারের
দিনে আল্লাহর রহমত যেন হয়ে স্নিগ্ধ ছাতা
আদরে আবৃত করে লোকমান্য মাথা।
সম্রাট সন্তাপ হন্তা জাগ্রত কল্যাণ, সার্বভৌম
সর্বশ্রেষ্ঠ, তুচ্ছতম সন্তোষ সাধনে, ইচ্ছে করে
দেহপ্রাণ করে দেই, নিঃশেষে কুরবান।
জমকালো দরবার কক্ষে থরেথরে নক্ষত্রের মত
দীপ্তিমান জ্ঞানীগুণী প্রতিভার বিচিত্র বিন্যাস,
দেখামাত্র অন্তরে ঘনিয়ে ওঠে প্রশংসার বেগ।
ধন্য ধন্য বলি বাদশাহ আলম্পনা, স্বচক্ষে
দেখছি বটে, তবু ভাবি সত্য নয় স্বপ্ন কিংবা চলমান
দুর্দান্ত কল্পনা। আমি তো দেহাতি লোক
সর্বক্ষণ ভয়ে ভয়ে থাকি, এমন তৌফিক নেই
অক্ষমতা ঢাকি। বুলিতে মাটির গন্ধ, লেবাসে
মিসকিন, ভাঙ্গাচোরা মানুষের সঙ্গে কাটে দিন।
ঝলমলে দরবার কক্ষে যারা আসে যারা যায়
দিব্যকান্তি দিব্য দেহধারী, অশেষ আশীষপ্রাপ্ত
তেজ বীর্য ঐশ্বর্যের অংশ অপহারী।
আমি তো সামান্য লোক ঘুরি পথে-ঘাটে
খুঁজে পাই আপনারে মানুষের হাটে।
যেন নবীন জান্নাত খণ্ড বাদশাহর দরবার
ধুলিমাখা দু'চরণ স্পর্শে হবে কলঙ্কিত
রক্তবর্ণ গালিচার পাড়। মহামান্য বাদশাহ সালামত
ফিরে যাই নিজ বাসে চাই এজাজত।

সম্রাট : স্বেচ্ছায় আসনি তুমি এসেছ তলবে
যাই বললে যাওয়া হয়, এটা কেন হবে?

মীর : জাঁহাপনা, আমার উতলা প্রাণ, বলে যাই যাই।
আলীশান দরবার কক্ষ-সুপ্রশস্ত, ঝাড়বাতি
মণিমুক্তো উজ্জ্বল গালিচা, শিরোপরে শোভা পায়,
স্বর্ণ চন্দ্রাতপ। সুবেশ সুন্দর নর বসে সারি সারি
ফেরেশতার মত নম্র সুশীল দরবারি। মনে হয়
জন্মেনি নারীগর্ভে। সম্রাটের আকাঙ্ক্ষায়
স্বর্গ হতে নেমেছে সবাই। অনুভব করি,
অন্তঃস্থ শ্রবণে শুনি নীরব ধিক্কার, কী
চাস্ এখানে তুই গাঁয়ের গোঁয়ার।

রাজকবি : আগন্তুক কবিবর, সুক্ষ্মতর মারপ্যাঁচ
কথার কৌশলে প্রচ্ছন্ন অহমিকা থাকেনি গোপন।
পরিষ্কার অতি পরিষ্কার, অবাধ্যতা অহঙ্কার
দারিদ্র্যের উদ্ধত বড়াই— এ সকল সারবস্তু
যেন মহামান্য সম্রাটের কোন মূল্য নেই।

মীর : রাজকবি ভাই, আমি সঙ্কুচিত অস্তিত্বের কারণে অস্থির
ব্যথিতকে ব্যথা দেয়া উচিত কবির? এও এক
অভিজ্ঞতা আপনার জবানীতে, উচ্চারিত
বয়ানের অর্থ পাল্টে যায়।

কোতোয়াল : মীর তকি মীর, গাঁজা ভাঙ নেশার অধীন
মধুর মৌতাতে কাটে আপনার দিন। সুখরাজ্যে
বসবাস তাই, কী করেন, কী বলেন ঘটে বিস্মরণ।
অন্যরা তেমন বটে ভাগ্যবান নন, শুনলে শ্রবণে
বাক্য গেঁথে রয় মনে। বলবেন কী স্পষ্ট করে
কী কারণে দরবারে বিরাগ? কেন চিত্তে সুখ খুঁজে পান
সম্রাটের আমন্ত্রণ করে প্রত্যাখান?

মীর : শক্তিমন্ত কোতোয়াল, অতল রহস্য ভেদী সুতীক্ষ্ণ
সন্ধানী দৃষ্টি, এই নয় আমাদের প্রথম সাক্ষাৎ
নাজুক সময় গেছে বড্ড অসহায়। আপনার অগোচর নয়
গুটিকয় দুর্বলতা, কুপথ্যের রুচি। অনুকম্পা বলে
নগরীতে মুক্তভাবে করি বিচরণ, সওয়াল তো অর্থহীন
কেবল দর্শন মাত্র কম্প দিয়ে গায়ে আসে জ্বর।
যে মানুষ বেসামাল তারে অধিক জেরবারে ফেলা
পৌরুষের পরিচয় নয়।

সম্রাট : মীর তকি মীর, নয় সবটুকু যুক্তিহীন তোমার ওজর।
একটুখানি শঙ্কা থাকা ভাল। সমুন্নত সম্মানিত

মহত্ত্বে উড্ডীন উর্ধ্বে, আল্লাহর আর্শের নিচে
যোগ্যজন সম্মিলনি ঝুলন্ত দরবার,
ধরে আছে দৃঢ়রূপে সুমহান সাম্রাজ্যের ভার।
সাহসী বিদ্বান ধর্মশীল প্রজ্ঞাবান অর্থশাস্ত্রে
পারদর্শী, যুদ্ধবিদ্যা বিশারদ, যোগ্য বিচারক
ভালমত চিকিৎসার অন্ধিসন্ধি জানে
নক্ষত্র-জ্যোতিষবিদ্যা বিশারদ, কাব্যকলা, শিল্পকলা
কিমিয়ার জ্ঞান, দর্শনে নতুন কিছু বিজ্ঞানের
নয়া উদ্ভাবনা, জগৎ ও জীবনের নতুন ভাবনা
টেনে আনে যারা নাচিকেত প্রশ্ন বাণে, দরবারে
হংসের মত করে বিচরণ। বংশগত অভিজাত
ভারে কাটে যারা, তাহাদের সংখ্যাবৃদ্ধি যুক্তিযুক্ত নয়,
ষড়যন্ত্রে মত্ত থাকে সকল সময়। ফিতরাতে
ধনী যারা, নিসর্গ যাদের চিত্তে অন্তর্দৃষ্টি রেখা
এঁকেছে নিবিড় করে বিদ্যুৎ লেখায়, বিরল
সে মনুষ্য প্রজাতি ঢুঁড়ে ঢুঁড়ে সারা হিন্দুস্থান
আনন্দে সংগ্রহ করি উজ্জ্বল প্রতিভা। মণীষার
স্বর্ণদীপ্তি, বর্ণময় বিভা আলোকিত করে রাখে
দিগদিগন্তর। বড় সাধ সাম্রাজ্যের নয় শুধু,
জগতের নাভিকেন্দ্র রূপে দরবারের করি রূপায়ণ।
নিছক খেয়ালে নয় অতি প্রয়োজন। মেধা ও মনন বলে
নতুন জগৎ এক করব সৃজন। নতুন মানুষ
চাই প্রাণরসে টগবগ জীবন্ত মননে
অন্তর্দৃষ্টি বিদ্ধ করে যুগের সীমানা।
মীর তকি মীর, তোমার খান্দান নেই ক্ষতি কীই-বা তাতে
সম্রাট স্বয়ং খান্দান স্রষ্টা, খান্দানের
ভারবাহী নন। যেহেতু তোমার প্রাণে প্রতিভার দ্যুতি
মিশে আছে, উচ্চারণে স্ফূর্তি পায় আশ্চর্য বিভূতি,
ধরে নাও পেয়ে গেছ নিসর্গের বর। তার সঙ্গে
যুক্ত হলে সম্রাটের সদিচ্ছার বেগ অনায়াসে
টপকে যাবে দরবারের সিঁড়ি। আদি যুগে ভাগ্য
ছিল নিয়ামক, মানুষ বিশ্বাসী ছিল ললাট লিখনে।
হালে রাজকীয় অনুগ্রহ ভাগ্যের স্থান করে
অধিকার, সম্রাটের মহিমাকে করে সম্প্রচার।
সম্রাটের সুনজর, পলকে ঘটাতে পারে জন্ম-জন্মান্তর।
মীর তকি মীর, সৌভাগ্য দুয়ারে এসে করে করাঘাত।
বাড়িয়ে দক্ষিণ হাত তুমি শুধু ডেকে নেবে ঘরে।

দেখ হৃদয়ে শ্রবণ পেতে শুনতে পাও কী-না
আয় আয়, দরবারের অন্তহীন মধুর আহ্বান,
অন্তরে ঝঙ্কারে কী-না আনন্দের গান।

মীর : মহামান্য বাদশাহ্ আলম্পনা, সুপ্তপ্রাণে আনে সঞ্জীবন
এরকম শক্তিমন্ত প্রকাণ্ড কল্পনা। শুধুমাত্র কৃপা
দৃষ্টিপাতে তুচ্ছ বস্তু প্রাপ্ত হয় স্বর্ণের গরিমা।
মণি-মুক্তো সুশোভিত, হীরক খচিত, পদ্মরাগ
নীলকান্ত মণির ঝিলিক ঝুলন্ত চাঁদোয়া তলে
স্বপ্নময় রত্ন সিংহাসন-বেষ্টিত দরবার।
সমুদ্রস্তনিত এই গোটা হিন্দুস্থান, তার অন্তরাত্মা
যেন স্ফটিকে গঠিত, স্ফটিকের স্তম্ভ সারি সারি
মর্তবাসী মানুষের কামনার সার, পরাক্রান্ত
ভূমি স্বর্গ ঝলমলে দরবার। যদি ডাকে
কার সাধ্য করে প্রত্যাখান, ফিরায় দরবার
যারে এই বিশ্ব ভূমণ্ডলে তার কোথা স্থান?
সম্রাট স্বয়ং এক অয়স্কান্ত মণি, ছোঁয়া মাত্র
ব্যক্তি হয় সার্বভৌমে লীন, থাকে না স্বতন্ত্র সত্তা
যেজন স্বাতন্ত্র্যবশে শিরদাঁড়া মেলে ভিন্ন হতে
চায় স্পর্ধায়, সাক্ষাৎ মরণ তার কোন্ জন ঠেকায়?
জাঁহাপনা এই বেলা বোধগম্য হল, কেন
বলে লোকে, দিল্লির ঈশ্বর বটে জগৎ ঈশ্বর।
খাকসার স্বভাববদ্ধ তুচ্ছ শব্দ দাস
তারও প্রাণে সম্রাটের তেজস্ক্রিয় চিন্তার
বাতাস সৃষ্টি করে ভূমিকম্প। এক অংশ
চায়, সিঁড়ি টপকে স্বর্গলোকে করে আরোহণ
অন্য অংশ শুধু বলে পালাই পালাই। মনে মনে
দ্বিধান্বিত দ্বিখণ্ডিত আমি। এ পরম শুভক্ষণে
কেন জাগে মনোলোকে ভীষণ সংশয়!

সম্রাট : মীর তকি মীর, অন্তরে হিম্মত রাখ।
ঘটে যাচ্ছে জন্মান্তর। নতুন জন্মের এই সুতীব্র
বেদনা অন্তর্গত রক্তপাত, ক্ষণকাল সহ্য কর।
মনুষ্য জীবনমাত্র দ্বন্দ্বের অধীন। এইভাবে
কিছুকাল যাবে, তারপরে তুমি হবে নতুন মানুষ।

মীর : জাঁহাপনা, বুকে হাত দিয়ে আমি করি অনুভব
আমাকে আঁকড়ে আছে নানা বর্ণ দৃশ্যপট,
সপ্ত স্তর শব্দের গুণ্ঠন। যদি চোখ রাখি টের পাই
বন্দী আমি, ছাড়াতে পারিনে মায়া অন্তরাত্মা বাঁধা,

হাবিজাবি কত কিছু, তারই মধ্যে জীবনের ভালবাসা
সাধা। আমাকে তাড়িয়ে নিয়ে যায় পাড়াগাঁর
শান্ত সন্ধ্যা, বিহঙ্গ কাকলি, দেহাতি হালট রেখা
লম্ফমান গোবৎসের স্নিগ্ধ হাম্বারব। কিষাণের
কুঁড়েঘরে উৎসবের ধুম। মাঠে মাঠে পোয়াতি গমের শীষ
যেন দোলে প্রেয়সীর শাড়ির আঁচল।
নির্জন ঝরণার গান, গৃহে ফেরা পশুদের ধীরে পথ চলা,
গলায় ঘণ্টার ধ্বনি। আষাঢ়ের আকাশে ঘনায়
ঘন পনীরের মত কৃষ্ণবর্ণ মেঘ, বর্ষণ উন্মুখ,
নবীন বৃষ্টির বেগে খেলে যায় সুখ। উৎফুল্ল
ধীবর পল্লী, মেঘের মতন কেশ মৎস্যগন্ধা নারী
কটাক্ষে হৃদয়ে হানে নির্মম কাটারী। প্রসারিত
শস্যক্ষেত্র, সুবঙ্কিম যমুনার তীর, কালের
গতির মত রজত রেখার ধারা ধীরে ধীরে বয়।
নগরে প্রবেশ দ্বারে হিজরের বাথান, গণিকা পাড়ার হল্লা
মাতালের আস্ফালন, বেলাবেলি মদ জুয়া গাঁজার আসর।
খসরুর মাজারে ওঠে স্বর্গসুখ জাগানিয়া কাওয়ালির সুর।
আল্লাহ্‌র করুণা ধন্য কাকী বখতিয়ার, পবিত্র উরসরাতে
অনুরাগে নত হয়ে নেমে আসে আল্লাহ্‌র আরশ।
এইসব পরিচিত স্থান যেন মাতৃ অঙ্ক বেঁধেছে হৃদয়
মনে বন্ধনের ডোর। যতক্ষণ কাছাকাছি থাকি
অপূর্ব আনন্দ প্রাণে ভিড় করে। নিশ্বাস প্রবাহের মত
বাক্যধারা সতত উজায়। উচ্চারিত শব্দে জাগে
ছন্দের ঝংকার। কখনো সখনো মনে হয়
কবিতার জন্মভূমি আমার হৃদয় নয়, গভীর মাহাত্ম্যপূর্ণ
এইসব স্থান। শিশুকাল থেকে গণ্য করি বিধাতার
অকৃপণ দানে পরিপূর্ণ আমার ভাণ্ডার।
চঞ্চল বালক যেন অব্যক্ত পুলকে চয়ন বয়ন করে
শব্দের মালিকা, ভরাই থালিকা ছন্দ মাত্রা
অলঙ্কার সহযোগে। পিপুল শাখায় বসে যে
কোকিল গান গায় যে বুলবুল লেজ নেড়ে ছুটোছুটি করে,
ভেবেছি তাদের সাথে জুটি বেঁধে এই জনপদে
মনের আনন্দে শুধু গান গেয়ে যাব।
সুখ নয় স্বর্গ নয় জগত প্রাণের মাঝে ঢেলে দেব প্রাণ।
আমি তো আমার নয়, নেপথ্যে অদৃশ্য শক্তি
আমারে চালায়। ক্ষিপ্রবেগে অর্ধেক অস্তিত্ব যেন
কেড়ে নিয়ে যায়। সম্রাট সংকট ত্রাতা সবিনয়ে

রাখি নিবেদন, সমীচীন নয় পিঞ্জিরায়
বন্দী করা কাননের পাখি।

রাজকবি : আগন্তুক কবিবর প্রশ্ন রাখি। আপনার
বয়ান চাতুরি নিঃসন্দেহে চমৎকার। সত্য কথনের
ছলে অপকৃষ্ট রুচির প্রকাশ,
আদব ও লেহাজের কোন গন্ধ নেই। হিজরে পল্লী
গণিকা আলয় আপনার বর্ণনায় কেন স্থান পায়?
কোতোয়াল যে গোপন ফর্দ করেছে দাখিল
আপনার অপরাধ তার চে' অধিক। সম্রাট
স্বয়ং এক দয়ার সাগর, হিংসে নিন্দে অপবাদে
নিশ্চেতন, আপন মহত্ত্বে স্থির। একটা
পরীক্ষা হল, ক্ষেপা মোষের মত ঢুঁস দিয়ে
দেখলেন অটল গম্ভীর যে পর্বত, তারও যদি ধৈর্যচ্যুতি ঘটে!

প্রথম দরবারি : রাজকবি পেশাগত ঈর্ষা থেকে মুক্ত নন
তবে মীর তকি মীর এক বাহাদুর কবি। খাস্‌লতে
অপদার্থ, আত্ম কিংবা পর, সকলের প্রতি তার সম অবিচার।

দ্বিতীয় দরবারি : কবি হলে কীই-বা হল, পাগল তো নয়
এরকম বেলেহাজ বেতমিজ ফাহেসা জবান
বাদশাহ্‌র উচিত তার যোগ্য দণ্ড দান।

তৃতীয় দরবারি : কী রকম দণ্ড হলে ভাল শিক্ষা হয়?

প্রথম দরবারি : মৃত্যুদণ্ড অঙ্গচ্ছেদ, অবশ্যই নয়।

দ্বিতীয় দরবারি : তাহলে তো ভাড়া করে আনতে হয়
আরো এক কবি, স্বভাবে কবিতা লেখে পেশায় কসাই
প্রতি বাক্যে হানে যেন মুগুরের ঘাই।

প্রথম দরবারি : কারো যেতে হবে না কোথাও। রাজকবি
যোগ্য লোক, একটু বয়স বেশি, তথাপি দায়িত্ব দাও
দেখতে পাবে কী কঠিন কথার আঘাত
প্রতি বাক্যে দরদর ঘটে রক্তপাত।

প্রধান উজির : (একটু কেশে) জাঁহাপনা, দরবারের মান রক্ষা
সম্রাটের দায়। আপনার আমন্ত্রণ করে প্রত্যাখান
মীর তকি খারাপ দৃষ্টান্ত এক করেছে স্থাপন,
পরিণাম ভয়াবহ। এই কথা রাষ্ট্র হলে ঢি ঢি
পড়ে যাবে। সার্বভৌম সম্রাটের আদেশ অমান্য
করে তুচ্ছ এক কবি, তাহলে তো ঘটতে পারে সবই।
সামন্ত রাজন্যবর্গ, দরবারে দরবারি, সুবাদার
মনসবদার, হাজারি, গাজারি, যদি আপন ইচ্ছের বেগে

ছুটে দিশেহারা, কি করে শাসন চলে
ভীষণ নাজুক হবে সাম্রাজ্য পাহারা।

সম্রাট (স্বগত) : মীর তকি মীর, শুরুতেই সতর্ক করেছি।
সদা স্বতঃস্ফূর্ত ভাব আসলে দুশমন। আশঙ্কা
সঠিক হল, উজানি মাছের মত কানে হেঁটে
এসে গেলে আইনের আওতায়, তোমার নিস্তার নেই।

প্রকাশ্যে : মীর তকি একথা কী ঠিক!
সম্রাট-আজ্ঞা লঙ্ঘন কর এত স্পর্ধা, এত বড় জেদ।

মীর : জাঁহাপনা, খোদাবন্দ বাদশাহ্ মেহেরবান
আমার জিন্দেগি হোক আপনার খেদমতে কুরবান।
সম্রাটের আমন্ত্রণ সম্মানের উত্তরীয় হয়ে
সর্বাঙ্গ আবৃত করে রয়েছে জড়িয়ে।
আমি হই তেমন এক মন্দভাগ্য লোক
শিরোপা সম্মান আর উচ্চতর মহত্ত্ব গৌরব
যার হৃদয় ধর্মের কাছে মানে পরাভব। সম্বল
হৃদয় মাত্র, নিবেদন তাই, টুটা-ফাটা প্রাণ নিয়ে
অভ্যস্ত জীবনে আমি ফিরে যেতে চাই।

সম্রাট : মীর তকি মীর, তোমার হৃদয় ধর্ম
সম্রাটেরও রাজধর্ম আছে। দুই ধর্ম পরস্পর মুখোমুখি
পথে দাঁড়িয়েছে। সম্রাট হৃদয় ধনে ভাগ্যবান
নন, সম্রাটকে চালায় কানুন। আজ্ঞা লঙ্ঘনের
দায়ে অভিযুক্ত তুমি, অপরাধ লঘু নয়, শাস্তি পেতে হবে।
(দরবারিদের দিকে তাকিয়ে)
আপনারা স্থির করুন, কী শাস্তি দেয়া যায়।

দ্বিতীয় দরবারি : অপরাধ জমকালো
সোজাসুজি শিরশ্ছেদই ভাল—

প্রথম দরবারি : তাহলে তো সম্রাটের নামে
দারুণ কলঙ্ক রটে। ভাবি ইতিহাসে
একথা লিখিত হবে। চিত্তসুখ লাগি
সম্রাট নিয়েছেন ক্ষ্যাপাটে কবির প্রাণ।
যা কিছু লিখিত হয় কালির অক্ষরে
টিকে থাকে বহুদিন বহুযুগ ধরে।

তৃতীয় দরবারি : দুই হাত কেটে যদি ছিন্ন করা হয়!

প্রথম দরবারি : লাভ নেই তাতে, মূল উৎস অন্যখানে
জিহ্বা থেকে অনর্গল কবিতা বেরুবে।

তৃতীয় দরবারি : একসঙ্গে দুই হাত জিহ্বার কর্তন
করা হলে শাস্তি হয় উচিত মতন।

চতুর্থ দরবারি : কাটাকাটি মারামারি এসব কী কাজ
একযোগে কেড়ে নাও সংসার সমাজ।
নির্বাসন দণ্ড দাও যাক দেশান্তরে
মরু কী সাগর দ্বীপে মরুক সত্তরে

প্রথম দরবারি : উত্তম প্রস্তাব বটে ফাঁক আছে ম্যালা
যদি জানে সম্রাট শত্রু তাহলে ঘাপলা।
মীর তকি পায় যদি নয়া দানাপানি
গদ্যে পদ্যে লিখে যাবে সম্রাটের গ্লানি।
তকিকে শাস্তি তো পেতে হবে অবশ্যই
অন্য কোন পন্থা দেখ নির্বাসন নয়।

দ্বিতীয় দরবারি : প্রথম দরবারে আমে কবির বিচার
বিষয়টা অভিনব ভাব ভাষ্যে চমৎকার।
একসঙ্গে মণি আর কাঞ্চনের যোগ
দাবি করে সকলের তীক্ষ্ণ মনোযোগ।
শূলদণ্ড, কারাদণ্ড, দণ্ড নির্বাসন
অঙ্গচ্ছেদ মুণ্ডুচ্ছেদ হাত পা কর্তন।
শুনে শুনে প্রতিদিন এ সকল রায়
সয়ে গেছে সকলের জলভাত প্রায়।
ধারা উপধারা আছে ঠেসে দিলে হল
ভেবেচিন্তে কাজ নেই,
কার হল বংশ নাশ কার প্রাণ গেল।
মীর তকির মামলাটি আসলে জটিল
আইনগ্রন্থ আসে না কাজে, অতএব শাস্তি হওয়া
চাই সৃষ্টিশীল।
কল্পনা হাত পা মেলে খেলা করা চাই
তাহলেই পাওয়া যাবে মীরের দাওয়াই।
জিন্দানে ক্ষুধাতুর রেখে পুর্ণ তিনদিন
মীরকে শুনাতে হবে কবিতা ও বীণ।
পালাক্রমে প্রণয়িনী গণিকারা এসে
গেয়ে যাবে তকি মীর বিরচিত গান
দেখবে চতুর্থ দিনে কেচ্ছা খতম
স্বরচিত কাব্য হল হন্তারক যম।
পরিষ্কার, আমাদের সকলের বিবেক উজ্জ্বল,
মীরের প্রকৃত হন্তা নিজ হস্তে রচিত গজল।

প্রধান উজীর : মহামান্য বিদগ্ধ আমীর
উর্বর কল্পনাশক্তি, যুক্তিযুক্ত শাস্তির প্রস্তাব
ফাজিল কবির ভাগ্যে এও এক লাভ। বোঝা গেল

সম্রাটের দরবারে সেও তুচ্ছ নয়
বিদগ্ধ আমীর করে এতখানি চিন্তাশক্তি ক্ষয়।
দেখা যাবে যুদ্ধক্ষেত্রে গুজরাট কাবুলে
কল্পনা সম্বল করে জয় যদি মেলে।

ভাঁড় : প্রবল প্রতাপ নিয়ে হাজির বাদশা হুজুর।
আসমানের সুরুজের মত মহামান্য সম্রাটের অখণ্ড প্রতাপ। যদি সম্রাট হুজুর একজন হিজরের দিকে প্রসন্ন দৃষ্টিতে তাকান অমনি তার শরীর ভেদ করে যৌবন দেখা দেবে। অমন সম্রাটের জান্নাত সদৃশ দরবারে বসে আপনাদের পরামর্শগুলো শুনে শুনে আমার বুড়ো শরীরে বাত ধরে গেল। আপনারা নকশাদার কথা বলেন খুব ভাল। চিবিয়ে দেখলাম ওতে সার পদার্থ অধিক নেই। এই খবিস মীর তকিকে শায়েস্তা করার জন্য অতখানি কল্পনা-জল্পনা করতে হবে কেন? আমার হাতে আছে তার মোক্ষম দাওয়াই। সম্রাট হুজুর! উজিরে আজম বাহাদুর! দরবারি ভাইরা! একটু মনোযোগ দিয়ে শুনুন।
আমি এই হারামজাদাকে এমন শাস্তি দিতে পারি, কবিতা রচনা লাটে উঠবে, আর মরতে চাইলেও মরতে পারবে না। বিছুটি লাগিয়ে দিলে জ্বালা-যন্ত্রণায় মানুষ যেমন মাটিতে গড়াগড়ি দেয়, মীরের ব্যাটাকেও অমন করে তামাম জিন্দেগি কাটাতে হবে।

সম্রাট : (ঈষৎ হেসে) দোস্ত মস্ত গলদ হয়ে গেছে। প্রথমে তোমার মতামত চাওয়া হয়নি। এখন তোমার ভারি এবং মহামূল্যবান মতামত উচ্চকণ্ঠে প্রকাশ কর।

ভাঁড় : সম্রাট হুজুর, আমার সঙ্গে এক খাণ্ডারনী আওরতের জান পহচান আছে। তার নাম মেহেরজান বানু। মেহেরজান বিবি দরিয়াগঞ্জে থাকে। বয়স পঁয়তাল্লিশ হবে। তাহলে কী হবে, শরীরে খুব ঢলানি আছে। দাঁতে মিশি দেয়, মাথায় বাস তেল মাখে। সেই মেহেরজানের সঙ্গে আমি মীর তকির শাদির ব্যবস্থা করব। দেখবেন দোসরা দিনে তার অবস্থা গয়া। এ পর্যন্ত মেহেরজান ষোলজন খসমকে বেমালুম হজম করে ফেলে সতরজনের এন্তেজারে রয়েছে। পয়লা শাদি করেছিল সলিম বেগকে। সে ছিল সম্রাটের বাহিনীতে তুরানী ঘোড় সওয়ার। মেহেরজানের চোটপাটে অস্থির হয়ে সে একবারে তুরান পালিয়ে বেঁচেছে। তার দোসরা খসম ছিল মীর্জা নাসের। সে সম্রাটের খাজাঞ্চিখানায় পেয়াদার কাজ করত। মেহেরজানের সঙ্গে শাদি হওয়ার একত্রিশ দিনের দিন পিপুল গাছে ফাঁসি দিয়ে ভবলীলা সাঙ্গ করেছে। সকালে উঠে সকলে দেখল, তার শরীরে কাক ঠোকরাচ্ছে। তার তেসরা খসম ছিল শের মাস্তান খান। সে ছিল জবরদস্ত কাবুলি

পাঠান। বাজারে হিং এবং শিলাজুত ফিরি করত। এই পাঠানের বাচ্চাটি ছিল খুব তেজিয়ান। অতিকষ্টে মেহেরজান তার হাত থেকে মুক্তি পেয়েছে। জিন্দেগিতে মেহেরজান বিবি মাত্র একবারই কষ্টে পড়েছিল। আরো বলব হুজুর?

সম্রাট : ইয়ার, আর নয় ঢের হয়েছে। বুঝতে পারছি তোমার মেহেরজান খুব বিক্রমশালী আওরত। মীরের সঙ্গে শাদি দেয়ার বদলে সেনাবাহিনীর সিপাহশালার করে দিলে মেহেরজান বিবির বিক্রমের প্রতি সুবিচার করা হয়।

ভাঁড় : সম্রাট হুজুর, ভাঁড়ের সঙ্গে আবার ভাঁড়ামি করছেন না তো। তাহলে দীলে আমি মস্ত চোট পেয়ে যাব।

সম্রাট : [মীর তকি মীরকে বাইরে দর্শকের সারিতে সরিয়ে নেয়ার ইঙ্গিত করলেন এবং দরবারিদের সন্নিকটে আসার আহ্বান জানালেন।]

উজিরে-আযম! সমবেত বন্ধুবর্গ! দরবারি সুজন!
বিষয়টা হাল্কা তবু দাবি করে সকলের মস্তক মন্থন।
বাইরে সরল বটে অভ্যন্তরে গ্রন্থিময়
একটা বিহিত করা জরুরি ফরজ।
আমার প্রতীতী হয় অদ্যকার দরবারের
সিদ্ধান্তের সার, মিটিয়ে বিশেষ দাবি
সুবর্ণরেখার মত, আইনে নতুন মাত্রা করবে সংযোগ।
অতএব পূর্বাপর বিবেচনা অত্যন্ত জরুরি।
যেন দণ্ড হয় যথাযথ ইতিহাসে মুক্তি যেন পায় দণ্ডধারি।
এখন মুশকিল হল চন্দ্রাহত বদ্ধোন্মাদ হলে
মানে মানে করা যেত মীরকে বিদায়, আমাদেরও
চুকে যেত দায়। মীর তো পাগল নয় আপন
স্বভাবনদ্ধ জাগ্রত প্রতিভা গনগনে অগ্নিগিরি
তার পক্ষে সমস্ত সম্ভব। মেজাজ
প্রসন্ন হলে মধু বরিষণ অন্যথা করে বসে
অনল উদগার। কতিপয় পাখি আছে,
আপন কণ্ঠের গানে মুগ্ধ হয়ে বনে বনে থাকে,
সোনার পিঞ্জর দেখে শিহরে শঙ্কায়
তকি মীর তেমনি বিরল এক বদ্ধ সিদ্ধ লোক
প্রাণের আগুনে সেঁকে সৃষ্টি করে শ্লোক।

যদি এই বিচার আসনে বসে বিশ্বজয়ী বাদশাহ্
সিকান্দার, মীরের কী দণ্ড হত জিজ্ঞাসে
অন্তর। জানিনে দরবারে দাওয়াত করা
ঠিক হল কী-না। আপনারা সাক্ষী সব

যেমন বুনো ঘোড়া গ্রীবা নেড়ে বলে দেয়
নেবে না সোয়ারী, মীরের উক্তির সঙ্গে
কোথা যেন মিল আছে ভাবি।
সম্রাট আজ্ঞা দর্পভরে এমন ফেলায়, যেজন
লঙ্ঘন করে, মৃত্যুদণ্ড তার জন্য লঘু শাস্তি হয়।
তবে একথাও মিথ্যে নয়, ভিন্ন অবস্থান থেকে মীরের
তারিফ করা নিতান্ত সহজ। যেহেতু কবির কণ্ঠে
মূর্ত হন স্বয়ং ঈশ্বর, শর্তহীন স্বাধীনতা
কবির ফুসফুস যন্ত্রে হাওয়ার মত করা চাই
দিব্যি চলাচল। মীর তকি মীর নিজস্ব বয়ানে
সম্রাটের মহিমাকে করে অস্বীকার স্পষ্ট
ঘোষণা করে নিজের আপন ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র সম্রাট।
যমুনার তীর, দেহাতি হালট রেখা, আষাঢ়ের
ঝিমিঝিমি মেঘ বরিষণ, ঝিলমিলে ধীবর পল্লী
অপদার্থ হিজড়ে আর পাপিষ্ঠা গণিকা, ফুলপাখি
শস্যক্ষেত্র পতঙ্গ চীৎকার সকলের প্রভুরূপে
করে অবস্থান। এখন মানুষ হল
এই সুবিস্তৃত রাজ্যপাট যেন তার কবিতার মর্মকোষ
নিত্য নিত্য প্রাণ রসে ফলে ওঠে ছন্দোময় শব্দের
ঝংকার, রাজস্বরূপে মীর তকি কাব্যরাজি
পায় উপহার। ক্ষুদ্র হোক হোক বাহুবীর
মীরের জবানে আছে ছদ্মাকারে বিদ্রোহের
সুর, অপরাধ দণ্ডযোগ্য অপরাধ, অনিচ্ছায়
ঘটে যাওয়া হঠাৎ প্রমাদ নয়। মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্য তার
যদি হয় কার্যকর, শঙ্কা করি আমরা লজ্জিত
হব ভবিষ্যৎকালে। তাই আমি মনে মনে
সকলের বয়ানের মর্মবস্তু করেছি চয়ন। আর
নিজস্ব সিদ্ধান্ত বলে অভিনব শাস্তি দণ্ড করি
উচ্চারণ, ইচ্ছেমত চলাফেরা মীরের বারণ।
স্থাবর কী গতিমান, দৃশ্য কী অদৃশ্য কল্পনার যত
রাজ্যপাট, আইনের খড়্গের ধারে সমস্ত লোপাট
হল। যমুনার তটরেখা, দেহাতের পথ, হিজড়ে
গণিকাপাড়া, ধীবর কুটির, খসরুর বাজারে আড্ডা
কাজী বখতিয়ার, পাপকেন্দ্র পুণ্যস্থান সবখানে
ছদ্মবেশে থাকবে প্রহরী। কোনখানে কালো মুখ
দেখাবে না মীর, নিষেধাজ্ঞা জারি হল। এই মতো স্থির।
নগরে চাঁদনি চকে সঙ্কীর্ণ কুটিরে একলা একাকী

সঙ্গী সাথীহীন, মীরকে কাটাতে হবে জীবনের দিন।
ঢোলবাদ্য সহযোগে এই দণ্ড বলে দাও হেঁকে
তকি মীর উচ্ছেদ হল কাল্পনিক
রাজ্যপাট, কবিতার মর্মকোষ থেকে।

দরবারি বৃন্দ : সাধু! সাধু! সাধু!
মারহাবা মারহাবা
এরকম সুবিচার আমাদের সম্রাটের সম্ভব।

মীর : এতক্ষণ ঢাকা ছিল ঘন কৃষ্ণ মেঘে
স্বরূপে প্রকাশ পেল ঝড়ো হাওয়া লেগে
সম্রাটের অগ্নিক্ষরা তীব্র জ্বালামুখ
শূলপাণি দণ্ডধারি মানবিক করুণা বিমুখ।
নিক্ষিপ্ত বজ্রের দাহ নামুক নামুক।
অপমান অসম্মান কলঙ্কের ভার
নামুক কবির ঘাড়ে ভাগ্যের তরবার।
অত্যাসন্ন অন্ধকারে চিরস্থায়ী হোক
গম্ভীর জমাট বাঁধা স্তব্ধতর শোক
অনাদি অনন্তকাল নয় পরমায়ু
প্রাণের সন্তাপ নেবে জল আর বায়ু।
এই প্রাণ অন্ধকারে কোন একদিন
সময় সিন্ধুর বুকে হয়ে যাবে লীন।
হাওয়াতে খোদাই করা অমর অক্ষরে
আমার করুণ মুখ যুগ যুগ ধরে
সময় সাগর বুকে বিদ্রোহী পদ্মের মত ছড়িয়ে সুঘ্রাণ
গেয়ে যাবে মুক্তি প্রেম আনন্দের গান।
হে সম্রাট তাই হোক, তবে তাই হোক
নিক্ষিপ্ত বজ্রের দাহ নামুক নামুক
অপমান অসম্মান কলঙ্কের ভার
নামুক কবির ঘাড়ে ভাগ্যের তরবার।

[মীর তকি মীর দু'হাতে মুখ ঢাকলেন। দু'জন প্রহরী তাঁকে টেনে নিয়ে গেল।]

মানুষ দাঁড়াবে তবু

খল খল ছল ছল জলের তস্কর
তরল থাবায় গিলে খায় বাড়ি-ঘর
হাট-বাট, গ্রাম-গঞ্জ, দোকান-বাজার
সোনার ফসল মাঠে সব ছারখার।

ইসকুল, কারখানা আর মন্দির, মসজিদ
প্রহারে জর্জর করে জলের এজিদ।

জীবনবিনাশী জল থইথই ফণা তুলে নাচে
পালিয়ে মানুষজন মরে মরে বাঁচে।
গৃহচ্যুত নর-নারী, শিশু-বুড়ো কোথায় পালাবে
পরিচিত ডাঙ্গা ছেড়ে কতদূর যাবে?
কতদূর যেতে পারে, মানুষ কী জলে ভাসা প্রাণী?
ক্ষুধায় কে অন্ন দ্যায় পিপাসায় পানি?

নদীগুলো নদী নেই বিষাক্ত তরল বুকে হাসে অট্টহাসি
যেদিকে ফেরাও চোখ জলের কার্পেটে মোড়া হিংস্র বানভাসি।
ভেসে যায় লাজ-লজ্জা গৃহস্থের সম্ভ্রম সম্মান
শিশুদের খেলাঘর কুমারীর রাঙা অভিমান।
বিপন্ন বাংলা আজ নিরুপায় বেহুলা সুন্দরী।
ডুবন্ত মান্দাসে চড়ে যায় মৃত্যুপুরী।
টল টল অতল জলে শরতের পূর্ণিমার চান
বিষাদে মলিন দ্যাখো হয় খন্ড, হয় খান খান।
তাহলে মানুষ ব্যাকুল ভরসা নিয়ে তাকাবে কোথায়?
বিশ্বাসের সব কেন্দ্র, প্রার্থনার সব ভাষ্য মিথ্যা হয়ে যায়।
মানুষের আহাজারি আকাশে কী বাজে?
আকাশ আকাশে নেই, আকাশের হৃদপিন্ডে শূন্যতা বিরাজে।
তাহলে কী কণা কণা প্রাণবিন্দু জীবনের উজ্জ্বল উৎসব
জল্লাদ জলের তোড়ে মুছে যাবে সব কলরব?
তমিস্রার গর্ভ থেকে ফেটে পড়া প্রাণের কণিকা
নিখিল নাস্তিতে জ্বালে দিব্যতার শিখা
অনাদি অনন্ত লোকে দ্রুত ধাবমান
বেদনা সঞ্জাত এই সৃজনের গান।
চেতন ও নিশ্চেতনে নিরন্তর ক্ষরণ দ্রবণ
তবু অমৃত-অমৃতময় মনুষ্যজীবন।
ধ্বংস মৃত্যু অপঘাত সত্য, তবু শেষ সত্য নয়
আশায় মানুষ বাঁচে পরম বিস্ময়।
মানুষ মরণশীল-মানুষ অমর
নিখিল সৃষ্টির বুকে পরম অভয় দাতা মানুষের মেঘমন্দ্র স্বর।
মানুষ গ্রহণ করে মৃত্যুর ছোবল থেকে জীবনের পাঠ
জলের কল্লোল থেকে কন্ঠ করে সঙ্গীতে ভরাট।
মহামারী থেকে প্রাণ রোগ থেকে আয়ু

শোক ছেনে তীক্ষ্ণ করে পেশী আর স্নায়ু।
পাতালে চরণগাঁথা মেঘেতে মস্তক
দুরন্ত সৃষ্টির সুখে জীবনের মহৎ স্তবক
মানুষই রচনা করে, সব ক্ষতি তুচ্ছ করে শিরদাঁড়া তুলে
মানুষ দাঁড়াবে তবু অন্তরের অমৃতের বলে।

শুধু একটি শব্দের জন্য

তুমি যখন রজনীগন্ধার ডাঁটার মত নত হয়ে
ঘরের মধ্যে পা রাখলে সারাঘরে খেলে গেল একটা স্পন্দন
হঠাৎ যেন বদ্ধ হাওয়া শিউরে উঠল।
তুমি যখন বাঁকাচোরা হাত দুটো আলতোভাবে
কোলের উপর শুইয়ে রাখলে
অপার বাঙময় সে দুটো অপরূপ হাত
বীণার মত বেজে উঠতে চাইল।
তুমি যখন শরীরের বসন টেনে টুনে ঠিক করায়
হঠাৎ খুব মনোযোগী হয়ে উঠলে, মনে হল
শরীর ঢাকতে গিয়ে তুমি শরীর থেকে পালাতে চাইছ।

অমনি তোমার ভেতর থেকে একটা স্নিগ্ধ
বিদ্যুৎপ্রবাহ নির্গত হয়ে আমাকে তড়িতাহত করল।
তুমি যখন কার্পেটে বুড়ো আঙুল খুঁটে খুঁটে মেঝের
পানে তাকিয়ে খুউব নিচুস্বরে কথা বললে
মনে হয় ঘরে দেয়ালগুলো সন্তর্পণে কান পেতে আছে
যাতে তোমার প্রতিটি উচ্চারিত ধ্বনি দেয়ালের মর্মে বিঁধে থাকে।

যখন আমি তোমার কাছে গেলাম, মনে হল
একটা নম্র নির্জন ঝর্ণার পাশে এসে দাঁড়িয়েছি
জাগতিকতার কোলাহল থেকে অনেক দূরে যার উৎসস্থল।
আর যে ঝর্ণা মৃদুস্বরে কেবল নিজের সঙ্গেই আলাপ করে।
আমি যখন তোমার ঘরের বাইরে পা রাখলাম
আমার রক্তে, আমার অনুভবে ফুটন্ত ঝর্ণার আবেগ ;
একটা মৃদু মোহন প্রীতিপদ উত্তাপে আমার
ভেতরের পদার্থ সকল গলানো মোমের মত বেরিয়ে আসতে চাইছে।
যত দূরেই যাচ্ছি পথের পাশের সব কিছুর মধ্যে
যে ঝর্ণার সঙ্গে আমার সাক্ষাত হয়নি,
সে অদৃশ্য ঝর্ণার ঝংকার শুনতে পাচ্ছি।

আমি গগনে মেঘ দেখামাত্র মেঘের অংশ
হয়ে গেলাম। বৃক্ষ দেখে বৃক্ষের আকার
ধারণ করলাম। যখন নদীর সান্নিধ্যে এলাম
ছলছল ধ্বনিতে বয়ে যাওয়ার আবেগ আমার
বুকের ভেতর তরঙ্গ সৃষ্টি করল। তারপরে
যখন আকাশের অভিমুখে দৃকপাত করলাম,
দেখলাম ঘুঙুর পরা নক্ষত্ররা একে একে
আমার প্রাণে এসে প্রাণের চেরাগ জ্বালিয়ে তুলছে।

তুমি আমাকে চরাচরে প্রবাহিত হওয়ার
আশ্চর্য ক্ষমতার অধিকারী করেছ।
তুমি আমার হাতে তুলে দিলে বিশ্বলোকে
বিহার করার টাটকা নতুন ছাড়পত্র।
হে নারী তোমাকে কী নামে ডাকব।
কোন্ নামে ডাকলে তোমার হৃৎকমল সুখসমীরে
আন্দোলিত হয়। কোন্ নামে ডাকলে আমার
নাভিপদ্মের মূল থেকে শৈলের
সোনালী পোনার মত যে অনুভবরাশি
ওপরে ভেসে উঠেছে তার বিশ্বস্ত প্রকাশ ঘটাতে পারি।

গাভীর জন্য শোক প্রস্তাব

বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে নিহত গাভীটির
জন্য আমি শোক প্রস্তাব পাঠ করছি।
এই অবলা প্রাণীটিকে শহীদ শিরোপা
দেয়া যায় কী-না ও-নিয়ে অনেক চিন্তা-ভাবনা
করেছি। কিন্তু কুণ্ঠাটি থেকে গেল।
অস্বীকার করতে পারিনে শহীদের ধারণাটির
মধ্যে মর্মমূল স্পর্শ করা একটা
ব্যঞ্জনা রয়েছে। কিন্তু হালফিল এই
শব্দটি অপব্যবহার হয়ে হয়ে আদি
শুদ্ধতা অনেকখানি হারিয়ে বসেছে। গরুর
বেটির নিতান্তই দুর্ভাগ্য শহীদ অভিধা
তার নামের সঙ্গে যুক্ত করা গেল না।

গরুটির প্রকাশ্য অপরাধ আমি আন্দাজ করতে পারি। যদি গোপন কোন অপরাধ
থাকে সেটা আমার জানার কথা নয়। দেশের সেরা বিদ্যাপীঠে গরুর বেটির অনুপ্রবেশ,

তাও পেটে বাচ্চা নিয়ে, অবশ্যই একটি অলঙ্ঘনীয় অপরাধ। গরুর বেটি মনুষ্য ছাওয়ালের বিদ্যা-শিক্ষার কারখানায় পা দিয়ে সীমানা লঙ্ঘন করেছে, এটা অবধারিত সত্য। গাভীটির পক্ষেও কিছু যুক্তি দাঁড় করানো যেত। গাভীটির মা-বাপ দু'জনেই অস্টেলীয়। বাংলাদেশে সে ছিল নবাগতা মেয়ে শিশু। ঘাসক্ষেত্রে এবং জ্ঞানক্ষেত্রের পার্থক্য বুঝে নেয়ার মত পূর্বধারণা তার ছিল না। অজ্ঞতা অপরাধ নয়, কিন্তু অজ্ঞতার অপরাধও অপরাধ। এ নিয়ে পক্ষে-বিপক্ষে অনেক সাওয়াল জওয়াব দাঁড় করানোর অবকাশ ছিল। কিন্তু তার আগে মামলাটির রায় কার্যকর হয়ে গেছে, অর্থাৎ মৃত্যুদণ্ড লাভ করে গাভীটি স্বর্গে চলে গেছে। গাভীর অপরাধ কম বেশি প্রমাণ করার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে। যদি প্রমাণিত হয়, গাভীটি কোন অপরাধই করেনি তাতেও লাভ নেই, মৃত গাভী আর ফিরে আসবে না। মামলাটির মামলা চলতে পারে। আমি গাভীটির আত্মার শান্তি কামনা করব না। গাভীর আত্মা থাকে, ধর্মপুস্তক সে বিষয়ে নীরব।

তারপরেও কিছু কথা বলার আছে। গাভীটি কোন্ সাহসে ভর করে দু'দল বন্দুকধারী লড়িয়ে মানুষের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছিল! গাভীটিকে কে বা কাহারা প্ররোচিত করেছিল। না কি গাভীটি ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তে এই পদক্ষেপটা গ্রহণ করেছিল। কোন্ ভাবনা তাড়িত করে গাভীটিকে বধ্যভূমিতে টেনে নিয়ে এসেছিল, তার স্থির কোন প্রমাণ হাতে নেই। সে কী পেটের বাচ্চার নিরাপত্তার প্রশ্নটি খুব বেশি করে ভেবেছিল, কিংবা নিজের নিরাপত্তার বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দান করেছিল অথবা গাভী সমাজের প্রতিনিধি হিসেবে বোকা সাহসে একপাল খুন চেপে যাওয়া মানুষের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছিল। সংবাদপত্রের খবরে এই ভেতরের বিশ্লেষণটা একেবারেই ধরা পড়েনি। তবে দলমত নির্বিশেষে সবগুলো সংবাদপত্র কবুল করেছে, ঘটনাটি আমাদের এই শহরেই ঘটেছে। স্ফীতোদর গাভীর ছবিটি সামনের পাতার দর্শনীয় জায়গায় ছাপিয়ে প্রমাণ করেছে, গাভীটি সত্যি সত্যি ভবলীলা সাঙ্গ করেছে।

আমি নিহত গাভীটির জন্য শোক প্রস্তাব পাঠ করছি। গাভী-বকরি, মোরগ-মুরগি, বেড়াল, ঘেয়ো কুকুর এমনকি জীবনানন্দ দাশের থেতলানো ইঁদুরের অপঘাত মৃত্যুতে শোক প্রকাশ একটি মানবীয় কর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। মানুষ যত কৌশলী এবং বিজ্ঞই হোক, মানুষের জন্য শোক প্রকাশ করার কোন প্রয়োজন আছে আমি এমন মনে করিনি। দলীয় লোকেরা তারস্বরে চিৎকার করে কোন ব্যক্তির শহীদের মর্যাদা দাবি করলেও আমি অনুকম্পা প্রদর্শন করতে সক্ষম হব না। এখন শহীদ শব্দের বিষণ্ন মহত্ত্ব আমাকে আর আলুলায়িত করে না। আমি মনে করি শহীদও একজন মৃত মানুষ। আমাদের এই ক্ষুদ্র দেশে মৃতদের যদি ক্রমাগত জায়গা ছেড়ে দিতে থাকি, আমরা জীবিতরা যাব কোথায়?

শোক শব্দটির মধ্যে কিঞ্চিৎ পরিমাণে হলেও নৈসর্গিক সত্যের সারাৎসার বর্তমান। ক্রৌঞ্চ নিধনসঞ্জাত বেদনা থেকে জন্ম নিয়েছিল শ্লোক, শ্লোক থেকে শোক। শোক সাহিত্য ও সঙ্গীতের প্রাণ বিশেষ। নিসর্গের ধমনীর শোণিতপ্রবাহে শোক একটা বড় ভূমিকা পালন করে থাকে। শোকের সংস্পর্শে এলেই যে-কোন ঘটনা আলাদা

একটা মাত্রা অর্জন করে ফেলে। শোক সময় এবং স্থানবিশেষ কৃষ্ণবর্ণ আকিকের মত মূল্যমানতা পেয়ে বসে।

আফসোসের কথা হল, মানুষ এই শোকরত্নটিকে ধারণ এবং বহন করার যাবতীয় ক্ষমতা খুইয়ে বসে আছে। একথা সত্যি যে, শোকের উপলব্ধিটি যদি প্রতিটি প্রজন্মের মধ্যদিয়ে কৃষ্ণসূত্রের মত প্রবহমান না রাখা যায় শিল্প-সাহিত্য নিশ্চল হয়ে যাবে, কবিতার পংক্তিতে ঝঙ্কৃত হবে না প্রাণ আর সঙ্গীতের কলিতে সঞ্চারিত হবে না পেলবতা। মৃত গাভী, ছিন্নমুণ্ড বকরি, জবাই করা হাঁস-মুরগি, থেঁতলানো ইঁদুর, উৎপাটিত গাছপালা এসবের জন্য শোক প্রকাশ করে করে শোকের ধারণাটি বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব বিবেকবানদের ওপর অর্পিত হয়েছে।

মৃত্যু হল শোকের চাইতেও প্রয়োজনীয়। মৃত্যু, জীবিতদের জন্য 'স্পেশ' সৃষ্টি করে। মৃত্যু সৃষ্ট জীবের কলুষ কালিমা হরণ করে, মৃত্যু জীবনকে শুদ্ধ এবং পবিত্র করে। মৃত্যুর নীরব গাম্ভীর্যের মধ্যে আমরা জীবনের পরিণতির ইঙ্গিত লাভ করে থাকি। অতএব মৃত্যুর ধারণাটিকেও নিরন্তর ঘষে ঘষে চকচকে এবং উজ্জ্বল রাখা প্রয়োজন। মানুষ এতই নচ্ছার, এতই অপদার্থ মৃত্যু কিংবা শোক এই দুই মহামূল্যবোধের কোনটিকেই ধারণ, বহন এবং লালন করার ক্ষমতা চিরতরে হারিয়ে বসে আছে।

এই কারণেই আমি বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে নিহত গাভী এবং তার পেটের বাচ্চাটির উদ্দেশ্যে শোক প্রস্তাব পাঠ করছি।

পথিক

(নরেন বিশ্বাসের স্মৃতির উদ্দেশ্যে)

যেইজন চলে যায়
সময় সিন্ধুর বুকে তার অন্তর্ধান
নিতান্ত রুটিন মাত্র যে যাবে সে যাবে
জন্ম মানে মৃত্যুদন্ড
আজ কাল কিংবা পরে কার্যকর হবে
বন্ধুর মৃত্যুর জন্য শোক কেন তবে!

পাখি এসে বাসা বাঁধে
নির্দিষ্ট সময় শেষে উড়ে চলে যায়
পাখার স্পন্দন বেগ শিহরে হাওয়ায়
পরিত্যক্ত খড়কুটো ঝরে পড়া বিষণ্ন পালক
পড়ে থাকে দুঃখ জাগানিয়া স্মৃতি শোকের দ্রাবক।

ঘুরে ঘুরে হাওয়া কেন একই গান গায়।
নামের ছায়ার তলে সে পথিক নাই
মিশে গেছে সময় সিন্ধুর বুকে একবিন্দু জল
এ পারে জাগিয়ে কারা চোখে মুখে স্মৃতির কাজল।
বল বন্ধু, বল শত্রু, বল তারে ভাই
নির্ভার অস্তিত্ব তার, পথিক গন্তব্যে গেছে
কোন চিহ্ন নাই।

শঙ্খ নদী

ওগো নদী, শঙ্খ নদী ধীরে ধীরে ধীরে বয়ে যাও
আমার সকল গান অন্তহীন সাগরে মিলাও।
আমার গহন কান্না গতিরুদ্ধ বেদনা ভার
চঞ্চল তরঙ্গ ভঙ্গে বুকে নিয়ে নাচাও দু'পাড়।
আমার মধুর স্বপ্ন লীলালাস্যে বয়ে নাও তুমি
দুই তীরে পড়ে থাক বালুচর ফসলের ভূমি
নাইয়রি নৌকায় চড়ে পিত্রালয়ে যাত্রা সাঙ্গ করে
গঞ্জের বেপারি নাও ঘাটকূলে ঝিমায় দুপুরে।

ওগো নদী তোমার গন্তব্য দূর সুনীল সাগর
বুকে হেঁটে যেতে হবে দীর্ঘপথ ভ্রমণের পর।
মানুষের ঘর-বাড়ি শস্যক্ষেত্র গ্রাম-গঞ্জ শেষে
তুমি যাবে অনন্ত সুনীল সিন্ধু জলধির দেশে।
রজত রেখার নদী, শঙ্খ নদী ধীরে ধীরে ধীরে বয়ে যাও
আমার না গাওয়া গান বারিধির কল্লোলে মিশাও।
আমার বেদনরাশি উন্মথিত প্রাণের আবেগ
হৃদযন্ত্রে ঝংকারধ্বনি শিহরিত তপ্ত রক্ত বেগ
সমস্ত তোমার জলে অনুরাগে করে বিসর্জন
কূলে একা বসে আছি নিশ্চেতন স্থানুর মতন।

জলতলে হাত রেখে মনে হয় তোমাকে ধরেছি
চকিতে পালিয়ে গেছ আমি হায় বাঁধা পড়ে গেছি।
শিশুকালে প্রাণে প্রাণে রৌদ্র-ছায়া জানাজানি খেলা
পলকে উধাও হয়ে নেমে এল অপরাহ্ন বেলা।
কখন ফুরোল সব? এত গান এত দৃশ্য ছবি
কোথায় সুন্দরী আজ? রক্তে ভাসা চরে অস্ত রবি,

মাঘী পূর্ণিমার মেলা আষাঢ়ের জলের জোকার
আগুনবরণ সন্ধ্যা সাম্পান মাঝির চিৎকার।
জেলেদের জাল ফেলা ফাঁকা চরে ধুম বলিখেলা
ফুলেল শর্ষের ক্ষেত কালো জলে শুশুকের মেলা।
ফটিক পানির নদী জলতলে দেখে কাঁপা ছায়া
মনে হত তুমি তো আমার অন্য ধাবমান কায়া ;
তোমাকে দেখতে গিয়ে কুতূহলে আমাকে দেখেছি
জলজ উৎস থেকে প্রাণস্পন্দ প্রাণেতে মেখেছি।

পাহাড়ের শানুদেশে পিতামহ বট বৃক্ষতলে
বসে, দেখেছি সাঁতারে মীন 'চালি' বাঁধা বাঁশ ভাসে জলে
ভাসে মীন, ভাসে নাও ঝিলমিল নীলাম্বরী শাড়ি
কার কন্যা কার নাও, কোন গাঁয়ে চলেছে ঝিয়ারি?
শুভ্র বকের পাঁতি উড়ে যায় গোধূলি বেলায় বেগে
গতির স্পন্দনে রেখা মর্মকোষ জুড়ে রয় জেগে।
নরম আঁধার এসে পৃথিবীরে যখন জড়ায়
কল্পনা আপন বলে নিরন্তর হাত-পা ছড়ায়।
মনে হয় আমি মাঝি, আমি জল ধাবমান ধারা
আমার চলার বেগে দুই তটে পড়ে গেছে সাড়া।
আমি দোহাজারি ছেড়ে গৌরাঙ্গের হাট পিছে রেখে
সোজা গিয়ে একটানে বৈলতলি তারপর ডানে বেঁকে
বরকল চানখালি, কানে কল কল বাজে মোহনার গান
শুনিতেছি সাগরের ধীরোদাত্ত মধুর আহ্বান।

মাটিলগ্ন বদ্ধ সত্তা অস্তিত্বের ভারেতে অচল
আবদ্ধ মানব শিশু নই মীন, বহমান জল।
তুমি দুরন্ত গতির বেগ চলার স্বপ্ন দিয়েছ অন্তরে
নিরন্তর লক্ষ মীন হৃদয়েতে পুলকে সন্তরে।
শত মাঝি দাঁড় টানে গলা ছেড়ে ভাটিয়ালি গায়
প্রাণের উজান গাঙে রাঙা নৌকা আসে আর যায়।
ওগো শঙ্খ তুমি জল তুমি গতি প্রাণের প্রবাহ
আন্দোলিত স্রোতে আমি ভাসালাম অন্তরের দাহ।
প্রাণের না গাওয়া গান মৃদুল হিল্লোল তুমি
বয়ে নাও গতিছন্দে শান্ত স্থির তটরেখা চুমি।
ওগো নদী শঙ্খ নদী ধীরে ধীরে ধীরে বয়ে যাও
আমার সকল গান অন্তহীন সাগরে মিশাও।

সীল মাছের খাস্‌লত

ছোটবেলা থেকে ভূগোলকে আমি
যমের মত ডরাই। আমার মস্তকে ভূগোল বিষয়ক
কোন কিছুই সান্ধাইতে চাইত না।
কামস্কাটকা কোথায়— জিনিশটা নদী না
সাগর, পর্বত না মরুভূমি, শহর না গ্রাম
ভেদ নির্ণয় করা আমার পক্ষে কস্মিণকালেও
সম্ভব হয়নি।
স্কুল কলেজের মগজ ধোলাইয়ের কারখানায়
স্যারেরা ধোপার কাজ করতেন। এই ধোলাই
কারখানার মহামান্য কারিগরেরা গুঁতিয়ে গুঁতিয়ে
ভূগোলের যতটুকু এলেম আমার
মগজে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন, নিউরনে চেপে
বসতে পারেনি। তাই অদ্যাবধি আমার
মগজ একেবারে ফকফকা পরিষ্কার।
ভূগোল বিষয়ক জ্ঞানের কোন জীবাণুই
সেখানে কিলবিল করে না।

আমার যখন একটু বয়স হল, আমি
দুনিয়া দর্শনের উদ্দেশ্যে লোটা-কম্বল নিয়ে
বেরিয়ে পড়লাম। অনেক শহর-বন্দর-নগর
এ্যারোড্রাম-নদী সাগর ইত্যাকার নানা
অবস্থান থেকে আল্লাহর বানানো
এই দুনিয়ার আকারটা নিজের চোখে অত্যন্ত
মনোযোগসহকারে প্রত্যক্ষ করতে চেষ্টা
করেছি। আমি যেখানেই গিয়েছি দেখেছি
দুনিয়ার আকার থালার মত চ্যাপ্টা।
অথচ স্কুলে আমাদের কণ্ঠস্থ করতে
বাধ্য করা হয়েছিল, দুনিয়ার আকৃতি
গোল কমলালেবুর মত। তবে উত্তর-দক্ষিণে
একটু চ্যাপা। সেইই প্রথম অধীত বিদ্যার
সঙ্গে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার একটা ঠোকাঠুকি
হয়ে গেল। তারপর থেকে ভূগোলের
জ্ঞানের প্রতি কোন রকমের আস্থা টিকিয়ে
রাখা আমার পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল।
বয়স নানাসময়ে মানুষের জীবনে নানারকম

পরিবর্তন ঘটায়। বয়স বাড়ার তেলেসমাতি
মানুষের বিশ্বাস চিন্তাশক্তির ওপর কিমিয়ার
যাদুকাঠির মত ক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে। যৌবনে
যে মানুষ তুখোড় নাস্তিক ছিল, পরিণত
বয়সে দেখা গেল সেই একই মানুষ
ঘোরতর ধর্মপরায়ণ হয়ে উঠেছে। ধর্মীয়
কোন আচার-অনুষ্ঠানের ত্রুটি তার কাছে
অঙ্গহানির মত মনে হয়।
আমার বয়স যখন একটুখানি ভাটির দিকে
হেলেছে, নিজের অজান্তে কখন যে ভূগোলের
জ্ঞানের প্রতি আমার অনুরাগ একটু একটু করে
বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে, টেরও পাইনি।
জগতে কারণ ছাড়া কর্ম হয় না। আমি যে
ভূগোলের জ্ঞানের দিকে ঝুঁকে পড়লাম, তার
পেছনে সীল মাছ একটি প্রণিধানযোগ্য ভূমিকা
পালন করেছে। তুষার সমুদ্রে সন্তরণশীল
এই অতিকায় প্রজাতির মৎস্য একটু একটু করে
আমার চিন্তা-চেতনা ভূগোলের রাজ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছে।
তার পেছনে অবশ্যই একটি প্রক্রিয়া কাজ
করেছে। সহজ করে বলতে গেলে এই
প্রজাতিটিকে আমি ভালবেসে ফেলেছিলাম।
জগতের এতকিছুর মধ্যে সীল মাছ কেন
আমার ভালবাসার পাত্র হয়ে উঠল
কারণটা এখনো অনুদঘাটিতই থেকে গেছে।
ভালবাসা মানুষের জানার পথ উন্মুক্ত করে দেয়
আর জানারও শেষ নেই। একটা জানলে আরেকটা
জানতে হবে, তারপর আরেকটা, তারপর এমনি
করে চলতে থাকবে।
সীল মাছ সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান লাভ করার
পর আমার সেখানে থেমে থাকার উপায়
রইল না। আমাকে জানতে হল মেরু অঞ্চলের
কথা। মেরু অঞ্চল হল
পৃথিবীর সেই চ্যাপা
অংশটুকু, শুভ্র তুষারের পুরু আস্তরণ যেখানে
ভূভাগটির গোপনীয়তা ভয়ঙ্কর রকম
আকর্ষণীয় করে তুলেছে। সেই মোহিনী মেরুর।
কথা জানার পর বিধাতার অনুপম হাসির

মত মেরুজ্যোতির কথা জানতে হল।
পৃথিবীর সুদূরতম শুভ্র তুষারাবৃত অংশটিকে
বিধাতা অমল হাস্য জ্যোতিতে এমন
অপূর্ব দুর্লভ কঠিন সাধনার লক্ষ্যবস্তু হিসেবে
সজ্জিত করে রেখেছেন, যুগে যুগে দুঃসাহসী
পুরুষদের বুকের রক্তধারা সেই চ্যাপা
অংশটির কল্পনায় তরঙ্গিত হয়ে উঠেছে।
আমাকে পেঙ্গুইন পাখি, শ্বেত ভালুক
আরো কত কিছুর কথা জানতে হল।
তারপর সীল মাছ আমাকে লেজে
খেলিয়ে ইতিহাসের দিগন্তে ছুঁড়ে দিল।
কোন কোন সময় আসে যখন ভূগোল
ইতিহাস এক বিছানে এক শিথানে
পরস্পর গলাগলি ও আলিঙ্গন করে। ভালবাসা
মানুষকে দিয়ে কত অসম্ভব কাজ করিয়ে নেয়।
আমাকে অনেকগুলো সন তারিখ এবং
খ্রিস্টাব্দের কথা অবগত হতে হল।
আমি দুঃসাহসী নাবিকদের জীবন-কাহিনী
পাঠ করলাম। তুষারস্তূপের ফাঁকে ফাঁকে
সেই নাবিকদের সাদা হাড় এবং করোটি হঠাৎ
ঝলকানো আলোতে কেঁদে উঠে দেশে ফিরে
যাওয়ার আকুতি জানায়। আমি এডুইন পিয়ারির
কথা জানলাম। দুঃসাহসী অভিযান নিয়ে যাঁরা
লেখালেখি করেন, এডুইনের নাম
বিশেষ তাজিমের সঙ্গে স্মরণ করে থাকেন।
এডুইন সাহেব বিরাট জাহাজে পাল খাটিয়ে
অনেক লোক-লস্কর সংগ্রহ করে
নীল নোনা দরিয়া পাড়ি দিয়ে এই চ্যাপা
জায়গাটির হদিশ করতে ছুটে এসেছিলেন।
এডুইন দরিয়াতে চাষবাস
করে কাল কাটাতেন। এই সাগর উন্মাদ
লোকটির কেরামতিও অল্প নয়। অভিযান
প্রেমিক লেখকদের জন্য নামটি রেখে
সাহেব তুষারের রাজ্যে হঠাৎ
টুপ করে গায়েব হয়ে গিয়েছিলেন। অদ্যাবধি
মানুষ পঞ্চমুখে এডুইন সাহেবের তারিফ
করে থাকেন। কী সাহস, কী সংকল্প,

কী অদম্য মনোবল ইত্যাদি ইত্যাদি।
এডুইন পিয়ারির আসল কৃতিত্বের সঙ্গে এই
সকল অতিশয়োক্তি মিলিয়ে বিচার করলে
আমার হাসি পেয়ে যায়।
এডুইন সাহেব গ্রেট ব্রিটেনের জাতীয়
পতাকাটি এই চ্যাপা জায়গাটিতে শক্ত
খুঁটির মাথায় পুঁতে দিতে পেরেছিলেন।
এইটুকুই এডুইনের বাহাদুরি।
এডুইনের পূর্বে অনেক নাবিক
এই চ্যাপা জায়গাটির হদিশ করার
দূরাকাঙ্ক্ষায় তাড়িত হয়ে পৈত্রিক প্রাণ
কোরবান করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

মাসের পর মাস, বছরের পর বছর ঝড়-ঝঞ্ঝা
তুচ্ছ করে সমুদ্র-তরঙ্গের সঙ্গে লড়তে
লড়তে নাবিকদের প্রাণশক্তি যখন
নিঃশেষ হয়ে আসত, ওই চ্যাপা জায়গাটির
কথা চিন্তা করতে করতে তাদের প্রাণবায়ু
বায়ুমণ্ডলে মিলিয়ে যেত। একটা কথা
পরিষ্কার। চ্যাপা জিনিস মাত্রেরই
মানুষের হিতাহিত কাণ্ডজ্ঞান ভুলিয়ে
দেয়ার অপরিসীম ক্ষমতা রয়েছে।
এডুইন পিয়ারি অত দূরে না
গিয়ে যদি ধারে কাছে কোথাও মরার
ব্যবস্থা করতেন, আমি তাঁর কাণ্ডজ্ঞানের
তারিফ করতে পারতাম। চ্যাপা
জায়গাটির এমন কি মহিমা যে, সে জায়গায়
চরণ স্পর্শ রাখার জন্য অগ্নিলুব্ধ পতঙ্গের
মত অমন করে ছুটে আসতে হবে।

আমি সীল মাছের প্রতি আকৃষ্ট
হয়েছিলাম, তার বিশেষ একটি
কারণ রয়েছে। কেউ যখন কোন কারো
প্রেমে পড়ে, কারণ ব্যাখ্যা করে না।
প্রেমেই পড়ে। সুতরাং সীল মাছের প্রতি
আমার দুর্মর প্রেমের গোপন রহস্যটি
গোপনই থেকে যাক।

এই প্রজাতির মৎস্যের সমস্ত গুণ বয়ান
করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। সীল মাছ
মানুষের অনেক উপকারও করে থাকে। দিগ্‌ভ্রান্ত
জাহাজকে পথ দেখিয়ে বিপদে প্রকৃত বন্ধুর
ভূমিকা পালন করে। মাঝি-মাল্লাদের
মুখে শোনা এসব কথার বাইরে
সীল মাছ সম্পর্কে অভিনব কোন তথ্য
পরিবেশন করার ক্ষমতাও আমার নেই।
সীল মাছের জীবনচক্র সম্বন্ধেও নতুন
কোন সংবাদ আমি দিতে পারব না।
এই অতিকায় প্রজাতির মৎস্যটির
যূথচারী স্বভাব আমাকে সীল মাছের
প্রতি অধিক অনুরাগ সম্পন্ন করে তুলেছে।
সমস্তটা মেরু অঞ্চল প্রায় সারাবছর
আন্ধার দিয়ে ঢাকা থাকে। গ্রীষ্মকালে হঠাৎ
সূর্য দেখা দিয়ে ফেরারি
আসামীর মত অদৃশ্য হয়ে যায়। দীর্ঘ
প্রলম্বিত শীতকাল যখন শুরু হয়, সমুদ্র এবং সমুদ্র
তীর আলাদা করে চেনার উপায় থাকে না।
একদিকে সর্বত্র অনন্ত
শুভ্রতার রাজত্ব, অন্যদিকে বিরাজ করে
নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। তখন শুরু
হয় সীল মাছদের সমূহবিপদ। জমাট
বাঁধা পুরু তুষারের আবরণ তাদের জন্য
বাতাস প্রবেশের পথ বন্ধ করে দেয়। এই
বাতাসহীন কারবালায় সীল মাছদের নিশ্বাস ফুসফুস যন্ত্রের মধ্যে
আটকে যাওয়ার উপক্রম হয়। এই জীবনরোধী
তুষার ফাটকের মধ্যে আটকা পড়ার পর
সীল মাছেরা সবান্ধবে প্রমাদ গুণতে
আরম্ভ করে। জোয়ান-বুড়ো-শিশু-নারীসহ
সীল মাছেরা বেরিয়ে এসে তুষার দেবতার
উদ্দেশ্যে এক ঝলক নরম পলকা তাজা হাওয়ার
জন্য আকুল আবেদন জানাতে থাকে। তুষার
দেবতার তুষার কঠিন অন্তরে সামান্যতম
অনুকম্পার সৃষ্টিও হয় না। নীরেট শক্ত মমতাহীন
তুষারের আবরণ আরো শক্ত
হয়ে বাতাস চলাচলের পথ রোধ করে

দাঁড়ায়। কোন উপায়ান্তর না দেখে
সীল মাছেরা বেপরোয়া হয়ে ওঠে। তারা
তুষারের আবরণে মাথা ঠুকতে থাকে।
অবিরাম মাথা ঠুকতে গিয়ে কারো মাথার
খুলি ফেটে যায়, আশরীর রক্তাক্ত হয়। কেউ
মৃত্যুর হিমশীতল কোলে ঢলে
পড়ে। কিন্তু সীল মাছেরা মাথা ঠুকেই যেতে
থাকে। এক সময় তুষারের পুরু আবরণ
ফেটে যায়। সমুদ্রের নীল জলে আকাশের
স্বচ্ছ আলোর প্রতিফলন দেখে সীলদের আনন্দের
সীমা থাকে না। তারা আলোর
রাজ্য, হাওয়ার রাজ্য অভিমুখে লাফ দিয়ে
ডিগবাজি খেলতে থাকে। প্রতি বছর
শীত জেঁকে বসলেই সীল মাছেরা
প্রজাতিগতভাবেই এই তুষার
ফাটানোর কাজটি শুরু করার প্রস্তুতি
গ্রহণ করে। তখন সীল মাছদের রক্ত
প্রবাহের মধ্যে ঢাকের আওয়াজের মত
রণধ্বনি বেজে ওঠে। তারা প্রজাতিগত
সংগ্রামকে উৎসবে রূপান্তরিত করে।
উৎসবের স্বাদ মধুর করে তুলতে না
পারলে লড়াই জেতা যায় না। বুড়ো-বুড়িরা
এই সময়টাকে তাদের তীর্থযাত্রার কাল হিসেবে
চিহ্নিত করে।
আমার মধ্যে সীল মাছদের অস্তিত্ব আমি
অনুভব করতে পারি। নিজের মধ্যে অন্যের
অস্তিত্ব অনুভব করার নামই তো প্রেম।
আমার অবস্থানটি আমি বয়ান করি।
অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি, পৃথিবী থেকে অনেক
দূরে আমার অবস্থান। আমার চারপাশের
হাওয়া মণ্ডলে অদৃশ্য দেয়াল গেঁথে তোলা হয়েছে।
তাজা হাওয়ার স্পর্শ থেকে আমি বঞ্চিত।
আমার নিশ্বাসের বায়ু দূষিত হয়ে হয়ে আমার
ফুসফুসকে ভারাক্রান্ত করে তুলেছে।
আমার অস্তিত্ব অচল স্থবির। ভূতে
পাওয়া মানুষের আর্তচিৎকার যেমন
কেউ শুনতে পায় না, তেমনি আমার আর্তি

আমার বুকের কান্না বারবার আমার কাছে
ফিরে আসে। এই শহর আমার কাছে সাহারা
মরুর চাইতেও ভয়ঙ্কর। এই শহরের
যেদিকেই তাকাই কেবল দেখি প্রতি
মানুষের মুখমণ্ডলে সাঁটা রয়েছে মাইক্রোফোন।
প্রতিটি মানুষ যেন একেকটি বিজ্ঞাপন।
তারা সকলে অন্য কারো হয়ে কথা বলার জন্য
যেন প্রতিযোগিতায় নেমেছে।
এই শহরে আমি কোন বিশুদ্ধ মনুষ্য
কণ্ঠস্বর শুনতে পাইনে। সকলে যন্ত্রের
মত এক স্বরে এক সুরে কথা বলছে। সেটা
কারো হৃদয়ের মাতৃভাষা নয়। মাইক্রোফোনের
নিনাদিত গর্জন থেকে কথা কেড়ে নিয়ে
চিৎকার করছে। অযুত নিযুত লক্ষ কোটি
মাইক্রোফোনের হুঙ্কার শুনতে শুনতে আমার
যে একটা কণ্ঠস্বর আছে, আমার
বাকযন্ত্রে বিশেষ ধ্বনি মাধুর্য আছে, আমার
প্রকাশভঙ্গি, আবেগ অনুভূতি স্বরতরঙ্গে
সঙ্গীতের মত বেজে ওঠে,
আমি হাসতে পারি, কাঁদতে পারি, সেই
জিনিশগুলোই আমি ভুলতে বসেছি। আমি এমন
নির্মল হাস্যধ্বনি শুনিনে যা আমার ইন্দ্রিয়
গ্রামকে হৃষ্ট, সতেজ এবং উৎফুল্ল করতে পারে।

এই শহরের কতিপয় ব্যক্তি দুর্দান্ত অভিলাষে
ঘোষণা দিয়ে বসেছিলেন, আমরা মোহন্ত হয়ে
ওঠার দুর্দান্ত সাহস পোষণ করে মাঠে
নামতে যাচ্ছি। সেই মানুষগুলো এখন
কর্পোরেশনের ময়লাবাহী দুর্গন্ধযুক্ত ট্রাকের
মত পশমী আলোয়ানে শরীর ঢেকে যত্রতত্র
টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে। ধারে-কাছে যাওয়ার উপায় নেই।
উৎকট দুর্গন্ধে নাড়িভূঁড়ি বেরিয়ে আসতে চায়।
এই ময়লার ট্রাকের মত লোকেরা এখন রীতিমত
অভিভাবক। দিনে রাতে রাতে দিনে
দেশের প্রতি প্রেম নিবেদন করা ছাড়া এই
লোকগুলোর অন্য কোন কাজ-কর্ম নেই।
ভাইরে আমি কী দেশের জল

হাওয়ায় বর্ধিত হইনি? সোনার বাংলার
শান্তিময়ী মূর্তি আমাকে কী আলুলায়িত
করে না? সোনার বাংলার জন্য আমার কী
উত্তাপিত ভালবাসার ভাণ্ডার নেই?
আমার কপাল, আমি সোনার বাংলার কেউ
নই। আমার ভালবাসা আমার বুকে পাথরের
মত ভারি হয়ে জমতে থাকে। বোবা
বেদনায় আমি থরথর কেঁপে উঠি। আমার
ভালবাসা প্রকাশ করব, তেমন ভাগ্য নিয়ে
আমার জন্ম হয়নি। আমার একটি রেডিও
স্টেশন নেই, একটি টেলিভিশন রীলে
সেন্টার নেই। আমার একটি পত্রিকা নেই,
একটি দল নেই। কী করে আমার
ভালবাসার কথা প্রকাশ করব! এই সকল
ভালবাসার যন্ত্রের কোনটাই আমার হাতে
নেই। ভালবাসার যন্ত্র ছাড়া আমি সোনার
বাংলাকে ভালবাসব কেমন করে! আমার
হাতে যদি একটি যন্ত্র থাকত, রাতে দিনে
দিনে রাতে, অবিরাম ভালবেসে বেসে
দেখিয়ে দিতাম, 'ভালবাসা কারে কয়'!
ফুসফুসে এক ঝলক টাটকা হাওয়া টেনে
নেয়ার জন্য, এক বুক অক্সিজেনের প্রত্যাশায়
সেই কবে থেকে অদৃশ্য পাথুরে দেয়ালে
মাথা ঠুকছি। এই প্রত্যাশায় যে একদিন
ওই পাথুরে দেয়াল ভাঙবে। একদিন
বুক ভরে আমি শ্বাস নেব।
বলা বাহুল্য এই খাস্‌লতটি আমি
সীল মাছ থেকে শিক্ষা করেছি।

তুমি চলে যাবে

কাল তুমি উড়ে চলে যাবে
অতিথি পাখির মত দূরে
দিল্লীর হাওয়াই আড্ডা
বাহরাইন মরুভূমি ঘুরে

পঁয়তাল্লিশ দিন অন্তে চলে যাবে
আপন ডেরায়।
কাল তুমি উড়ে চলে যাবে
ঘোষিত যাত্রার ক্ষণ ঘটিকা মিনিট
ঠিকঠাক রিকনফার্মড প্লেনের টিকিট
গ্রামগঞ্জে হ্যাপহ্যাজার্ড ভ্রমণের দায়
যানজট পথকষ্ট সমস্ত বিদায়।

কাল তুমি উড়ে চলে যাবে
বুক পিঠ দুই দিকে সময়ের চাপ
ধরে আছ প্রাণবৃন্তে প্রেমের গোলাপ
এই রাত শেষ রাত ক্ষণস্থায়ী সংকীর্ণ বাসর
নিমেষে ফুরিয়ে যাবে, আহা তারপর হাশর।

কাল তুমি উড়ে চলে যাবে
বাঁধাছাঁদা সবশেষ সুসম্পন্ন সৌজন্য সাক্ষাৎ।
বাকি আছে শুধু এক কম্পমান রাত
তোমার যুগল স্তনে আমার দু'হাত
আমার স্কন্ধের পরে তোমার মস্তক
থরে থরে আনমিত কেশের স্তবক।

কাল তুমি উড়ে চলে যাবে
এই রাত শেষ হলে তোমার উড়াল
ক্ষণিকের স্বর্গবাস শুধু এক রাত্রি পরমায়ু
নিশ্বাসে বিঁধেছে এসে নিশ্বাসের বায়ু,
গহন আবেগ ভরা তড়িত চুম্বন
বেদনার্ত শোকাতুর গাঢ় আলিঙ্গন।

কাল তুমি উড়ে চলে যাবে
ক্ষয় হয় অন্ধকার, ক্ষয় হয় সুখ
কি করে ঢাকব আমি প্রাণের অসুখ
এই বৈরী ভূমণ্ডলে আমাকে কী দেবে বরাভয়
কানায় কানায় পূর্ণ এই এক রাত্রির সঞ্চয়?

ইন্দ্রজাল

টেলিফোনে উঠল বেজে তোমার কণ্ঠস্বর
খাঁচার মাঝে পরাণ পাখি কাঁপল থর থর।

নীরস প্রহর ফেটে যেন ঝর্ণা জলের ধারা
মরুভূমির হৃদয় চিরে ছুটল আত্মহারা
তোমার বচন তোমার বুলি তোমার কণ্ঠধ্বনি
টেলিফোনে রিমিঝিমি বাজাল সিম্ফনি।

টেলিফোনে উঠল বেজে তোমার কণ্ঠস্বর
নাচল যেন পাখনা মেলা রুদ্ধ হাওয়ার ঘর।
একটু একটু ঝরে পড়া ক্লান্ত বাণীর বেগ
মনোলোকের ধু ধু খরায় ঘনিয়ে দিল মেঘ।
নৃত্য করে ধ্বনির যাদু চিত্ত লোকের সুধা
উসকে দিল বুকের ভেতর অন্যরকম ক্ষুধা।

টেলিফোনে উঠল বেজে তোমার কণ্ঠস্বর
উথাল-পাথাল রক্ত ধারায় জাগিয়ে দিল ঝড়।
এলিয়ে কেশ দিগ্বলয়ে নামছে কালো রাত
প্রাণের বীণায় সুর বেঁধেছে কুল্লে মখলুকাত।
তেজস্ক্রিয় বাণী তোমার মনোহরণ দাহ
টেলিফোনে ছলকে ওঠে অমৃত প্রবাহ।

টেলিফোনে উঠল বেজে তোমার কণ্ঠস্বর
এক নিমেষেই বদলে গেল সকল চরাচর।
দ্বিধা থরথর কথার ঝাঁকে খণ্ড খণ্ড তুমি
বৃষ্টি হয়ে ভিজিয়ে দিলে নিখিল মনোভূমি
জলভরা এক আকাশ বুঝি কাঙাল মাটির টানে
সুদূর থেকে ধারাস্রোতে নামল এসে প্রাণে।

টেলিফোনে উঠল বেজে তোমার কণ্ঠস্বর
মনের চোখে দেখছি তোমার দীঘল চিকন কর।
তোমার মুখ তোমার চোখ আউলা কেশের রাশি
ত্রস্তগমন শিথিল চরণ ক্লান্ত মুখের হাসি।
চোখের ভুরু, মুখের রেখা ভিতর বাহির সব
তোমায় আমি প্রাণের মাঝে করছি অনুভব।

আফেন্দির গল্প

আফেন্দিরা পাঁচ ভাই
আমাদের পাড়ায় থাকে
আফেন্দিরা বনেদি খান্দান

জমকালো অট্টালিকা
লাগোয়া বাগান।
দোতলায় ঝুলন্ত ব্যালকনি
হাইফাই রঙ্গিন পর্দা জানালায়
বন্ধ থাকে ফটকে ছিটকিনি।
কনিষ্ঠ আফেন্দি যিনি
তার সাথে থোড়া থোড়া জান-পহচান
হয়েছে সম্প্রতি।
উৎকৃষ্ট খোদার বান্দা নরম জবান
প্রত্যহ আবেগে করে নির্দোষ আঙুরা রক্ত পান।
আফেন্দি হিসেবে দক্ষ
জল বিয়োগের কালে থাকে সচেতন
কতটা জলীয় বস্তু দিওয়ানা স্রোতের বেগে
হল নির্গমন।
আফেন্দি শরীরনিষ্ঠ খুব ভোরে জাগে
গোধূলী প্রহরে খায় ময়দানের হাওয়া
পৈত্রিক চরিত্র রক্ষা আফেন্দির দায়
তাই গাড়ি চড়ে সন্ধেবেলা বাড়ি চলে যায়
খোকার মায়ের কোলে
সেইখানে জমবে ডিবেট
উজাগর রাত্রে খেলে আফেন্দি ক্রিকেট।

আফেন্দি সুঠাম দীর্ঘ একটুখানি ঝুঁকে পথ হাঁটে
মাপা খাওয়া, মাপা শোয়া
শরীরের বাঁধুনি নিরেট
সচল জীবনযন্ত্র ফ্যাটমুক্ত
যেন এক সুলিখিত নির্মেদ সনেট।
আফেন্দির বয়সকাল যখন পঞ্চাশ
হঠাৎ জীবন গাঙে খেলে গেল ঢেউ
সুন্দরী স্বৈরিণী এক জীবনে উদয়
আফেন্দির জীবনের প্রথম বিস্ময়
সুন্দরী স্বৈরিণী হলে উপভোগ্যা হয়
বিবাহিত বনিতায় হারাইল রুচি।

এখন আফেন্দি নতুন লোক
চলবার বলবার হেলবার দুলবার
দুর্লঙ্ঘ্য বন্ধন রজ্জু ঠেলবার

অসহিষ্ণু আকাঙ্ক্ষার বেগ
আকেন্দি আপন মর্মে করে অনুভব।
যত সম্ভব ইচ্ছে
আকেন্দির মানসে বনায়
ইচ্ছে করে জয় করে মাউন্ট এভারেস্ট
দুই হাতে ঝাপটে ধরে ঝটিকার ক্রেস্ট
ভেনিসে খালের জলে গণ্ডোলা ভাসায়
মরু-ঝড় তুচ্ছ করে অশ্বপৃষ্ঠে দ্রুত চলে যায়
বেহালায় ছড় টেনে পৃথিবী কাঁদায়।
আকেন্দি কবিতা লেখে
গজলের পুচ্ছে দেয় টান
আকেন্দি এখন ভাবে
যা কিছু যৌবনোচিত পঞ্চাশোর্ধ বয়সে মানায়।

দুহিতার শোক

সূর্য অস্ত যেয়ো নাকো পৃথিবী আপন কক্ষে স্থির হয়ে থাক
তোমরা সকলে মিলে কন্যাকে জননী থেকে কেন কর জুদা
ভরবে না শূন্যস্থান যদি দাও আদি অন্ত ব্রহ্মাণ্ড বসুধা
জানাজা নামাজি তাই দয়া করে মৌনব্রতে দীর্ঘক্ষণ থাক।

সমস্ত অস্তিত্ব দিয়ে আমি এই মুহূর্তটি প্রাণপণে বাঁধি
ঘিরে রহ সবকিছু একদৃষ্টে মাতৃমুখ করি নিরীক্ষণ
আহা কেন কর এখুনেশ বারবার কর্কশ ক্রন্দন
মাতৃঅঙ্গ স্পর্শ করে আমি শুধু শেষবার কাঁদি।

কবরগাহে জানেওয়ালে নেকবখ্‌ত খোদার বান্দা একটু দাঁড়াও
শরীরে মস্তক রেখে শেষবার অন্যাহীনা মাতৃগন্ধ শুঁকি
পড়শি বান্ধবজন চেয়ে দেখ দীনহীন আমি অতি দুখি
আমাকে একেলা রেখে জননী নীরবে তুমি কোথা চলে যাও।

কে নিষ্ঠুর জোরওয়ার ক্ষিপ্র হস্তে লুট কর মায়ের অন্তর
কোথায় দাঁড়াব বল কোন্ তরু বিয়াবনে দেবে স্নিগ্ধ ছায়া।
যেদিক ফিরাই আঁখি দেখি ভ্রান্ত দেখি শুধু মায়া
বিষাদ পসরা পূর্ণ ভগ্ন জীর্ণ টলমল জীবন কান্তার।

অন্তিম যাত্রার ক্ষণ দ্বিধাভরে একটুকু প্রলম্বিত হোক
মিনারের দীর্ঘ ছায়া নম্র হয়ে বক্র হয়ে নামুক ভূতলে
পাখিরা কুলায়ে যাক সূর্য ঢলে যাক অস্তাচলে
গোধূলি বেলার শেষে মূর্ত হোক অন্ধকারে অন্তরের শোক।

সূর্য ছিঁড়ে পড়ে নাই নক্ষত্রেরা বেদনায় যায়নিকো ঝরে
শহরের পথচারি গাড়ি-ঘোড়া নিত্যকার এই যানজট
সমস্ত নিয়মে চলে ফিরে আসে বারবার একই দৃশ্যপট
কী করে ফিরব একা অভাগিনী মাতৃহীন ঘরে।

দুঃখের দরিয়া তীরে ফুঁসে ওঠে অন্তহীন বেদনার বাও
অন্তরে ঝঞ্ঝার বেগ বড় দুঃখ, বড় কষ্ট, বড় পেরেশান
বেগানা আপন চিত্ত রুদ্ধ শোকে নিরন্তর কেঁদে ওঠে প্রাণ
মেলে দুই স্নেহপাণি জননী আমাকে তুমি কোলে তুলে নাও।

খোকন এবং রাখাল বায়ু

খোকন সোনা : রাখাল বায়ু, রাখাল বায়ু
ছুটছ দিশেহারা
শান্ত সাগর পাহাড়তলি
মাছমারাদের পাড়া
ঝাউয়ের বনে নতুন পাতা
গজিয়ে গেছে কান
দোলায় চেপে রাখাল বায়ু
শুনিয়ে যেয়ো গান।

রাখাল বায়ু : খোকন সোনা খোকন সোনা
বড্ড তাড়া ভাই
বিহানবেলা পাচন হাতে
মেঘ চরাবার যাই।
রাজার গোয়াল মস্তবড়
হাজার ধেনু থাকে
খিদের চোটে ভোর না হতে
হাম্বা হাম্বা ডাকে।
একটি ধেনু মেঘের আড়ে
গা যদি দেয় ঢাকা
বেবাক মাসের মেহন্নতের
মাইনে যাবে কাটা।

খোকন সোনা : রাখাল বায়ু রাখাল বায়ু
হাওয়ার পাচন হাতে
মেঘের ধেনুর ছানাপোনা
তাড়িয়ে নে' যাও সাথে।
হাড়িয়া মেঘা কাড়িয়া মেঘা
বুড়িয়া মেঘার ভাই
মেঘ মেঘালির আসরেতে
ধেনুর নাচন চাই।
ছুটির ঘণ্টা বাজবে যখন
ছুটিয়ে দিয়ো রথ
মেঘের ভেলায় পাড়ি দিয়ো
সাগর পাড়ের পথ।
ঝাউয়ের বীথি জারুল বনে
সন্ধ্যা যখন নামে
নাগকেশরের মাথার ওপর
রথটি যেন থামে।

রাখাল বায়ু : খোকন সোনা খোকন সোনা
প্রাণভরা ডাক ডাকো
মেঘ-মুলুকে ঝংকার ওঠে
থাকতে পারি নাকো।
চুলোয় যাক ধেনুর বাথান
থাকুক রাজার কাজ
তোমার সঙ্গে প্রাণের খেলা
খেলতে হবে আজ।
হাঁড়ি ভরে কিনব স্বপন
তেপান্তরের হাটে
ঝিরঝিরিয়ে ঝিরঝিরিয়ে
ধান কাউনের মাঠে
ডিঙিয়ে পৈঠা তোমার বাড়ির
খাটের ওপর চড়ে
ঢুলু ঢুলু চোখের পাতায়
স্বপন দেব ভরে।

শিশুর চোখে

ফুল থাকবে পাখি থাকবে
থাকবে তারার বাতি

গাছের ডালে উঠবে জেগে
নতুন পাতার ছাতি
ফুলের গন্ধ রাতের বেলা
শুঁকবে সুখে চান
পথের মোড়ে কলকলাবে
ঝর্ণাতলার গান।
বইবে নদীর প্রাণের বেগে
আকুল জলের ধারা
মৌমাছিদের কলোনীতে
পড়েই যাবে সাড়া।
ভোরের আলো নামবে যবে
পাতার জাল ফুঁড়ি
একটু একটু চোখ পাকাবে
লাল পদ্মের কুঁড়ি।
ধানের ক্ষেতে করবে ফড়িং
ভীষণ ছুটোছুটি
কোঁকরকো ডাকবে মোরগ
ফুলিয়ে রাঙা ঝুটি।
রাতের বেলা তারার চেরাগ
জ্বলবে ঝাঁকে ঝাঁকে
ভোর হবে গো রাত পোহালে
ভোরের পাখির ডাকে।
ছুটবে বাছুর মায়ের পিছে
পাহাড়তলির পথে
সোনার আলো ঝিলিক দেবে
মা-জননীর নথে।
মায়ের সাথে দেখি বলে
দেখার সুখটি পাই
মা যদি নেই তবে আমার
কোন কিছুই নাই।

মৃত্যু

এই তাঁর অন্তিম শয্যা নিস্তব্ধ নীরব
এইখানে ধুকে ধুকে দীর্ঘ রোগ ভোগ
নক্ষত্রের সাথে ছিল প্রাণের সংযোগ

আজ দেখ বন্ধন মুক্ত মহিলার শব।
শুয়ে আছে স্নেহময়ী অন্তিম শয়নে
পুত্র-কন্যা ঘর-বাড়ি স্বামী ও সংসার
তোশক মশারি শোকে করে হাহাকার
কেবা আসে কেবা যায় না দেখে নয়নে।

চল্লিশ বছর ধরে সাজানো সংসারে
বিহঙ্গী মায়ের মত পুত্র কন্যাগণে
লালন করেছে স্নেহে হৃদয়ের খুনে
ছেড়ে-ছুড়ে সব কিছু যায় পরপারে।

এই গৃহ এই খাট এই জায়নামাজ
ঝোলানো তশবীমালা রেহেলে কোরান
সায়ংবেলায় শোনা পাখিদের গান
চলে যায় সব ফেলে সংসার সমাজ।

এই গৃহে জননীর স্নেহের পরশ
স্রোতের ফেনার মত রেখে গেছে চিন
দেখ সমস্ত বিষাদ কিষ্ট বিষণ্ন মলিন
দ্যাখ ধুকপুক নিশ্বাস যন্ত্র অনন্তর বশ।

কবিতার দোকান

আমি যে সকল কবিতা লিখি সেগুলোর একটা
বিশেষ মজা আছে। তাজা কয়লায় ছ্যাকা
সুস্বাদু কাবাবের মত স্বাদ আমার কবিতার।
নাকে ঘ্রাণ লাগতেই খাওয়ার ইচ্ছে জাগ্রত
হয়। মুখের আগায় লালারা এসে অভ্যর্থনা
করার জন্য জটলা পাকাতে থাকে।
কবিতা রান্নার কাজটিও আমি চমৎকারভাবে
করে থাকি। কড়া পাকের, খাড়া পাকের
নরম-গরম মৃদু মিহি সব ধরনের
কবিতা রান্নায় আমার হাতযশ আছে।

রান্নার কাজটি আমি এত ভালভাবে করতে
পারি, আপনারা আমার বাবুর্চিগিরির

তারিফ করবেন। আমি এক হাতেই কবিতা
রান্নার যাবতীয় কঠিন কর্ম সম্পাদন করি।
আনাড়ি লোকের স্পর্শ দোষে আমার
হেঁশেলের কোন রকম অপযশ ঘটে, সে
আশঙ্কায় কোন ধরনের সহকারির সহায়তা
গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকি। রসুইঘরের
যাবতীয় কাজ ধোয়া-মোছা, কোটা-বাছা,
মায় কড়াই উনুনে চাপানো পর্যন্ত সব
একা আমাকেই সারতে হয়। মাঝে মাঝে হাঁফ
ধরে যায়। উপায় কী! তৈরি জিনিশের মান ধরে
রাখতে হলে এটুকু কষ্ট তো স্বীকার করতেই হবে।
আমি আমার কলজে, ফুসফুস, হৃদয় এমন কী
সময় বিশেষ অন্তরাত্মা পর্যন্ত কেটে
পরিপাটি রান্না করে ফেলি। তারপর
সুবর্ণ তসতরিতে ঢেলে খদ্দেরদের পরিবেশন
করি। আমি কবিতার উপকরণসমূহ বিষ্টিতে
ভেজাই, জ্যোস্নায় মেলে ধরি, শিশিরধারায়
স্নাত করি এবং রোদ্দুরের আঁচ লাগাই।
আসমানের বিজলি থেকে ছেনে স্বর্গীয় আগুনে
কবিতার উপকরণসমূহ ভাজা করে ফেলি।
হাসি-কান্না ব্যথা-বেদনার ফোড়ন ব্যবহার
করে আমি রান্না করা কবিতার স্বাদে বৈচিত্র্য
সৃষ্টি করি। কিশোর-যুবাদের কথা স্মরণ করে
কখনো কখনো দু' চারফোঁটা আদিরসও অন্যান্য
উপাদানের সঙ্গে ছড়িয়ে দেই।

আমি রন্ধন শাস্ত্রে
অত্যন্ত বুজর্গ এবং কামেল মানুষ। আমাকে কেউ
কেউ যখন ঠাট্টার ছলেও হজরত সম্ভাষণ করে,
আমার রাগ দুঃখ কোনটাই হয় না। কারণ আমি মনে করি একজন
হজরত হওয়ার যোগ্যতা আমার আছে।
সমস্ত উপাদান পরিমিত আকারে ব্যবহার করার ক্ষমতা
আমার অসাধারণ। আমার রান্নার গুণে নিতান্ত
তুচ্ছ জিনিশও নতুন একটি শিল্পসত্তার গরিমায়
উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।
রন্ধনশিল্পের এমন কতিপয় অলৌকিক কৌশল

আমি রপ্ত করে ফেলেছি, যাই-ই রান্না করিনে কেন
অমৃতে রূপান্তরিত হয়। আমার হাতের যাদুতে
নিতান্ত অভক্ষ্য পদার্থেও পরমান্নের স্বাদ সঞ্চারিত
হয়। আর আমি এক ধরনের খাবার বারবার
পরিবেশন করে আমার খদ্দেরের রুচিবোধ পীড়িত
করে তুলিনে। ইদানিং আমার মধ্যে আরো একটি
অলৌকিক ক্ষমতার আভাস আমি টের পেতে
শুরু করেছি। খদ্দেরের অন্তরে মহৎ বস্তুর
চাহিদা তৈরি করার পারঙ্গমতা আমি
অর্জন করে ফেলেছি। মুখে একটি বাক্যও
উচ্চারণ না করে আমি খদ্দেরের মনোগত
অভিপ্রায় নিয়ন্ত্রণ করতে পারি। আমি নিজে
যে ব্যক্তিগত ব্যাকরণের সূত্রসমূহের চর্চা
করি, খদ্দেরের মনোলোক সেগুলোর
শাসন মেনে চলে।
মহৎ ক্ষুধার চাহিদা মোতাবেক জিনিশ
সরবরাহ করার জন্য আমি একপায়ে খাড়া হয়ে
দাঁড়িয়ে থাকি। খদ্দের মাত্রই লক্ষ্মী। খদ্দেররা
যদি দাবি করে আমি সপ্ত সমুদ্রের জল,
আসমানের তাবত গ্রহ-নক্ষত্র, জঙ্গলের পশুকুল,
কাননের সব পাখ-পাখালি রান্না করে ফেলে খাবার টেবিলে হাজির করতে
পারি। যে মানুষ একবার আমার তৈরি খাবারের
স্বাদ পেয়েছে, সারাজীবনের জন্য কেনা হয়ে গেছে।
কবিতার দোকান উঠিয়ে যদি সুন্দর বনের
গহীনেও নিয়ে যাই, আমার খদ্দেররা ঝাঁক বেঁধে
হিংস্র জন্তুর-আতঙ্ক অগ্রাহ্য করে ঠিক সময়ে এসে
হাজিরা দেবে। ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলেছেন, গহন
বনে ফুল ফুটলেও মৌমাছি ঠিক খবর পেয়ে যায়।

আমার হেঁশেলে উৎকৃষ্টতম খদ্দেরদের জন্য
উৎকৃষ্টতম খাদ্যবস্তু রান্না করা হয়। আমি কেবল
স্বাস্থ্যবান মানুষদের জন্য সুস্বাদু খাবার পরিবেশন
করে থাকি। আমার দোকানের সব ধরনের খাদ্য
দ্রব্যে নিজস্ব প্রাণের একটা ছোঁয়া তো থাকেই।
তাছাড়া মগজের এমন সূক্ষ্ম আরক কৌশল মিশিয়ে দেই,
সমঝদার লোকেরা আমার নামে ধন্যধ্বনি উচ্চারণ করে।

এই ধরনের বলকারক খাদ্যবস্তু পেটরোগা মানুষদের ক্ষেত্রে
বিষ হয়ে দাঁড়াতে পারে। তাই আমার দোকানে
দুর্বল পরিপাক যন্ত্র বিশিষ্ট মানুষদের প্রবেশ
নিষেধ। এই সমস্ত মুখপোড়া হনুমানের দল
অষ্টপ্রহর আমার তৈরি খাবারের যে নিন্দে
করে তাতে অবাক হবার কীই-বা আছে।
শেয়ালদের জন্য রসালো আঙ্গুর ফল সব
সময়েই টক হয়ে থাকে।
মুশকিলটা শুধুমাত্র পেটরোগা মানুষদের নিয়ে
হলে আমার আশঙ্কার বিশেষ কারণ থাকত না।
মাঝখানে চোর-কামারদের মধ্যে একটা অশুভ
সংযোগের ব্যাপার ঘটে গেছে। নগরীর বড়
বড় কবিতার আড়তগুলোর সঙ্গে পেটরোগা
মানুষদের একটা অলিখিত আঁতাত ওই সময়ের
মধ্যে ভালভাবে দাঁড়িয়ে গেছে। বিষয়টা
একটু বুঝিয়ে বলার অপেক্ষা রাখে। নগরীর
রাজপথ আলো করে সে সকল কবিতার দোকান
বিশাল বিশাল মনোহরণ সাইনবোর্ড বাগিয়ে
মূর্তিমান অস্তিত্ব নিয়ে দণ্ডায়মান, সেগুলোতে
পেটরোগা মানুষেরা পোকা মাকড়ের মত কিলবিল
করে। তারা দিব্যি আনন্দে এইসব দোকানের
দূষিত খাবার গলাধকরণ করে এবং পেটের
পীড়ায় ভুগে থাকে। দূষিত খাবার খায় বলে পেটের
পীড়া জন্মে কিংবা মানুষের পেটে রোগ সৃষ্টি
করার জন্য এইসব পেটমোটা ঘাড় তেরছা
দোকান কর্তারা অপকৃষ্ট খাবার পরিবেশন
করে থাকে— এর মধ্যে কোনটা কার্য আর কোন্‌টা
কারণ, কে গবেষণা করে নির্ণয় করবে? সে
প্রসঙ্গ থাকুক। সাত মন তেলও পুড়বে না আর
রাধারাণীও নাচবে না।
ডাঙ্গর ডাঙ্গর কবিতার দোকানদারদের
সঙ্গে আমার খটাখটি ঘটার দৃশ্যত কোন
কারণ নেই। তারা আছে তাদের তেজারতি নিয়ে।
রমরমা ব্যবসা। দোকানে খদ্দের গমগম
করে। অনেক লোক-লস্কর তারা পুষে
থাকে, যারা সর্বক্ষণ খদ্দেরদের চাহিদা মেটাতে

ব্যতিব্যস্ত থাকে। এইসব দোকানে শ্লেষ্মা
কফ, থুথু, নাড়িভূঁড়ি পুরনো কবি মশাইদের
সঞ্চিত বমি তোষামোদ মার্কা আবেগের
চর্বিতে ভাজা করে পটাপট পরিবেশন করা
হয়। মানুষ ভক্ষণ করে এবং পেটে পীড়া সৃষ্টি হয়
অথবা পেটে পীড়া সৃষ্টি করার জন্যই ভক্ষণ
করতে আসে। মনোমুগ্ধকর প্রচারের বদৌলতে
খদ্দেরদের মধ্যে এমন একটা বদ্ধমূল ধারণা
সৃষ্টি করা হয়েছে, পেটে পীড়া সৃষ্টি করাতেই হল
ভোজনের প্রকৃত আনন্দ।
এইসব কবিতার দোকানের মহাজনদের
মধ্যে একটা তীক্ষ্ণ প্রতিযোগিতা সর্বক্ষণ চালু রয়েছে।
কে কাকে ল্যাং মারবে, কে কার খদ্দের ভাগিয়ে
নেবে, ছোঁ মেরে কে কার মুখের অন্ন কেড়ে নেবে
এ নিয়ে সর্বক্ষণ কুরুক্ষেত্রের মত ব্যাপার ঘটে
যাচ্ছে। এই ব্যবসার এটাই রীতি। প্রতিযোগিতা
এবং সহযোগিতা এ ওর হাত ধরে চলাচল করে।
কখনো কখনো এমন সময়ও আসে যখন কবিতার
বৃহৎ ব্যবসায়ীদের সামনে সমূহসংকটের কাল
সংশয় সন্দেহের মেঘ কুয়াশা ছড়িয়ে দিয়ে এসে
হাজির হয়। তখন কবিতার বৃহৎ ব্যবসায়ীরা
দুনিয়া আন্ধার দেখতে আরম্ভ করে। খদ্দেরেরা
এসব কফ, থুথু, নাড়িভূঁড়ি, পুরাতনকালের
কবিদের জমিয়ে রাখা বমি ভক্ষণ করতে
অস্বীকৃতি জানায়। কবিতার কারিগরদের দিকে
অঙ্গুলি নির্দেশ করে তাদের ভেজাল জিনিশের
কারবারি হিসেবে শনাক্ত করে। সময়ের
স্রোত মন্থন করে অমৃত পয়দা করতে অক্ষম
এসব দু'নম্বরি মালের কারবারিরা ব্যবসায়িক
স্বার্থ টিকিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে পরস্পর জোট বাঁধে।
উৎপন্ন পণ্য নতুন চোখ ধাঁধানো মোড়ক
দিয়ে আবৃত করে। অবমূল্যায়ন ঠেকিয়ে
রাখার মানসে একে-অন্যকে দুনিয়ার তাবত
মহৎ সম্ভাষণে সম্ভাষিত করে। পচা মাছ যেমন
অতিরিক্ত ঝাল মশলা দিয়ে রান্না করে দুর্গন্ধ
চাপা দেয়া হয়, তেমনি তারা নিজেদের দেউলেপনা

অক্ষমতা এবং ক্লীবত্ব ঢাকা দেয়ার জন্য প্রচণ্ড
রকম কোলাহল ও হট্টগোলের আয়োজন করে
থাকে। কায়েমী স্বার্থবাদীদের টিকে থাকার এটাই রীতি।
আমি করি সাধনা, তারা করে তেজারতি।
প্রকৃতির দিক দিয়ে দু'জিনিশ এক নয়।
সারাজীবনের সাধনায় যদি মুষ্টিমেয় উৎকৃষ্ট
খদ্দের আমার জোটে, ধরে নেব আকাশের
আল্লাহ্ আমার প্রতি অত্যন্ত সদয়। কবিতার
বৃহৎ ব্যবসায়ীদের লক্ষ্য ভিন্নতর। তারা এন্তার
উৎপাদন করে, বিপুল তাদের লাভের
পরিমাণ, সঞ্চয়ের অঙ্ক তারো চাইতে বেশি।
শেয়ার বাজারে একচ্ছত্র প্রতিপত্তি টিকিয়ে রাখার
জন্য তাদের প্রয়াসের অন্ত নেই। তারপরও ভয়ঙ্কর
সময় আসে যখন পুঁজি বাজারে ধ্বস নামে, তাদের
রাজ্যপাট থরথর করে কাঁপতে থাকে। অবমূল্যায়িত
ব্যাংকনোটের মত তারা বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়ে
বসে। এইধরনের নাজুক পরিস্থিতিতে আমার
সেই বিরল খদ্দেরদের দু'য়েকজন যদি করুণা
না করে তাদের সমস্ত ব্যবসা লাটে উঠবে। উৎকৃষ্টতম
খাদ্যবস্তুর উৎকৃষ্টতম ভোক্তাদের মতামতের ওপরই
নির্ভর করে অপকৃষ্ট মালের কারবারিদের
বাজারে টিকে থাকার সম্ভাবনা।
গণ্ডগোলটা ঘটেছে ঠিক এইখানে। কবিতার বড়
বড় প্রতিষ্ঠানের কর্তাব্যক্তিরা আমার ওপর একটি
কারণে ভীষণ খাপ্পা। উৎকৃষ্টতম খাদ্যের
সমঝদার ব্যক্তিরা আমার মত একজন
অভাজনের দোকানে দর্শন দিয়ে থাকেন, এটা
তাদের চিত্তদাহের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তাদের
অহমিকা বোধে ঘা লাগে। তারা দুনিয়াশুদ্ধ
মানুষকে প্রচণ্ড চিৎকার করে বুঝিয়ে থাকে
যে তাদের দোকানে যে সকল কবিতা বিক্রি
হয়, সেগুলোই আদি এবং আসল কবিতা,
প্রকৃত বিশুদ্ধতার দাবিদার। একটা ভয়ও
তাদের মনে খুব কাজ করে। যে সকল শ্রেষ্ঠ
মানুষ আমার দোকানে এসে থাকেন, তাঁরা
অতিশয় সৎ এবং স্ফটিকের মত তাঁদের

স্বচ্ছতা। ওদের কেউ যদি আচমকা বাজারি
কবিতার দোকানদারদের সম্বন্ধে মতামত
দিয়ে বসেন, তাদের সমূহব্যবসায়িক
ক্ষতির সম্ভাবনা। কায়েমী স্বার্থের
তল্পিবাহকেরাও সৎ এবং গুণবান মানুষের
মতামতকে অগ্রাহ্য করতে পারে না।
তাই এ নগরীর কবিতার প্রতিষ্ঠিত
দোকানদারের সকলে সর্বক্ষণ চেষ্টিত
থাকে আমি যাতে কোন দোকান ঘর ভাড়া
করতে না পারি। সকলে মিলে
বাড়িঅলাদের শাসায় আমাকে ঘর ভাড়া
দিলে রক্তপাত ঘটবে, আগুন ছুটবে।
তার ফলে আমার পক্ষে কোন দোকান
পেতে বসা সম্ভব হয়নি। বারবার ঠাঁই
নাড়া হতে হতে শেষমেষ একটি চিলে
কোঠায় আমি ডেরা পেতেছিলাম। সেখানেও
দেখি কবিতার দোকানদারেরা দৌরাত্ম্য
শুরু করেছে। তাই অনুপায় হয়ে আমি
আমার কবিতার দোকান টলমল
মেঘের মুলুকে সরিয়ে নিতে বাধ্য হয়েছি।
এখন মনে হচ্ছে, এটাই উপযুক্ত
স্থান। প্রথম থেকে যদি বুঝতে
পারতাম, অনেক অকারণ হয়রানি থেকে
রেহাই পেয়ে যেতাম। এখন আমি অনেকটা
নিশ্চিন্ত। আমার খদ্দেররা হাওয়াতে
সিঁড়ি লাগিয়ে মেঘ-মুলুকের ক্যান্টিনে
নির্বিবাদে চলে আসতে পারবে। নগরীর
দোকানদারদের বাগরা দেয়ার
সমস্ত পথ বন্ধ। বিশুদ্ধতার জগতে
তাদের গতিবিধি সম্পূর্ণ অচল। এখন
আমি করধৃত আমলকীর মত সমস্ত
বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের দায়িত্বভার গ্রহণ করে
ফেলেছি। কার সাধ্য আমাকে ঠেকায়।
আমার সাধনায় ফুল ধরছে, ফল ফলছে।
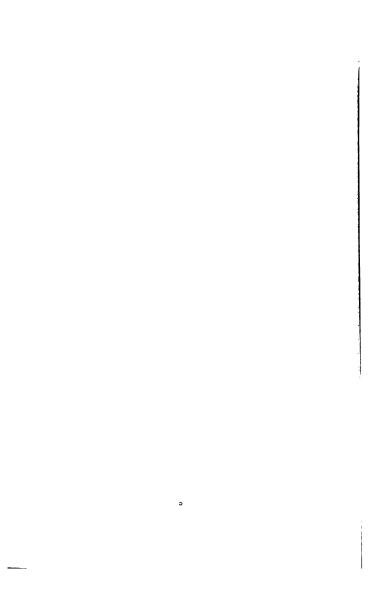
আহিতাগ্নি

[প্রথম প্রকাশ : ২০০১]

উৎসর্গ

অরুণ মৈত্র

১

ঘর করলাম নারে আমি
সংসার করলাম না
আউল বাউল ফকির সেজে
আমি কোন ভেক নিলাম না।
মনের ঘরে প্রবেশ করে
মনকে কাছে পেলাম
জন্মদিনের মত আজো
শিশু থেকে গেলাম
ভাল-মন্দ কোন কিছুর
হিসাব নিলাম না।
পাড়া-পড়শির চোখে যখন
নিশি রাতের ঘুম
স্বপ্ন-তাপে ফুটাইলাম
আকাশে কুসুম
গন্ধ বিলায় নাকি আমি
শুঁকে দেখলাম না।
আঘাত পেলাম ব্যাঘাত পেলাম
পেলাম নারীর সুধা
প্রাণে তবু রোদন করে
জন্মান্তরের ক্ষুধা
এ জীবনে আমি কোন
বাঁধন পরলাম না।
দূর্বাদলে ঝিলিক খেলে
শিশির জলের নোলক
ঢেউ দিল না প্রাণ-পাতালে

মুক্তি রসের শোলক
পন্থ হলাম নারে আমি
পথিক হলাম না।

নীলক্ষেত
১০.১১.৭৭

২

আমি তাকিয়ে শুধু থাকি
দূর্বা ছাওয়া আঙিনাতে
তার চরণ পড়ে নাকি।
শিরীষডালে ঘুম নেমেছে
সূর্য ডুবু ডুবু
নদীর জলে আগুন জ্বলে
এল না সে তবু
চোখ মেলেছে সন্ধ্যাতারা
বাসায় ফেরে পাখি
ইচ্ছে করে পরাণ খুলে
নামটি ধরে ডাকি।
ভুল করে সে যদি হঠাৎ
কড়া নাড়ে দ্বারে
ফিরিয়ে দেব ফিরিয়ে দেব
বসতে দেব নারে
অভিমানে রইব আমি
দুই হাতে মুখ ঢাকি
সেই আশাতে আঙিনাতে
নয়ন পেতে রাখি।

নীলক্ষেত
১৩.১১.৭৭

৩

পোড়া বাঁশি তুই কেঁদে কেঁদে বল
প্রাণে যে রোদন বাজে
সুরে সুরে বল।
জানুক সকলে শুনুক সবাই
কেন তোরে আমি
সাধ করে বাজাই।
তোর বুকের রোদনধ্বনি শিহরি শিহরি
বিষাদ তরঙ্গরঙে ফোটায় লহরি
অকারণে আঁখি করে ছলছল।
কোন্ বেদনার পরশে তোর
হৃদয় ওঠে দুলে
তোর সুরের মধু বিরাজ করে
কোন্ পরাণের ফুলে
ফুলের সমান রাঙা
সেই প্রাণের কথা বল।
ও তার কালো কেশের রাশি
চাঁদ বদনের হাসি
আলতা পরা তার চরণকমল।
বাঁশি বলে দে রে বলে দে রে
ও তার কালো আঁখি নাচবে নারে
সকালবেলা সিনান করে
মুকুরে সে মুখ না হেরে
সে হয়েছে অভিমানে স্তব্ধ দিঘির জল।

নীলক্ষেত
১৩.১১.৭৭

৪

প্রতিদিনের ধরা-ছোঁয়ায়
ফুল থাকে না ফুলের মত
মলিন হয়ে যায়।

যেজন শুঁকে অহঙ্কারে
ফুলের পরিমল
ফুল চেনে না ফুল চেনে না
সেজন করে
ফুলকে চেনার ছল।
আপন মনের
কালিমা সে
মাখায় ফুলের গায়।
অনুরাগের পরশ পাথর
যেজন প্রেমিক
ছোঁয়ায় তরুমূলে
রাঙা কুড়ির নিদ্রা ভাঙে
সদ্য ফোটা ফুলে
ফুলের আঘাত লাগে তারি
প্রাণের আঙিনায়
ফুলের এমন পোড়া কপাল
বধুরে কাঁদায়।

নীলক্ষেত
১৬.১১.৭৭

৫

তনু দেহের তনিমা
ফোটা ফুলের প্রতিমা
মনের ভেতর
আবীর ছড়ায়
আলতা চরণ শোণিমা।
রাতুল দেহ বল্লরী
শিখার মত সুন্দরী
ভাসে দিবস শর্বরী
অঙ্গ রাগের গরিমা।
নয়ন দুটি টলটলে
অলকদলে ঢেউ চলে

চম্পাকলির স্বপ্ন ভরা
চাঁদ বদনের জড়িমা।
চরণ ফেলার ভঙ্গিতে
শরীর দোলার সঙ্গীতে
স্বর্গ নাচে থরথর
কি মোহিনী মহিমা।

নীলক্ষেত
১১.১১.৭৭

৬

ওই যে জ্যোতির পুঞ্জলোকে
মধুর মধুর ঘণ্টাধ্বনি
আকাশ তারে বার্তা পাঠায়
হাওয়ায় ওঠে শব্দরণি
তোরা যদি পারিস
ঠেকিয়ে রাখিস
তড়িৎগতি আকাশ রথে
যদি পারিস তোরা দেয়াল গাঁথিস
শূন্যলোকে চলার পথে
কান পেতে শোন্ ওই অসীমে
রটে তারই জয়ধ্বনি।
যার শরীরের ভার টুটেছে
যে কেটেছে নাড়ির বাঁধন
আঁধার গুহায় যে করেছে
নম্র আলোর নীরব সাধন
তারে নাহয় নাইবা দিলি
দুবিঘা ভুঁই খাস দখলি
রাঙা মেঘের বন্দরে তার
জমছে মজার মহাজনি।

নীলক্ষেত
১৬.১১.৭৭

৭

চন্দ্রা, চন্দ্রা, চন্দ্রাবতী
তোমার সঙ্গে আমার
প্রাণের লেনাদেনা
শেষ হল গো চন্দ্রাবতী
শেষ হল গো হৃদয় দিয়ে চেনা
চন্দ্রা, চন্দ্রা, চন্দ্রাবতী।
তোমার আমার মনের মাঠে
প্রাণ-পিরিতির নদী
কোন্ সাগরের পরশ যেচে
বইবে নিরবধি
যুগল ধারায় ফুল ছড়াবে
কোন্ সাগরের ফেনা
চন্দ্রা, চন্দ্রা, চন্দ্রাবতী।
তখন রাতে জোছনাস্রোতে
নাইবে রজনী
মেঘের গাঙে রইবে ভেসে
চাঁদের তরণী
চন্দ্রা, চন্দ্রা, চন্দ্রাবতী।
স্মৃতির ভেতর সুবাস দেবে
আকুল হাস্নাহেনা
চমক দেবে বেদনরেখা
প্রাণের মূল্যে কেনা।
চন্দ্রা, চন্দ্রা, চন্দ্রাবতী।

নীলক্ষেত
১৮.১১.৭৭

৮

আমার সব শেকড়ে
কেমন করে
প্রাণ জেগেছে ধারায় ধারায়।
কোন্ কামনার কনকরেণু
ফুলপরীদের বসন রাঙায়।

আকাশে চমক হানে
কোন বাসনার উত্তরি
বাতাসে গন্ধ ঢালে
কোন্ হৃদয়ের কস্তুরি
কানে কানে কোন্ বালিকা
স্বর্গপুরের নূপুর বাজায়।
আমার প্রাণ জেগেছে
শিরায় শিরায়।
টান লেগেছে কি ঝঙ্কারে
লক্ষ হাজার আলোর কণা
রুদ্ধ-প্রাণের আকাঙ্ক্ষারে
চরাচরের তীর্থলোকে
কি আনন্দে তাড়িয়ে বেড়ায়।

নীলক্ষেত
১৮.১১.৭৭

৯

কমলহীরার দীপ্তি ভরা
তোমার এমন কঠিন অহঙ্কার
ইচ্ছা করে গলায় পরি
গড়িয়ে অলঙ্কার।
আহা যদি পারতাম,
যদি পারতাম আমি
মন খেলিয়ে
বানিয়ে নিতাম
মনের মত
উজ্জ্বলতা লজ্জা দিত
রাজরানীদের হার।
আমি তাদের সভায় যেতাম
দুলিয়ে শাড়ির পাড়

দেখত লোকে অবাক চোখে
কেমন শোভা কার।
পেলব কোমল অন্তরালে
তীক্ষ্ণ হীরার ধার
মনের মত কাটবে এমন
পাইনি মণিকার।
তাই তো থাকি ছায়ার মত
বই যে তোমার ভার
পাছে এমন রতন মানিক
কণ্ঠে দোলাও কার।

নীলক্ষেত
১৮.১১.৭৭

১০

ফুলে ফুলে ছাওয়া নিকুঞ্জতল
আলোকে পুলকিত শ্যামবন অঞ্চল।
ঝিরিঝিরি ঝরণার লীলায়িত ছন্দে
এলোমেলো বয় হাওয়া মুখর আনন্দে
দুই তীরে অবিরাম মৃদুগান কহিয়া
এঁকে বেঁকে কালো জল ধীরে যায় বহিয়া
নীপ তরু শিহরিত পল্লব চঞ্চল
বেণুবনে মর্মর বায়ু বহে পূরবী
থেকে থেকে বনফুলে ভেসে আসে সুরভি
সুন্দর সকাল নামে স্বর্ণ রথে চড়িয়া।
সোনালি কিরণধারা পড়িতেছে ঝরিয়া
পত্র পুঞ্জে গুঞ্জে গুঞ্জে বার্তা কহে সমীরণ
এস তবে গাও সবে ধরণীর জাগরণ
উষসী মেলেছে আঁখি রক্তিম উজ্জ্বল।

নীলক্ষেত
১৯.১১.৭৭

১১

তোমার ঘরে যাওয়ার পথটি
নাক বরাবর সোজা
এতদিনে এই কথাটি
হয়নি আমার বোঝা।
যদি আমি ঘুচিয়ে দিয়ে
সকল অহঙ্কার
তোমার ওপর ছেড়েই দিতাম
পোড়া প্রাণের ভার
বাহ্ পেতে নিতে তুমি
ধন্য হত খোঁজা।
তখন বোধ ছিল না একেবারে
বুদ্ধি ছিল মাটি
সাজা-গোজার মূল্য ছিল
প্রেমের চেয়ে খাঁটি
লাজে মরি এই কারণে
খোঁপাতে ফুল গোঁজা।

নীলক্ষেত
১৯.১১.৭৭

১২

ঘরে পরে তফাত আমার
কখন গেছে ঘুচে
তবু লোকে সকাল বিকাল
ঘরের খবর পুছে।
আসতে যেতে নানান মানুষ
ঘরের খবর লয়
আমার কখন ঘর ছিল কি
মনেতে সংশয়
হাল-সাকিনের লজ্জা আমার
কেমনে জানি মুছে।
যদি বলি ঘরটি হবে
সাগর জলের নিচে

ঘাড় দুলিয়ে বলবে মানুষ
কখখনো নয় মিছে
নিত্যি নতুন ঘরের খবর
শ্রবণে না রুচে।
যদি বলি ঘরটি হবে
নীল আকাশের নীলে
মিটি মিটি চেরাগ-জ্বলা
লক্ষ তারার বিলে
বলবে মানুষ সেসব খবর
সত্য হবার নয়
তবু লোকে সকাল বিকাল
ঘরের খবর পুছে।

নীলক্ষেত
১৯.১১.৭৭

১৩

রাঙা শাড়ির আঁচল তোমার
যখন ওঠে দুলে
মন গগনের পবন রাঙায়
রক্ত শিমুল ফুলে।
তনু দেহে কনকবরণ
কনকচাঁপার আলো
ঢেউয়ের মত গড়িয়ে নামা
কেশের বরণ কালো
হাজার রাতের স্বপন ভাসে
সোনার চরণমূলে।
সোহাগ ভরে অনুরাগে
জড়িয়ে ধীরে ধীরে
বেনারসি পেঁচ দিয়েছে
শরীর বল্লরীরে
চমকে চোখে মরণ ঘনায়
বাঁচি মনের ভুলে।

নীলক্ষেত
৫.১২.৭৭

১৪

আমার কি যেন কি নাই
ভাষায় যারে যায় না বলা
ভেদ করেছে প্রাণের তলা
কি অসহন হৃদয় দহন
ক্ষত নিয়েছে ঠাঁই।
পুষ্প যেমন কোমল বুকে
নিমেষ হারা নীরব দুখে
গুমরে কাঁদে অভিমানে
তেমনি লাগে এই পরানে
ডাকাত ব্যথার ঘাই।

নীলক্ষেত
১২.১২.৭৭

১৫

গেল বছর কনকচাঁপা
যখন ফুটি ফুটি
আমরা দুজন ভিড় করেছি
তরুতলে জুটি।
ভৈরবী রাগ হাওয়ায় বাজে
ঘুমের আমেজ গায়ে
দূর্বাদলের সিক্ত পরশ
লাগে পায়ে পায়ে
বোধ করেছি প্রাণের তলে
সুখের জাগরণ
পান করেছি রক্ত উষার
আলোক মুঠি মুঠি।
এই বছরে কনকচাঁপার
পাগল করা ঘ্রাণ
ব্যাকুল ভোরের ভৈরবীতে
কাঁদায় কেন প্রাণ।
চাঁপাগাছে থোকা থোকা

পুষ্প ফোটার মাসে
ঝরা ফুলের বাসের মত
কাহার স্মৃতি ভাসে
এই বছরে কনকচাঁপা
যখন ফুটি ফুটি
নয়ন মেলে খোঁজে কারে
হলুদবরণ গুটি।

নীলক্ষেত
১১. ১২. ৭৭

১৬

আমি গেলে তো আর ফিরব না
এই পৃথিবী রইবে নতুন
রইবে ঘুঘুর হু হু কূজন
ফুল ঝরানো শিউলিতলা
আঁকা-বাঁকা নদীর চলা
থাকবে শিশু যুবক বুড়ো
বেবাক কিছু থাকবে পড়ে
আমিই শুধু থাকব না।

জোনাকিদের আলোকমালা
রইবে নানান ফুলের ডালা
দিন ফুরালে রাত্রি শুরু
প্রাণের কাঁপন দুরু দুরু
কৃত্তিকা আর রোহিণীরে
নাম ধরে তো ডাকব না।
প্রবাসী সব ফিরবে ঘরে
বিরহিণী যতন করে
আঁকবে টিপ পরবে শাড়ি
উঠবে হেসে সারা বাড়ি
প্রাণ-তরঙ্গে জীবন-রঙ্গে
আমি তো আর ভাসব না।
কাঁপা কাঁপা তারার জ্যোতি

ছড়িয়ে দেবে পান্না মোতি
গহনরাতে স্বপন সূতে
আশার মালা গেঁথে-গুঁথে
করবে প্রেমিক শুকতারাতে
সুখের বাসর রচনা
আমি তো আর নয়ন মেলে
মধুর ছবি দেখব না।

নীলক্ষেত
১২.১২.৭৭

১৭

সারা জনম করে গেলাম দেখার ছলনা
কারো সঙ্গে আমার দেখা হল না।
নারী বটে পুরুষ বটে
নিত্যি দেখা এমনি ঘটে
রঙে রঙিন কথার ফানুস
তার ভেতরে শুদ্ধ মানুষ
দেখব কবে নয়ন মেলে মানবচেতনা।
পথে ঘাটে আসতে যেতে
সকাল দুপুর রাত বিরেতে
তুই তোকারির ফাঁকে ফাঁকে
জড়ায় যারা কথার পাকে
দেখে দেখে করি তাদের দেখার কল্পনা।
যে রমণী প্রিয়তমা
কেশে মাখে রাতের অমা
হাসিটি যার মানিক ঝরা
আমার ছোট্ট বসুন্ধরা
দেখব ওরে কেমন করে
যদি দেখব তবে ফুরিয়ে যাবে
মায়ার পুতুল খেলার পুতুল
তোমরা আমায় ভাঙতে বল না।

নীলক্ষেত
১৩.১২.৭৭

১৮

আমারে কি পারবে তুমি
ভুলে যেতে
জোছনারাতে সুখাবেশে
যখন বোধ হারাবে চুম্বনেতে।
শিথিল বসন পড়বে খসে
মত্ত হবে কেলির রসে
হঠাৎ কোকিল কুহুস্বরে
ডাকবে যখন মাঘ-নিশীথে
আমারে কি পারবে তুমি
ভুলে যেতে।
গন্ধরাজের গন্ধ যখন
ভাসিয়ে দেবে নিখিল পবন
কান্তিময়ী আঁধার নামা
পাগল করা যামিনীতে
আমারে কি পারবে তুমি
ভুলে যেতে।
যখন ফাগুন আসবে হেসে
গুঁজবে তুমি কুসুমকেশে
ঢাকবে তনু যতন করে
বাসন্তী রং শাড়িটিতে
আমারে কি পারবে তুমি
ভুলে যেতে।

নীলক্ষেত
১৪.১২.৭৭

১৯

ওরে তোরা মিছি মিছি পথ আগলে
পারবি নে রে রাখতে বেঁধে ওই পাগলে।
তার মন ক্ষেপেছে যাবেই যাবে
মনের মানস সরোবরে
যেখানে জল স্বচ্ছ তরল
মানস কমল লীলা করে।

পাগলা মনে টান লেগেছে
অহরহ জোয়ার চলে
অন্তরে লাল মশাল জ্বালা
প্রাণের তাপে পাষাণ গলে।
যেতে চায় যেতে দে রে
পাগল তোরা ঘাটাস নে রে
তোরা সরিয়ে রাখিস বসন-ভূষণ
কখন প্রাণের ফুল্কি এসে
রক্তশিখা জ্বালিয়ে দেবে
দহন-জ্বালা বুঝবি শেষে
তখন তাল মিলিয়ে চলতে হবে
যে পথে ওই পাগল চলে।
তোদের শিকল কোথায় বাঁধবি তারে
অচলপুরের আস্তাবলে।
দে যেতে যে পাগলটাকে
তার মন মেতেছে নিশির ডাকে
তিমির হনন করেই যাবে
বাঁধবি তারে কোন্ বাঁধনে
তার রক্তবরণ আসন পাতা
রক্ত-উষার সিংহাসনে
আপন মনে পথ ধরেছে
কান পাতে না কে কি বলে
বুকের মশাল উর্ধ্বে তুলে
আঁধার রাতে পাগল চলে।

নীলক্ষেত
১৫.১২.৭৭

২০

চরণ তলের ধুলো লই
ভক্তিভরে নত হই
এমন বীর এমন ধীর
ধ্রুবতারার মত স্থির
পোড়া দেশে মানুষ কই।
বিদ্যা নয় বুদ্ধি নয় নয় সাহস নয়
এমন মানুষ পেতাম যদি বিনয়

সকল কিছুর সমন্বয়
অন্তরে তার আসন পেতে
বরণ করে ধন্য হই।
মরি মরি সোনার দেশ
অশেষ তোমার দুঃখ কেশ
সকাল-সন্ধ্যা চরণ চুমি
সাতপুরুষের জন্মভূমি
উর্বরা তোর গর্ভে ধরে
সূর্যহৃদয় পুরুষ কই।
মানুষ আসে মানুষ যায়
তবু মানুষ মানুষ চায়
মানুষ বড় সবার বড়
তবু মানুষ মর মর
পোড়া দেশের কেমন রীতি
ভেবে ভেবে অবাক হই।
ইতিহাসের বাজনা শুনে
আকাশ থেকে সময় গুনে
নামবে মানুষ কেতাব হাতে
বাংলাদেশের দুখের রাতে
এসব কথা ঢের শুনেছি
শুনতে আবার রাজি নই।
প্রাণতরঙ্গে সমর রঙে
জীবন-মৃত্যুর লীলাস্থলে
মহীরুহের শিশুর মত
জাগবে যারা হৃদ-কমলে
তারা আমার প্রাণের মানুষ
আগাম তাদের তত্ত্ব লই।

নীলক্ষেত
১৫.১২.৭৭

২১

কে করেছে আমার মত
এমন অনুভব
কে দেখেছে প্রাণের চোখে
তোমার অবয়ব

ওগো চাঁদ, ওগো চাঁদ।
আমার মত শ্রবণ পেতে
কিরণধারার ভাষা
কে শুনেছে কে বুঝেছে
তোমার কাঁদাহাসা
ওগো চাঁদ ওগো চাঁদ।
আমার মত নরম শিখায়
এমন একা একা
কে জ্বেলেছে মোমের মত
ছড়িয়ে দীঘল রেখা
ওগো চাঁদ ওগো চাঁদ।
আমার মত দীর্ঘশ্বাসে
রাত্রি নদীর সাড়ে
কে চেপেছে মনের ব্যথা
করুণ হাহাকারে
ওগো চাঁদ ওগো চাঁদ।

নীলক্ষেত
১৩.১.৭৮

২২

ফুল ফোটানো সহজ কথা নয়
শূন্য থেকে মূর্ত করা সৃষ্টির বিস্ময়।
পারে সেজন ভেতর থেকে
ফোটার স্বভাব যার
ফালতু লোকের ভাগ্যে থাকে
মিথ্যা অহংকার।
যে ফোটেনি নিজের ভেতর
ফুটিয়ে তোলা কর্ম তাহার নয়
ধন চায় সে মান চায় সে
চায় সে পদের ভার
সংসারে সে রাখে প্রমাণ
আপন ক্ষমতার
ফোটাফুটির রসায়নে
কাল করে না ক্ষয়।
যার ওপরে হঠাৎ চাপে
ফুটিয়ে তোলার কাজ

বিনি পয়সার চাকর বটে
তার জোটে না সাজ
বুকেতে তার পরাণ পাখি
কেবল পাখা ঝাড়ে
উথাল-পাথাল তুফান ভাঙে
উষ্ণ শোণিত ধারে
প্রতীক্ষা আর পথের বাধা
শুধু এইটুকু সঞ্চয়।

নীলক্ষেত
১৫.১২.৭৭

২৩

আমি যখন চলে যাব
আমার খবর
হাওয়ার কাছে নিয়ো।
বিশদ যদি জানতে চাহ
শিশিরে শুধায়ো।
লিলুয়া বাতাসে শুনে
অনুপম ধ্বনি
বুঝে নিয়ো প্রেমিক-প্রাণের
গলিত নবনী
কিরণ লাগা শিশিরকণায়
আমায় রাঙা
হৃদয় দেখে নিয়ো।
যদি বোঝ পাখির ভাষা
সূর্য ওঠার কালে
আমার লেখন পাঠ করিও
রক্ত উষার ভালে
যদি কিছু কওয়ার থাকে
ও-বন্ধু ও-ভাই
কুঞ্জবনে কূজনরত
বুলবুলেরে কইয়ো।

নীলক্ষেত
১৭.১২.৭৭

২৪

কোথাও কেউ নেই
কালো ননীর মত আঁধার
তারার বাতি ঝিকমিকিয়ে জ্বলে
একলা রাতে বিজনপথে
হঠাৎ কেন হৃদয় কথা বলে।

গহনরাতে হাত বুলিয়ে
বাতাস ঘুম পাড়ায়
শান্তি সাগর নীড় বেঁধেছে
চরাচরের গায়
ফিসফিসানি আওয়াজ কেন
হাওয়ার চলাচলে।
কারা যেন সামনে দাঁড়ায়
সোহাগ বুলায় কারা
ছায়ার মত চমকে মিলায়
ছায়ার শরীরেরা
কাদের চরণধ্বনি বাজে
বুকের তলে তলে।

নীলক্ষেত
১৭.১২.৭৭

২৫

দাঁড়ের ময়না কীসব কথা বলে
বুঝতে আমি পারি না রে
করি অনুভব
পোষা পাখির কণ্ঠে কেন
বনের কলরব।
কি কারণে ময়না এমন
সুবর্ণ খাঁচায়
কিচির-মিচির কাঁদন করে
শান্তি নাহি পায়
ময়নার উদাস দুচোখ দেখে

হৃদয়ে তাণ্ডব।
শেখা বুলি ভুলে কেন
ময়না আমার জংলা কথা কয়।
ছাড়া পেলে ভুলবে নাকি
খাঁচার পরিচয়
ময়না পাখির কণ্ঠে শুনে
বোঝার অতীত রব
কেন মনে হয় রে আমার
সমস্ত সম্ভব।

নীলক্ষেত
১৮.১২.৭৭

২৬

আমার কথা কইবে পাখি
করুণ করুণ ভাষে
আমার দুঃখ রইবে লেখা
শিশির ভেজা ঘাসে।
তারার সাথে রাত জেগেছি
ফুলের সাথে হৃদয় বিনিময়
বলবে সবাই কেমন ছিল
মধুর পরিচয়
আমার ঠোঁটের হাসি রইবে জেগে
মরাল ডানার পাশে।
আমার গান গাইবে দুখে
পথ হারানো হাওয়া
আমার নাম বলবে মুখে
মেঘের আসা যাওয়া
ইন্দ্রধনু লিখবে লিখন
কেমন ভালবাসে
দীঘল নদী করবে রোদন
আকুল উচ্ছ্বাসে।

নীলক্ষেত
১৮. ১২. ৭৭

২৭

বন্ধু আমার সখা আমার
জানি না জানি না
তোমার মত সেওতো আমার
অনেক দিনের চেনা।
অনেকদিনের অনেক কিছু
তুচ্ছ হাবিজাবি
তারো ছিল অন্যরকম
হৃদয় ভরা দাবি
এক আঘাতে শেষ করেছি
কাঁদে হৃদয় বীণা
জানি না জানি না
ঠিক করেছি কিনা
বন্ধু আমার পথের সাথী
বলার কথা নয়
নিজে কেটে বাদ দিয়েছি
আধখানা হৃদয়
চলতে পথে যদি হঠাৎ
রক্ত-রোদন ওঠে
অসম্ভবের পানে চেয়ে
হৃদয় মাথা কুটে
জানি না জানি না
তুমি আমায় ক্ষমা করবে কিনা।

নীলক্ষেত
১২. ১২. ৭৭

২৮

নয়নে নয়ন রেখে আপন ভুলে হেসেছি
বঁধুরে মধুর করে এমন ভালবেসেছি।
বঁধু আমার ননীর পারা
ভ্রমর কৃষ্ণ নয়ন তারা—
আলো ছায়ার খেলা খেলে মরণ ফাঁদে ফেঁসেছি।

আমার বঁধুর তনু গন্ধ ধোয়া
শীতল চন্দন ছোঁয়া
শরীরের পদ্মঘ্রাণে শান্তি সুখ নেশেছি।
বঁধু আমার স্বপ্ন হেন
সকল দিয়ে দিইনি কেন
ধিক্কারেতে আপনারে বারে বারে দ্বেষেছি।

নীলক্ষেত
১৯. ১২. ৭৭

২৯

জগৎ ভরিয়া দিব
বাঁশরির সুরে
বিলাইব রসের ধারা
সোনার কলসপুরে।
ছাঁকিয়া অমৃত নিব
মন্ত্রপূত হাতে
সখা বলি দান করিব
সর্ব লোকের পাতে
পান করিবে তৃষাতুর
নিকটে কি দূরে।
তরুশিশু মুকুলিবে
বংশীরব শুনি
প্রাণকোষে শিহরিবে
প্রাণের আগুনি
দীঘল যামিনী যামে
মৃদু পায়ে ঘুরে
মধুর সান্ত্বনা হবে
শোক মগ্ন পুরে।
বংশীরবে উজলিবে
অন্তরের হেম
দুঃখ রিক্ত মর্মতলে
জন্ম নেবে প্রেম
উদার করুণা ভরা

প্রাণ সিক্ত সুরে
ভেসে যাবে এই প্রাণ,
দূরে বহু দূরে।

নীলক্ষেত
২১. ১২. ৭৭

৩০

শিউলি ফুলের নামে আমার নাম
গাঁয়ের মেয়ে লাজুক বড়
বাবার বাড়ি পলাশতলির গ্রাম।
ভিন গেরামে গিয়ে নতুন
যেই দেখিলাম দীঘল তরুণ
বালক বটের তলে
ছিপছিপানো গড়নখানি
মুখের ভাবে প্রাণের ছায়া
দুই চোখে তার কালো মানিক জ্বলে
বকুল গাছের ছায়ার মত
দখিন হাওয়ার হাতছানিতে কাছে ডাকিলাম।
বোধ করিলাম প্রাণের তলে
নবীন জাগরণ
অঙ্গে অঙ্গে খেলে আমার
সুখের সমীরণ
হঠাৎ করে মনে এল
কেমনে আবার দেখা হল
আবছা আবছা মনে পড়ে
কোথায় যেন দেখছি ওরে
ঠিক দেখেছি তবে এমন ভিড়ের মাঝে নয়
প্রাণের তলে সুপ্ত ছিল গহন পরিচয়
বলতে বাধে বনহরিণী কাঁদে পড়িলাম
পঞ্চ পরাণ উজার করে প্রেমে পড়িলাম।

নীলক্ষেত
২৫. ১২. ৭৭

৩১

তোমার মত কেউ কখনো
হাসতে শেখেনি
হঠাৎ মেঘের আড়াল টুটে
দিব্যি ফুলের মতন ফুটে
এমন হাসি প্রাচীন কবি
কাব্যে লেখেনি।
জোছ্না জ্বলা মুখের ওপর
উপচে ওঠে হাসির লহর
ঝিলমিলানো শৈলের পোনা
প্রাণ-পাতালের তরল সোনা
ঠোঁটের ওপর রাঙা পরাণ
লাজ-শরমের বাঁধন টেকেনি।
ঘুমের ঘোরে শয্যাতলে
রাঙা হাসির মানিক জ্বলে
লাস্যময়ী রামধনুটি
প্রজাপতির বরণ ধরে
কেউ কখনো থরেথরে
নাচতে দেখেনি।

নীলক্ষেত
২৯. ১২. ৭৭

৩২

আমি ফিরব না ফিরব না
দুয়ার দেয়া ঘরে
বুকে আমার জোছনা জ্বলে
প্রাণ যে কেমন করে।
রাত্রি আমায় গুণ করেছে
তারার আলো খুন করেছে
ছাতিম ফুলের গন্ধধারা
লুটায় পথের পরে।
আকাশে কার মুখ দেখেছি

হৃদয়ে কার রঙ মেখেছি
রিক্ততারে দীর্ণ করে
ডাকব আমি ডাকব ওরে
ডাকব আমি ডেকে যাব
রোমাঞ্চিত কলেবরে।
ডাকব আমি ঘুরে ঘুরে
রাত্রি ভরা গহন সুরে
সাড়া যদি দেয় তো ভাল
না হয় হৃদয় ভাসিয়ে দেব
জোছনা ধারার সরোবরে।

নীলক্ষেত
৩০. ১২. ৭৭

৩৩

যে যার আপন ঘরে চলে
আমি বসে রই
ভাগ্য আমার আমি তো আর
সবার মত নই।
সব জানারা কথায় জেতে
সব চেনারা ছুটে
দিনে দিনে এই হৃদয়ের
সোনার বাঁধন টুটে
ঝাঁকড়া ডালে বাঁধব বাসা
তেমন তরু কই।
আকাশ যদি স্মরণ করে
আমারে লয় বরণ করে
দেয় যদি গো মোহনবেণু
চরিয়ে যাব আলোকধেনু
নীল গগনের রাখাল হলে
আমি আপন প্রাণের তলে
তুষ্ট ভীষণ হই।

নীলক্ষেত
০৩. ০১. ৭৮

৩৪

তুমি যখন ডাক দিয়েছ
প্রাণ ভরা এই পূর্ণিমাতে
কে আমারে আটকে রাখে
রুদ্ধদ্বারের চার সীমাতে।
ভেতর থেকে বেরিয়ে যাব
হৃদয় নদীর ধারার বেগে
তারার আলোর পথ মাড়াব
সদ্য জাগা এই আবেগে
আঁধার তলে ফুটব কুঁড়ি
রক্ত-গোলাপ সকালবেলার
তোমার আমার গহন খেলায়
রস পড়েছে প্রাণের পেয়ালার
দুলব সুখে ডালে ডালে
গন্ধ সুধার পরিমাতে।
তুমি যখন ডাক দিয়েছ
হাসির ভেতর হৃদয় ভরে
প্রাণের তলে প্রাণ ফুটেছে
কাঁপা কাঁপা বাঁশির স্বরে
কোন পুলিনে শেজ পেতেছ
কোন যমুনার উজান পথে
তোমার আমার মিলন হবে
কোন সুদূরের বিজন রথে
তারার আলোয় কৃষ্ণ চিকুর
দেখে দেখে শেষ যামাতে
পাব আমি পাব তোমায়
বকুল যখন গন্ধে মাতে।

নীলক্ষেত
০৪. ০১. ৭৮

৩৫

জানি না, জানি না
তোমায় আমি কোথায় ছুঁয়েছি।
চোখে নাকি মুখে নাকি
কোথায় পোড়া হৃদয় খুয়েছি
ঘুমের ঘোরে শয্যা তলে
চন্দ্রমুখের জোছনা জ্বলে
শূন্য হৃদয় আঁকড়ে যখন
একলা শুয়েছি।
কেউ জানে না দিন-রজনী
প্রাণ-মোহিনী কণ্ঠধ্বনি
শুনব বলে মন্ত্র বলে
শান্তি খুইয়েছি।

নীলক্ষেত
১০. ০১. ৭৮

৩৬

আপন হাতে সোহাগ ভরে
কিনব আমি বিষ
ওলো সখি ওলো সখি
সাধের মরণ
মরতে আমায় দিস।
ক্ষয় হবে না সময় সম্পদ
বিদায় হবে পথের আপদ
ওলো সখি, ওলো সখি
তোরা আমার
প্রাণের ব্যথা নিস।
বাজবে না কার গভীর বুকে
আমি শুধু গেলাম দুখে
ওলো সখি, ওলো সখি
এই ঘটনা হাওয়ার কানে
বলিস অহর্নিশ।

আবছা যদি রোদন রেখা
কার চোখে যায় গো দেখা
ওলো সখি, ওলো সখি
ছলনারে সত্য ভেবে
ভুলটি না করিস।

নীলক্ষেত
১১. ০১. ৭৮

৩৭

সুরের রসে বাতাস ভাসে
আকাশ ধরে টানে
বাঁশি কি বাঁশির খবর জানে।
আপন বুকের দহন জ্বালা
সইতে পারে না যে
সকাল-সাঁঝে রোদন ভরা
করুণ বাঁশি বাজে
রাঙা পরাণ উজার করে
জগতটারে হানে।
বাঁশরিয়ার প্রাণের শোণিত
রক্ত-লহর তোলে
রাঙিয়ে যায় চরাচরে
লাল গোলাপের ফুলে
কি মিনতি প্রকাশ করে
আকুল সমীরণে।
সুখী মানুষ শয্যাতলে
মগ্ন প্রমোদ রসে
কচিত বাঁশির রোদন-ধ্বনি
প্রাণের তলে তলে পশে
তারা কি বুঝতে পারে
আমার এই বাঁশির স্বরের মানে।

নীলক্ষেত
১৯. ০১. ৭৮

৩৮

এখনো বালিকা সে
গোরা চিকন তনুখানি
রেখায় রেখায় উঠেছে ভরে
অল্প অল্প যৌবন রসে।
চেতনায় কি কলরব
পাখিরা কি গাহে সব
চতুর্দশীর শরীর থেকে
কিশোর বয়স পড়েছে খসে।
জেগে সে স্বপ্ন দেখে
নিখিল ভুবন নতুন ঠেকে
শোণিতে ঝর্না নামে
আনমনা হয় ভাবের বশে।
আপন মনে আপনি হাসে
কখন দুঃখ নীরে ভাসে
হৃদয়ে ঘোর কলরোল
বেজে ওঠে বিষাদ রসে।

নীলকণ্ঠ
২১. ০১. ৭৮

৩৯

তোমার এ প্রেম
সকল দিকে গেছে
যদি ডাকি ডানা মেলে
আকাশ আসে নেচে।
আমার আপন জীবন ভরা
তুচ্ছ আবিলতা
আমার যত কলুষ গ্লানি
আমার বিফলতা
তোমার প্রেমের স্নিগ্ধধারা
সকল দেবে কেচে।

পারিজাতের গন্ধভরা
মনহারানো বায়ে
নীলাঞ্জনের রেখার নিচে
শ্যামল তরুর ছায়ে
তোমার নামে হাত বাড়ালে
বনদেবীরা দলে দলে
হৃদয় দেবে যেচে।

নীলক্ষেত
১২. ০১. ৭৮

৪০

আমি সখা তোমার হাতের
বাঁশির মত বাজি
প্রিয় ওগো পরাণ আমার
সকল কথায় রাজি।
আমি সখা তোমার রঙে
রাঙা হয়ে ফুটি
তোমার গতির পরশ পেলে
তরীর বেগে ছুটি
বন্ধু ওগো মানস রতন
হৃদয়-তরীর মাঝি।
ধরব কোথায় রাখব কোথায়
অঙ্গ থরথর
এ অসহন হৃদয় দহন
সখা আমায় ধর
ধন্য জীবন পূর্ণ আমি
যাই মরে যাই আজি।

নীলক্ষেত
১১. ০১. ৭৮

৪১

সখি! মৃদু মন্দ পবন বেগে
শিমুল তুলোর মত
হৃদয় ফেটে দলে দলে
ফুটছে এসব বাণী।
সখি! তোমার লীলা লাস্যভরা
গন্ধসুধামাখা
প্রাণের তলার মুক্তা মানিক
হৃদয় দিয়ে ঢাকা
রাম ধনুকের ছটার মত
রাঙায় আকাশখানি।
সখি! তুমি ছিলে আমি ছিলাম
এক সুতোতে বাঁধা
জোড়ের চখা এক নীড়েতে
একে আরের আধা
সেই ঘটনার মর্মটুকুন
করছে কানাকানি।

নীলক্ষেত
১৪. ০১. ৭৮

৪২

তুমি আমার অভিমানের
রঙ দেখনি তাই
কথায় কথায় আঘাত হান
আমি কেমন
অবাক হয়ে যাই।
চোখ থাকে না চোখে তোমার
মন রহে না মনে
বাজে না প্রাণ বাঁশির মত
প্রতি আলাপনে
প্রাণের থেকে সরেই গেছ
প্রাণের সখা
তুমি এখন প্রাণে আমার নাই।

কেমনে বলি তোমার এখন
কোথায় আসা যাওয়া
গতির ধারা কোনদিকে ধায়
কিসব চাওয়া পাওয়া
লাভ কি জেনে সেসব আমার
প্রাণের সখা
এবার আমি বদলে যেতে চাই।

নীলক্ষেত্র
১৪. ০১. ৭৮

৪৩

ঘর হল না দোর হল না
পোড়া কপাল গুণে
দিন গেল রে সুন্দরীদের
খবর শুনে শুনে।
চাঁদবদনী ডাগর আঁখি
কাকে ছেড়ে কাকে ডাকি
কার-বা প্রেমে পাগল পারা
কে দিয়েছে হঠাৎ সাড়া
কার-বা হাসির বজ্রশিখা
বড়ই অলক্ষুণে।
ধরা দিতে কষ্ট হল
ধরতে গিয়ে ফস্কে গেল
তন পোড়ালাম মন পোড়ালাম
দিনে দিনে দিন হারালাম
আকুল পরাণ বিদ্ধ হল
কাজল আঁখির তূণে।
এবার শেষ হয়েছে বোঝাবুঝি
সুন্দরী নয় সুন্দর খুঁজি
ফাঁদ বসাব প্রাণের পরে
হাওয়া ছেঁকে ধরব ওরে
কাল কাটে রে প্রিয়তমের
পদ্ম আসন বুনে।

নীলক্ষেত
১৫. ০১. ৭৮

৪৪

আমার মনে অহরহ
পাখা নাড়ে কে
ঝিলিকমিলিক বিচিত্র রূপ
সুরের চমকে।
বাণীরা সব ঝাঁক বেঁধে ওই
পাখির মত উড়ে
রাঙা পরীর নাচন লাগে
প্রাণের চাতাল জুড়ে
ওই যে হাসে ওই যে ভাসে
চোখের পলকে।
আমার মনে এমন করে
রঙ ধরায় সে কে
অশোক ফুলের বরণ ছানি
কে আঁকেরে নকশাখানি
স্বর্গ যেন উঁকি মারে
রঙের ঝলকে।
আমার মনে এমন করে
রস বিলায় সে কে
ক্লান্ত দিনের দুঃখ দহন
মূর্তি ধরে শান্ত সঘন
বঞ্চনাও হয় রে মধুর
সুরের গমকে।

নীলক্ষেত
১৪. ০১. ৭৮

৪৫

স্মৃতির রেখায় ঝিলিক হানে
কথায় কথায় কি অপরূপ
নয়ন বাঁকানো।
মনে পড়ে মনে পড়ে
অপরূপার কণ্ঠস্বরে
ছিল চিকন চাঁদ চোঁয়ানো

জোছনা মাখানো।
ছাপ রেখেছে প্রাণে আমার
হৃদয় ভরা অতল দুটি
গহন চোখের
গভীর তাকানো।

নীলক্ষেত
১৮. ০১. ৭৯

৪৬

ওরে ও পাগলা বাউল
দিক হতে দিক দিগন্তরে
এমন করে খুঁজিস কি রে
কালো চোখে দেখবি কালো
অন্তরে তোর চোখ ফুটেনি।
হাটবাজারে মাঠে ঘাটে
গোরস্থানের ধ্বংস নাটে
কান্না হাসির ঢেউ তরঙ্গে
যদি না তুই দেখিস রঙ্গ
আপন মনে জেনে রাখিস
আজো তুই কৃষ্ণপক্ষে
তামস রাতের ঘুম টুটেনি।
সবাই যদি মন্দ কহে
তাতেই যদি হৃদয় দহে
ক্ষ্যাপা তুই সমঝে চলিস
আজো তোর মন্দ কপাল
পরণে পদ্মের বাস ছুটেনি।
যদি সবাই করে ছি ছি
তুই থাকিস তোর কাছাকাছি
হাত বাড়িয়ে শিশুর মত
থাকতে আরো হবে কত
পাথেয় তোর ঠিক জুটেনি।

নীলক্ষেত
১৮. ০১. ৭৯

৪৭

তোমার বিরাট তোমার অসীমে
আমায় তুমি লও গো ডাকি
নিখিল নীলিমে।
শূন্যতা মোর হরণ কর
শূন্যলোকে তুলে
ব্যথায় দিও মধুর পরশ
সান্ত্বনা তুলতুলে
দুঃখেরে মোর বুঝিয়ে দিয়ো
আপন মহিমে।
তারাভরা আকাশ দেখে
ঝর্ণাধারার বেগে
অন্তরে যে আবেগ আসে
যেন অন্তরে রয় জেগে
শ্যাম সরসে গন্ধরসে
চয়ন করে বয়ন করে
পুষ্প কোমল বরণ মেল
হৃদয় নয়ন পরে
ধূপের শিখায় জ্বালিয়ে দিয়ো
গহন গরিমে।

নীলক্ষেত
২০. ০১. ৭৯

৪৮

মহাকাশের রক্ত পুষ্প
ফোটে রে তোর মন
তোর হৃদয়ে তাই জেগেছে
এমন আলোড়ন।
দিন নাই তোর রাত নাই তোর
সন্ধ্যা দুপুর নাই যে রে তোর
নিজের ভেতর তন্মতে থাকিস
প্রস্ফুটনের ক্ষণ।

(নিজের ভেতরে শুনতে থাকিস)
অলির গুঞ্জরণ।
যাক চলে যাক বসন-ভূষণ
অভিমান আর লাজ
আপন মনে তুই করে যা
ফুটে ওঠার কাজ।
নিজেরে তুই যুক্ত রাখিস
কাটিস নে বন্ধন।
নিজেরে তুই মুক্ত রাখিস
দিস নে আবরণ
যে ফোটে রে তোর হৃদয়ে
আকাশ পারিজাত
পাপড়ি দলে আদর করে
শূন্যলোকের হাত
ঠিক চিনে নে প্রাণের পটে
সুরের সঞ্চরণ
সময় হলে মূর্ত হবেন
অমৃত নন্দন।

নীলক্ষেত
২৩. ০১. ৭৯

৪৯

নিন্দুকেরা বলে শত্রুদলে কয়
আমার নাকি মরণ হবে
আসিলে সময়।
আন কথাতে কান লাগাই না
মনের সুখে আছি
রক্তে আমার গান করে ভাই
জীবন মৌমাছি।
মন্ত্রমুগ্ধ নয়ন মেলে
নিত্য হেরি ভূমণ্ডলে
জীবন করে আজবলীলা
দোষ তো আমার নয়।

আমি হলাম প্রাণের অনল
মূর্ত উপাসনা
আমায় নিয়ে পার পাবে না
যমের রসনা
নাই রে জ্বরা নাই রে খরা
নাই রে অপব্যয়
আমায় নিয়ে পালিয়ে যাবে
যমের সাধ্য নয়।

নীলক্ষেত
২৪. ০১. ৭৯

৫০

সাঁঝে ফোটে জবার কলি
প্রভাতে রঙিন
আজ নাই নাই নাই রে সে
আনন্দের দিন।
আজ নাই রে সে জল ঝরণার
কুলু কুলু ধ্বনি
বাজে না তার কাঁকের কলস
চুড়ির রিনিঝিনি
কথায় কথায় বাজেনা রে
ভালবাসার বীণ
চোখের তারায় নাচেনা রে
আনন্দ নবীন।
চোখের জলে অট্টহাসির
দিন গিয়েছে ভেসে
এখন বটে পাগল পারা
ফুল গুঁজে না কেশে
দিন গেল রে দিন গুণেরে
তনুর রেখা ক্ষীণ
এমনি করে শোধ করে সে
ভালবাসার ঋণ।

নীলক্ষেত
২৪. ০১. ৭৯

৫১

চোখের তারা ওই তরুতে
যখন হেলেছে
নবীন আমের মঞ্জরিটি
দেখে ফেলেছে।
কি আনন্দ কি আনন্দ
বসন্তেরই নতুন গন্ধ
মাঘ শুক্লার প্রথম তিথি
চুপিসারে রাজ অতিথি
সময় বুঝে
শীত-রজনীর দুয়ার ঠেলেছে।
কি আনন্দ দহনভরা
সুখের শিহরণ
প্রাণে আমার দোল দিয়েছে
প্রাণের সমীরণ
যখন কোকিল কণ্ঠধারার
মধু ঢেলেছে।
এ যে বিরাট দুর্ঘটনা
হয়নি তার মর্ম জানা
রক্তে আমার মর্মে আমার
অবাক অবাক সোনার বরণ
তড়িৎ খেলেছে।

নীলক্ষেত
২৪. ০১. ৭৯

৫২

আকাশ বাতাস নদীর জলে
যেথায় পাতি কান
ঢেউ খেলে রে ঢেউ খেলে রে
এই পৃথিবীর গান।
গহন কানন উদাস পাহাড়
সকলে গান গায়

উন্মাদিনী ঝর্নাধারা
গানতরঙ্গে ধায়
দূরের তারার সভায় দোলে
গানের চেরাগ দান।
ফুলপরীরা যখন নাচে
লাল ঘাগরা তুলি
গুন করে যায় খুন করে যায়
রঙের গানাঞ্জলি
অরুণ রাগের কিরণ গানে
আঁধার কম্পমান।
বিহঙ্গদের কাকলিতে
মধুর মধুর দোলা
তড়িৎ শিখায় নাচন করে
গানখানি আধখোলা
লতার মত জড়ায় প্রাণে
গোপন বীণার তান
কে গাহে রে কে বাজায় রে
অন্ত না পায় প্রাণ।

নীলক্ষেত
২৯. ০১. ৭৯

৫৩

দুষ্টু বল খারাপ বল
বল আস্ত বোকা
তবু আমার চোখের মানিক
খোকা আহা খোকা।
ওই যে হাসে ওই যে কাঁদে
বাতাসে দেয় টোকা
খোকা আহা খোকা।
হাত বাড়িয়ে চাঁদ পেতে চায়
খোকা একরোখা
খোকা আহা খোকা।
হিসি করে ফিসি করে

মায়ের আঁচল মুঠি করে
কাঁথা ভেজায় বালিশ ভেজায়
নাই রে লেখাজোখা
তবু আমার চোখের মানিক
খোকা আহা খোকা।

নীলক্ষেত
১৩. ০৩. ৭৯

৫৪

পদ্ম দীঘির ওপর দিয়ে
মশলা বনের ভেতর দিয়ে
কালো নদীর কূল পেরিয়ে
সোনার স্বপন আসে
সর্ষে ক্ষেতের রঙ মাখিয়ে
ঘুম ঘুম ঘুম চোখ পাকিয়ে
রাঙা মেঘের ধার মাড়িয়ে
ঝিরঝিরিয়ে ঝিরঝিরিয়ে
খোকার চোখে বসে
চুপটি করে ঘুমোয় খোকা
ফুল ফুটেছে থোকা থোকা
ঘুমের ভেতর খোকন সোনা
সোনার হাসন হাসে।

নীলক্ষেত
১৪. ০৩. ৭৯

৫৫

কত আর দেখবি ওরে মন
পাগলা মন রে আমার
দিনে রাতে রঙ বদলায়
মরি মরি কি রূপের বাহার।
দিনে যারে আলো দেখি
রাত্রে সে তো কালো
দিনের বেলার মন্দ মানুষ
রাত্রে দেখায় ভাল
ভাল-মন্দের দ্বন্দ্বে রত
চিত্ত অনুক্ষণ।
পাগলা মন রে
কি পেলে তোর মেটে ক্ষুধা
কই মেলে গো সোহাগসুধা
সাদা কালো ধরে কোথায়
অপূর্ব বরণ
ভাল-মন্দ এক বিছানে
ভাল-মন্দ এক শিথানে
করে আলিঙ্গন
পাগলা মন রে।

নীলক্ষেত
১৫. ০৩. ৭৯

৫৬

যৌবন চাঁদে রাহুর ছোঁয়া
লাগে বুঝি হায়
মণিবন্ধের শাঁখা আমার
খুলে খুলে যায়।
রাত্রি দিবস কাটে বিরস
বুকের তলে আগুন
কেউ দেখে না ফুরায় আমার
ফুলে ভরা ফাগুন
মর্মরিয়া দখিন হাওয়া

কাঁদে জানালায়।
শাখার কি দোষ
মণিবন্ধ শোকে চেতনহারা
পারত যদি বইয়ে দিত
চোখের জলের ধারা
হৃদয় তাপে জমত মিনার
মেঘের কিনারায়।

নীলক্ষেত
০৫. ১২. ৭৯

৫৭

মাকাল ফলে দলে দলে
আরেকটা তো মাইকেল ফলে না
কেশর নেড়ে ফণা তুলে
বাংলাভাষা পরাণ খুলে
কেন আবার কথা বলে না।
জল ছলছল পদ্মানদীর
সকল বাঁকে চরা
চলার শরীর ভর করেছে
জ্বরা এবং খরা
ছলাৎ ছলাৎ ঢেউয়ের তোড়ে
পদ্মানদীর কাঁকাল দোলে না।
মরা গাঙে ভাব তরঙ্গে নতুন রঙ্গে
চিন্তারসের নৌকা চলে না।
জোনাক জ্বলে সারে সারে
কবরখানায় প্রেতের কারখানা
দিনের আলোয় পথ ভোলে সব
রাতে রাতকানা
তিমির শিলার আঁচল চিরে
অগ্নিবরণ মুকুট শিরে
মাথার ওপর আরেকটা তো
রবি জ্বলে না

বাংলাভাষার দরদালানে
বেলোয়ারি ঝাড় লণ্ঠনের
আলো জ্বলে না।

নীলক্ষেত
০১. ০৩. ৭১

৫৮

মায়ার খাঁচার দ্বার খুলে দে
নগ্ন চোখে আকাশ দেখি
নইলে মা তোর সরল স্নেহ
বুঝব বেবাক কালতু মেকি।
হাওয়ায় ভেসে সহায়হারা
গন্ধলেপা তোর ওই মাটি
আমার প্রাণে যদি দোল না দিল
কেমন বুঝি মা তুই খাঁটি
আমায় উড়িয়ে দে মা উড়িয়ে দে রে
ললাটে চন্দন লেখি।
মাগো মা মাখ পুষেছিস সোঁদরবনে
হিংসারসে আত্মহারা
বনবাদাড়ে চমকে বেড়ায়
বন্য আদিম শক্তিধারা
ঘোলা জলের কুমির করে
আমায় বেঁধে রাখবে সেকি।
জলে থলে ভয় দেখিয়ে
রক্তচোখের দম্ভভরে
পেশির তেজে সকাল বিকেল
ভ্যাংচাব না মা নীলাম্বরে
দেখিস মা তুই মোহের জালে
পাখা দুখান না যায় ঠেকি।
উড়ে উড়ে নীল গগনে
মুক্তিভরা আলোর বাণী
গানের পাখি আনব আমি
নিখিল নীলের জগৎ ছানি

বাঁধাবাঁধি সয় না আমার
সয় না কোন অতিরেকি।

নীলক্ষেত
১৫. ০১. ৭৯

৫৯

সুন্দরী তোর রূপের চমক নয়ন মনে উদ্ভাসি
থরেথরে সোনার কমল আলোকধারায় যায় ভাসি।
নিশিভরা মাথার কেশে রত্নমণির অলংকার
তারার ফুলে ঝলসে ওঠে অগ্নিবরণ অহংকার
হাজার নারীর কণ্ঠহারে যখন জাগে তরঙ্গ
মরি মরি সুন্দরী তোর জলকেলিতে কি রঙ্গ
মেখলা পরা আঁচলখানি দেখে দেখে দিন কাটে
রূপের ঝলক সইতে নারি চোখ ফাটে কি বুক ফাটে
শরৎকালে রাত পোহালে আলোকধারার বানভাসি
প্রাণে বুলায় রঙিন তুলি নতুন ভোরের ওই হাসি।
হেমন্তে তোর মাঠে দেখে কনকধানের মঞ্জরি
মন মৌচাকে মৌমাছিরা সুখে ওঠে গুঞ্জরি
নিঠুর শীতে কৃশতনু জায়নামাজে রাত জাগিস
নদীর চরে চষা ক্ষেতে ফুল ফসলের বর মাগিস
মাঘ-নিশীথে কোকিল ঢেলে সুরের সুধার লহরি
বুড়ো বটের জটা নেড়ে জীবন জাগায় শিহরি
নাকের বেশর পায়ের ঘুঙুর রঙ-বেরঙের ফুলরাশি
বসন্তে তোর কান্তি হেরে প্রাণ পরেছে প্রেম ফাঁসি।
বোশেখ মাসে পাগল ভীষণ গাজন তলার মুক্তকেশি
সংহারিণী মূর্তিতে তোর রূপ দেখেছি তার বেশি
আষাঢ় মাসে দেয়ার ডাকে রূপবতী কী মুরতি।
জলের তোড়ে নদীর ধারা তরঙ্গিত বেগবতী।
পাহাড় যেন কুচের মিনার যৌবনেরই রসভারে
উপচে পড়ে দুধের ধারা আঁকা বাঁকা জলধারে
জলের ফণায় আঘাত হানিস করালিনী কূলনাশী
তোরে আদর করে বক্ষে জড়াই চরাচরের আগ্রাসী।

নীলক্ষেত
১৩. ১২. ৭৮

৬০

সোনার ধানের ওড়না পরা সাগর পাড়ের চর
রাঙা আলোর পরশ বুলায় মুক্ত নীলাম্বর।
বাংলা নামের দেশ রে আহা নরম মাটির তনু
শ্যামবরণী সুন্দরীরা দোলায় ফুলের ধনু
যে দেখেছে প্রাণ ভরেছে শ্যামল বটের ছায়া
দেশ-বিদেশের তীর্থপথিক ভুলতে নারে মায়া
শবর কুলের নিবাসভূমি কাঞ্চনমালার ঘর
এই আলোতে চোখ মেলেছে অতীশ দীপংকর
ধর্মধারা বীর্যরেখা কীর্তি কীরিট শিরে
সোনার মুকুট ঝিলিক মারে কাল যমুনার নীরে
আকাশ প্রমাণ অবারিত মুক্ত উদার প্রাণ
পদ্মানদীর কণ্ঠে উজায় মানবপ্রেমের গান।
মাটির টানে মেঘের বালা হয় গো স্বয়ম্বর
অন্তর মন পূর্ণ করে বৃষ্টিধারার স্বর।
রক্তধারায় বয়ে বেড়াই যুগান্তরের বাঁধন
তুমি আমার সকল সাধ্য তুমি আমার সাধন
তোমায় ছেড়ে কোথায় যাব কোন সাগরের তীরে
আদরে কে কোল দেবে এই লক্ষ্মীছাড়াটি রে
কে বুলাবে সোহাগ চুমো সিক্ত কপোলপর
কোথায় যাব স্পর্শে কাঁপে এমন অন্তর।

নীলক্ষেত
১৩. ১২. ৭৮

৬১

এই দেশেরই মাটির সুরে
গেয়ে গেলাম গান
এই মাটিতে নিদ্রামগন
সাত পুরুষের প্রাণ।
চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা
ঋতুর চলা নদীর ধারা
তরুর ছায়া ফুলের লীলা

ঢেউ খেলানো সাগরনীলা
থরে থরে বিরাজ করে
অন্তবিহীন দান।
এই দেশেরই মাটির বুকে
তরুর শিশু শিউরে সুখে
হরিৎবরণ বসন পরে
রোপা আমন নাচন করে
অবাক চোখে তাকিয়ে থাকে
পূর্ণমাসীর চান।
এই মাটিতে বীজ বুনেছি
ফসল কাটার দিন গুনেছি
হিম জড়ানো অঘ্রাণ মাসে
মাঠের সোনা রাশে রাশে
পাট করেছি আঙিনাতে
সোনার বরণ ধান।
ঘাটের মাঝি মাঠের চাষি
রাখাল ঘাটে বাজায় বাঁশি
আবহমান কালের পটে
দীঘল বাঁকা নদীর তটে
শ্রমে যারা পরায় মাঠে
ফুলের শাড়ির থান
সেই জীবনের ছন্দে বাঁধা
বাউল কবির কান।
একতারাটির ঝঙ্কারেতে
স্বপ্ন নামে নয়নপাতে
বিস্ময়ে যায় তরঙ্গিয়া
বাউল কবির ব্যাকুল হিয়া
সুরে সুরে যায় রে ভেসে
গেরোস্থালির ঘ্রাণ।

নীলক্ষেত
২৭. ১২. ৭৮

অগ্রন্থিত ও অপ্রকাশিত কবিতা

অপ্রকাশিত তিনটি কবিতা

(১)

সুন্দর প্রতারক বাংলাভাষার শব্দাবলি দিয়ে
আর আমি তোমাকে ধরতে চেষ্টা করিনে
তুমি আমার অস্তিত্বের গহনলোকে
ক্রমাগত এমনভাবে বেড়ে উঠছ আর
এখন সহজে দখল করে নিয়েছ সবগুলো ভুবন
শব্দের ক্ষমতা নেই তোমাকে ধারণ করে।
তোমাকে নিয়ে কি করব
রাখতে গেলে ভাবতে হয় কোথায় রাখব
ফেলে দিতে ইচ্ছে হলে ভাবতে হয়, কোথায় ফেলব
পালাতে গেলে টের পাই তুমি আমাকে বেঁধে রাখনি
কাছে এলে মনে হয়, চিরদিন পাশাপাশিই তো ছিলাম।
তুমি আমার অস্তিত্বের উপর যৌবন সৌন্দর্য-সম্পদের
এমন কোন বোঝা আরোপ করনি
বইতে গেলে অন্তরে শ্বাস কষ্ট জন্মায়
অথচ প্রান্তরের হাওয়ার মত চারদিক থেকে বেষ্টন করে
আমার ভেতরে সঙ্গীতের অনাহত নাদের মত আছ।
বেজে যাচ্ছ, বেজে যাচ্ছ
আমার অনুভূতির দৃষ্টির সামনে অমৃতলোকের
এতসব দরজা জানালা উন্মোচিত করে দিচ্ছ
কি সাধ্য আমার আমাকে আটকে রাখি
আমিও ক্রমাগত তোমার মাপে বেড়ে উঠছি, বেড়ে উঠছি
আমি শুদ্ধ হচ্ছি, পবিত্র হচ্ছি
হয়ত একদিন তোমাকে ধারণ করার মত শক্ত শব্দের শৃঙ্খল
আমার ভেতরের কারারশালায় তৈরি হবে
ততদিন অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় কি?

২/১২/৮৬

(২)

এই যে সব সদ্যোজাত শব্দ
আমার কলম প্রসব করে যাচ্ছে
তারা প্রকাশ করছে যেমন আমার অস্তিত্ব
তেমনি নিজেরাও ভিন্ন একটি অস্তিত্বের গৌরব নিয়ে
সটান দাঁড়িয়ে থাকতে চায়।
প্রকাশ করে অস্তিত্বকে প্রসারিত করি
একথা সত্য, কিন্তু আবার নতুন করে বাঁধাও পড়ি।
তাই আমি যখন উচ্চারণ করি তোমাকে ভালবাসি
বন্দুকের ঝাঁকুনির মত প্রথম ধাক্কাটা এসে আমার বুকে লাগে
কেননা ঐ উচ্চারণে আমার ভেতরের সারবান পদার্থ সকল
তোমার অভিমুখে ধাবমান হতে চায়
এবং তোমার ভেতর ঘটতে থাকে আমার প্রসারণ
এ এক আশ্চর্য রসায়ন প্রক্রিয়া
আমরা দুজন দু'জনকে ধারণ করতে থাকি
এবং ক্রমাগত বদলে যেতে আরম্ভ করি
বয়সের ঋতুর পালাবদলের সঙ্গে সঙ্গে
ধাক্কা খেতে খেতে ধাক্কা দিতে দিতে আমরা অন্য মানুষ হয়ে উঠব
তখন কি দশা হবে
যখন তোমার মধ্যে আমার অধিকার করার কোন অঞ্চল থাকবে না
এবং তুমি আমাকে গণ্য করবে টুথপেস্টের শূন্য টিউবের মত
নিসর্গের সুন্দরতম বিকাশ রাতি স্তব্ধ হওয়ার পরেও
দুটি কাটা গাছের গুঁড়ির মত পাশাপাশি থাকব
আমরা কি সুখে পড়ে থাকব
আরো একবার নতুন করে জন্মাবার আকাঙ্ক্ষায়?

৩/১২/৮৬

(৩)

আকাশ থেকে করুণার মত নামল
চৈতের প্রথম ধারা
মেঘ কেটে নাচল বিদ্যুৎ
এবং বাতাস দুঃশাসনের থাবার ঘায়ে
কুটিকুটি করে ভাঙছে চিরছে

ইলেকটিরির খুঁটি, দোকানির ঘুন্টিঘর
ভূমি শয়ান করছে অহিংসক তরুকুঞ্জ
ক্ষমতার দাপটে ধ্বংস হচ্ছে যা কিছু হওয়ার।
তথাপি বছরের প্রথম বিষ্টি
নিখিলের তিয়াসের পানি
ঝুপঝুপ টুপটাপ বিষ্টির পতন
চরাচরে ঢেউ দেয়া সান্ত্বনা সঙ্গীত।
এমন চৈত্রের দিনে এমন বাদল দিনে আমার শরীর
পড়ে আছে শয্যাতলে কম্পিত অস্থির
শরীরে জ্বরের অগ্নি চোখে আই ঘুম
চেয়ে চেয়ে দেখি ধরে গেছে বিষ্টির বেগ
চৌদিক নিঝঝুম
পৃথিবী স্বপনমগ্ন সদ্যোজাত নগ্নিকার মত
আকাশ এসেছে সদ্যস্নাতা চাঁদ বড় চুপেচুপে
মাঠের ফাটল আর গর্তে জমা জলে
অগুনতি চূর্নিত চাঁদ নিভে আর জ্বলে।

(রোগশয্যায় বিরচিত— মিরপুর, ১৯৮৪)

বাংলাদেশের জারি

শোনেন শোনেন ভাই-বোনেরা শোনেন দিয়া মন
দেশের সুখ-দুঃখের কথা করিব বর্ণন
প্রীতি আর প্রেমধর্মে অতি কাছাকাছি
দুই দেশে দুই জাতি এশিয়াতে আছি
ফিলিপাইনের শিশু-নারী-বৃদ্ধ-বোন-ভাই
মনে মনে জ্ঞান করি আত্মীয় সবাই।
সমুদ্র মেঘলা ঘেরা বাংলার প্রান্তর
সেইখানেতে বসত করি, সেথা বাড়ি-ঘর
প্রেমপূর্ণ প্রাণ নিয়ে আমরা আসিয়াছি
বাংলার গীতিছন্দে গান গাই নাচি।
এই আমাদের বাংলাদেশ হিমালয়ের নিচে
দক্ষিণেতে বঙ্গোপসাগর ঢেউ খেলিতেছে।
নদ-নদী পাহাড় টিলা সমতল প্রান্তর
এই মাটিতে বসত করি যুগ-যুগান্তর।

আম কাঁঠালে ঘেরা আমার সোনার বাংলাদেশ
যতই বলি রূপের কথা হবে না তার শেষ।
যুগে যুগে কালে কালে এই দেশেরই ছেলে
দেশের লাগি লড়াই করে প্রাণ দিয়েছে ঢেলে।

ও ভাই, একাত্তরের কথা বলি শুনতে ভয়ংকর
লক্ষ-কোটি মানুষ মারে বিদেশি তস্কর।
কামান মারে বোমা মারে শত্রু দেয় হাঁক
সেই সময়ে উঠল বাজি মুক্তিযুদ্ধের ডাক।
এই আমাদের বাংলাভূমি সর্বলোকের মাতা
সন্তানরক্তে সিনান করি পাইছে স্বাধীনতা।
এই সূর্য, এই চাঁদ যতদিন জ্বলিবে (সবাই)
বাঙালিরা বাংলাভাষা সকলে বলিবে।
শহীদের রক্তে লেখা সোনার বাংলা নাম
এই আমাদের মাতৃভূমি সালাম সালাম।

শিশু-নারী-বৃদ্ধা-যুবা-সন্তান ও সন্ততি
বার কোটি মানুষ করে (এই দেশেতে বসতি)(২)
নতুন দেশ, নতুন জাতি বুকে নতুন আশা
শিক্ষা-দীক্ষার লাগি মনে অনন্ত পিপাসা
দুঃখ আছে কষ্ট আছে ক্ষুধা তৃষ্ণা আছে ভাই
সর্ব মুশকিল আসানের (আমরা একটা পন্থা চাই)(২)
এই যে মানুষ সোনার মানুষ সব ক্ষমতা আছে
আক্কেল-বুদ্ধি-হুঁস-জ্ঞান সমস্ত দিয়াছে
স্বভাবে-অভাবে-দুঃখে-দারিদ্র্যেতে মানুষ ভাই
আকণ্ঠ ডুবিয়া আছে (কারণ কারো শিক্ষা নাই)(২)
এই জাতি যদি ভাইরে সোজা জগতে দাঁড়ায়
জাগিয়ে উঠিছে জাতি হিমালয় টলিছে
বিদ্যাশিক্ষার মহাতৃষ্ণা (অন্তরে জ্বলিছে)(২)

এই জগতে যত আছে স্রষ্টার অবদান
বলিষ্ঠ সুন্দর শরীর পাবে তাতে প্রথম স্থান
ধন বল, মান বল, ধর্ম বল ভাই
সুঠাম স্বাস্থ্যের চাইতে দামি বড় কিছু নাই
সুখ চাই শান্তি চাই সকলের অন্তরে
নীরোগ শিশুর জন্ম হোক সকল ঘরে ঘরে

সুখানন্দে পরিপূর্ণ আমার এদেশ ভাই
বিশ্বশান্তির লাগি আমরা স্রষ্টার কৃপা চাই।

এই দেশেতে আমরা সবাই ভাতে মাছে আছি
জেলে চাষি কামার-কুমার মাটির কাছা কাছি
কৃষিজীবী এইদেশ আমার কৃষক দেশের প্রাণ
কৃষকেরা শ্রমে যত্নে বাড়াইছে মান।
কিষাণ মাঠে লাঙ্গল চষে ঘরেতে কিষাণী
রান্না করে কাপড় কাঁচে বয়ে আনে পানি
কিষাণ ও কিষাণীর যত্নে এই দেশটি আছে
ক্ষেতে ক্ষেতে মাঠে মাঠে সোনা ফলিয়াছে।
ক্ষেত আছে, ফসল আছে, কিন্তু পুরানা দিন নাই
নতুনকালে বাঁচার লাগি নতুন চিন্তা চাই
কৃষক আছিল সুখী মান্ধাতার আমলে
অতীতকালের সুখ স্বপ্ন কখন গেছে চলে।
নতুন করে বাঁচতে হলে নানান কিছু চাই
দাদার দিনের সেই পৃথিবী এখন তো আর নাই।
কিষাণরক্ত বড় মিঠা সবাই খাইতে চায়
জোতদার মহাজন আমলা সবাই।
তাঁতি-ছুতার-কামার-কুমার যত দুঃখী আছে।
হৃদযন্ত্রে তাদের প্রাণ বাঁধা পড়িয়াছে।
আমরা হইলাম বিজিএস-এর কর্মী দল
অন্তরে আনন্দপূর্ণ আকাঙ্ক্ষা সকল।

হিন্দু কিংবা মুসলমান বৌদ্ধ কি খ্রিস্টান.
বিশ্বস্রষ্টার সৃষ্টি সবে সকলে সমান।
মানুষ সকলে বটে সবে মোরা ভাই ভাই
একই রক্ত, একই প্রাণ ছোট বড় নাই।(২)
আমরা যখন সংঘ বাঁধি গ্রামে-গঞ্জে চলি
জেগে উঠ ভাই-বোনেরা এই কথাটি বলি
জেগে উঠ ভাই-বোনেরা কোন শংকা নাই
আমাদের এই কর্মযজ্ঞে তোমাদেরও চাই
জেগে উঠ ভাই-বোনেরা ছাড় পরিতাপ
সংঘ বাঁধি একজোটে কর্মে দাও ঝাপ।
মা-বোনেরা ঘরের কোণে অধিকার হীন
জড়বস্তুর মত সবে কাটাইতেছে দিন

জাগি উঠ মা-বোনেরা সব মনে আন হুঁস
একজোটে বল সবে আমরাও মানুষ।

নারী-পুরুষ সমাজেতে সমান অধিকার
নারী না জাগিলে ঘটে সমাজে বিকার
নারী যদি না জাগিবে পুরুষের সনে
পুরুষ কি করে জিতে সংসারের রণে
যেইদিকে কান পাতি শুনি আশার বাণী
আমরা দেখি গ্রামে-গঞ্জে নতুনের হাতছানি
কথা নয়, কথা নয় আসল হল কাম
ফিলিপিনো বন্ধুরা সব সালাম সালাম।*

* বাংলো-জার্মান সম্প্রীতির সাংস্কৃতিক গ্রুপ ফিলিপাইনে যাবার প্রাক্কালে এ জারিগানটি লিখেছিলেন এবং গানটি ফিলিপাইনে গীত হয়েছিল, পরবর্তীতে ইউপিএল থেকে প্রকাশিত মেরি ডানহাম রচিত 'বাংলোদেশের জারিগান' গ্রন্থে গানটি অন্তর্ভুক্ত হয়।—*সম্পাদক*।

ASPECTS OF SOCIAL HARMONY IN BANGLA CULTURE AND PEACE SONGS

[প্রথম প্রকাশ : ১৯৯১]

Translation
Ahmed Sofa

Editor
Ferdous Ahmed
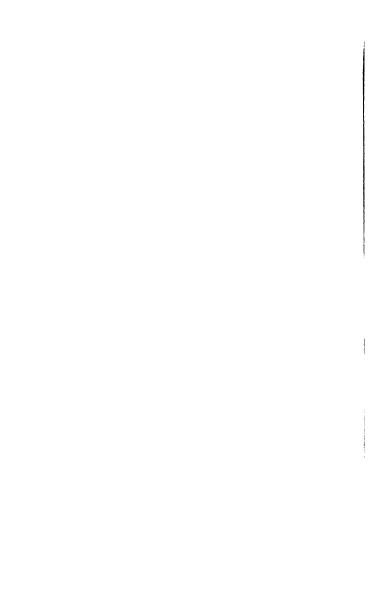
ASPECTS OF SOCIAL HARMONY IN BANGLA CULTURE AND PEACE SONGS

People from different parts of the world came to Bangladesh and chose to make this land of alluvial deposit their home. Throngs of people from outlying provinces of India came to this fertile land. Sometimes allurement of kingdom, sometimes passion for religion and sometimes greed for gold attracted people from all over the world. This very land is the meeting place of people of different nationalities and races. At the same time it is the melting pot of many cultural trends.

Four major religions of the world enlightened this land with their respective divine lights. With the expansion of Aryan conquest Hinduism sprad here. The message of Veda, Upanishad and Gita enkindled the spritual fire of the people of this land.

Lord Gautam Buddha's preaching of love and universal brotherhood gained wide acceptance among the masses and as well as among elites. The teachings of the Muhammad (P. U. H) added a valuable dimension to the behavioural pattern and human relationship of society. Teachings of love and tolerance by the Sufi preachers got firm ground in the heart of the people. Lately Christianity came as the torch bearer of modern enlightenment and humanity.

Bangladesh has always been a unique example of social harmony. As this country is situated in the easternmost frontier of the Indian subcontinent, the rigidity of Hindu caste system did not take firm root here unlike other Indian territories. For quite a number of centuries Buddhism was the most dominant religion of this area. Gautam Buddha's gospel of love and peace contributed to a great extent to shaping the attitude and outlook of these people. Also in the expansion of Islam one marked characterstic is

very easily discernible : People in general accepted the faith of Islam from the Sufis, it signifies both love and tolerance, not the faith of those who conquered the land with drawn swords. For the English, who ruled this country for nearly two centuries, expansion of Christianity was not their secondary consideration even. The faith of Christ got ground here through its inner strength.

People of different communities are living side by side in amity and harmony from time immemorial. Instances of communal tension and strife are few. Those who try to break the social harmony with some ulterior motives are always condemned by the people. We can find a Hindu temple, a Buddist Bihar, a Muslim mosque and a Christian Church in the same village. Like water, air and sunshine they won their culture. Bangla culture is the treasure trove of their social values and undying spring of their hope and aspiration. Through their common effort they created a proud culture, which is both local and at the same time universal in its essence. It brought out many towering personalities. Every nation of the world could be proud having these personalities of higher stature.

Bangla culture is not the product or creation of a single privileged community. All the communities in their turn contributed and enriched the culture. The Buddhist population for example hardly exceeds 2 millions nowadays. But the first literary expression of the Bangla language was Charjapada. Charja means hymns. Those who composed these simple but beautiful Charjas all were the followers of Lord Buddha. The Christian population in Bangladesh is even smaller than that of the Buddhists. Yet, the Portuguese born Henri Derozio's memory is very much alive in the mind of the enlightened people. Derozio was the person who composed the first patriotic poem. A young generation of students got the idea of modern patriotism from Derozio. He spearheaded the cause of Bengal renaissance. Madhusudan Dutt was a Christian, but he brought about a revolution in the realms of literature. He introduced Blank Verse, wrote epic in western style. He revolutionised the whole gamut of culture through his genius.

The marginal people, who do not belong to the mainstream either linguistically nor ethnically, also made significant contributions to the development of the Bangla culture. Tribal songs and dances are gradually getting themselves integrated into the main Bangla cultural stream.

In Bangladesh there are religious differences, but there is no cultural difference. The Bangla culture is the source of common inspiration and aspiration. Culture transceds the Bangladeshi irrespective of their caste, creed, tradition or sect. They live and breathe in the Bangla culture as a fish swims in the water. The Bangla culture is the creation of all people. Each and every community in different succesive historic stages made distinct contribution to the growth and development of this beautiful culture.

Rather than strife and quarrel, hatred and jealousy, mutual love and harmony is the cardinal principle which guided the spirit of this culture. Respect for human dignity and love is permeated in the visions of poets and composers. The Vaishnava poets did not make any difference between love and God. To these poets and composers, love is the basis of life and God Himself is the embodiment of love.

The question of human dignity always got top priority. Chandidas, a famous Vaishnava poet of the fourteenth century wrote :

> শুন হ মানুষ ভাই
> সবার উপরে মানুষ সত্য
> তাহার উপরে নাই।

> Oh, Brother, listen to the truth
> Man is supreme
> And there is no one above him.

Apart from the famous cultural centres and the followers of the established reputed schools, the simple village folk did not fail to express their commitment to the universal human brotherhood.

> নানান বরণ গাভীরে
> একই বরণ দুধ

জগৎ ভরমিয়া দেখলাম
একই মায়ের পুত।

Although the cows are in
Varied colors, their milk is the same white
I travelled around the wide world
And found that all human beings
Are the sons of the same mother.

Since the very beginning, the sense of human dignity and universal love has caught the special attention of the poets and composers. Their commitment continues like a never-ending red thread in the whole domain of the culture. Let us look at one rare example from the folk song :

মানুষের মান দাও
মানুষের গান গাও
মানুষ সবার সেরা
মানুষ ঈশ্বর ঘেরা
এ সংসারে।

Well, give respect to man
And sing in his praise
Man is the best of all
And in this world he is
Surrounded by God.

Thousands of songs like the above quoted are scattered around the whole folk literature. Their appeal to the common mass is tremendous. The people who composed these immortal songs were mostly little literate. No court gave them any pension, no passion for fame prompted them to write these songs. They simply communicated with their fellow human beings through their utterances. Most of them did not care to establish the authorship even. That is the reason why most writers of the folk songs are unknown.

In Bangla poetry and song one can easily discern two distinctive concerns, one is the burning passion for mutual love and brotherhood and the other is the protest against social injustice, human inequality and other issues. Now we are quoting from sheikh Fazlul Karim :

কোথায় স্বর্গ কোথায় নরক
কে বলে তা বহু দূর
মানুষের মাঝে স্বর্গ-নরক
মানুষেতে সুরাসুর
পুণ্য প্রীতির বাঁধনে যখন
বাঁধি গো পরস্পরে
স্বর্গ আসিয়া দাঁড়ায় তখন
আমাদের কুঁড়েঘরে।

Where is Heaven and where is Hell
Who says they stay quite a far
Both Heaven and Hell is within man
And devil and God, are both in man
When we live with mutual love
and fraternal feeling
Then our small huts transform
into Heaven.

Another poet Govinda Das wrote :

দিন ফুরায়ে যায় গো আমার
দিন ফুরায়ে যায়
কি করিয়া হিসাব দিব
নিকাশ যদি চায়
ক্ষুধায় কাতর অবসন্ন
কারে দিলাম কয়টি অন্ন
কয়টি আঁজল দিয়েছি জল
আকুল পিপাসায়।

Oh my days are exhausting
If accounts are asked, how I meet the demand
Did I give a morsel of food to the destitue
Or did I extend a cup of water to the thirsty

Bharatchandra most powerful poet of eighteenth
century wanted only one gift from the mother
goddess

আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে
"I want this gurantee, so that
my progeny lives with milk and rice."
—Bharatchandra

By all measure Rabindranath Tagore is the most towering personality of Bangla culture. Although he is mainly known as poet, the range of his personality is much extended. One feels quite helpless in dileneating his proper field. At times, it seems, for this nation his existence is more majestic and imposing than mighty Himalaya. Tagore was born with gold spoon in hand. Inspite of that, his feeling for the downtrodden and his utter disliking for social and racial discrimination is such intense that his poems, his songs became the object of daily recitation. Now we are quoting from অপমানিত in literal translation which means humiliated.

হে মোর দুর্ভাগা দেশ, যাদের করেছ অপমান
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।
মানুষের অধিকারে বঞ্চিত করেছ যারে
সম্মুখে দাঁড়ায়ে রেখে তবু কোলে দাও নাই স্থান
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।

মানুষের পরশেরে প্রতিদিন ঠেকাইয়া দূরে
ঘৃণা করিয়াছ তুমি মানুষের প্রাণের ঠাকুরে।
বিধাতার রুদ্ররোষে, দুর্ভিক্ষের দ্বারে বসে
ভাগ করে খেতে হবে সকলের সাথে অন্নপান
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।

যারে তুমি নিচে ফেল সে তোমারে বাঁধিবে যে নিচে
পশ্চাতে রেখেছ যারে সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে
অজ্ঞানের অন্ধকারে আড়ালে ঢাকিছ যারে
তোমার মঙ্গল ঢাকি গড়িছে সে ঘোর ব্যবধান।
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।
শতেক শতাব্দী ধরে নামে শিরে অসম্মান ভার
মানুষের নারায়ণে তবুও কর না নমস্কার
তবু নত করি আঁখি দেখিবারে পাও নাকি

নেমেছে ধুলার তলে হীন পতিতের ভগবান
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।

Oh my wrteched country whom
you have insulted
You have to be insulted like them
The men, whom you have deprived
From their rights
You have kept them standing before you
Still did not accept as fellow man
You have to be insulted like them.

Every day you have avoided the touch of man
And you have hated the God of his heart
By the scourage of God, when famine
shall appear
You have to share your food with all
You have to be insulted like them.

Whom you have thrown away, he is pulling you that direction
Whom you have left behind, he is dragging you there
Whom you have kept in the darkness of ignorance
He is blocking your path of fulfillment
You have to be insulted like them.

Centuries after centuries, your
head is loaded with dishonour
Still you don't make obeissance to the God of man
You don't lower your gaze and don't see
The God of havenots and fallen came down
to the dust

So you have to be insulted like them.

—Rabindranath Tagore

Rabindranath Tagore wrote innumerable poems and songs in defence of peace and social harmony. At times, global unrest

tormented his poetic heart. In anguish he had written very poignant and piercing verse. We are quoting one :

প্রশ্ন

ভগবান, তুমি যুগে যুগে দূত পাঠায়েছ বারে বারে
দয়াহীন সংসারে
তারা বলে গেল ক্ষমা করো সবে বলে গেল ভালবাসো
অন্তর হতে বিদ্বেষ বিষ নাশো।
বরণীয় তারা স্মরণীয় তারা তবুও বাহির দ্বারে
আজি দুর্দিনে ফিরানু তাদের ব্যর্থ নমস্কারে।
আমি যে দেখেছি গোপন হিংসা কপট রাত্রি ছায়ে
হেনেছে নিঃসহায়ে।
আমি যে দেখেছি প্রতিকারহীন শক্তের অপরাধে
বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে।
আমি যে দেখিনু তরুণ বালক উন্মাদ হয়ে ছুটে
কী যন্ত্রণায় মরেছে পাথরে নিষ্ফল মাথা কুটে।
কণ্ঠ আমার রুদ্ধ আজিকে বাঁশি সঙ্গীতহারা,
অমাবস্যার কারা
লুপ্ত করেছে আমার ভুবন দুঃস্বপনের তলে।
তাই তো তোমায় শুধাই অশ্রুজলে
যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু, নিভাইছে তব আলো
তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ, তুমি কি বেসেছ ভালো?

Oh God you have sent messengers all the time
In this merciless world.
They gave clarion call forgive all, love all
And driveout the venom of hatred from the heart.
They are celebrated and honoured, but
We place them in the outer chamber.
In this crucial time we deprive them from respectful due.
I have seen, secret hatred hurted
The helpless under the cover of night.
I have seen the crime of the powerfuls.
Also seen the voice of justice lamenting in wilderness

I have seen young boy turned mad
And beating head on stone.
My voice is mute and no music in the flute
Dungeon of dark night.
Engulfed my whole world in nightmare
Oh benign God I ask you with tears
Who poisoned your air and put out your light
Did you ever forgive or love them?

—**Rabindranath Tagore**

Poet Satyendranath Dutt in his poem human identity (জাতির পাঁতি) wrote :

জগৎ জুড়িয়া এক জাতি শুধু
সে জাতির নাম মানুষ জাতি
একই রবি শশি গ্রহ তারা
মোদের সাথী।

* * *

কচিকাচাগুলি ডাটো করে তুলি
জলে ডুবি পাইলে ডাঙা
কালো আর ধলো বাহিরে কেবল
ভেতরে সবার সমান রাঙা।

* * *

বাহিরের ছোপ আঁচড়ে সে লোপ
ভেতরের রং পলকে ফোটে
ব্রাহ্মণ, শূদ্র, বৃহৎ ক্ষুদ্র
কৃত্রিম ভেদ ধুলায় লোটে।

In the whole world, there is only one race
And that is human race
The same sun, the same moon and
glittering stars accompany us eternally.

* * * *

We help grow up our little ones as youth of vigour
And take shelter on the ground from water
Black and white are only outer cover
But no discrimination in inner colour.
When you scratch outer shape disappears

And the inner colour shines forth
All the artificial discriminations
Between Brahmin and outcaste,
Big and small drops away.

—Satyendranath dutt

Apart from creating beauty, praising nature and God, almost all of the major and minor poets showed keen concern for the brotherly relation of man. When there is injustice and social intolerance poets never failed to protest in fiery language. There were periods in the history, kings became cruel, beaureucracy coercive, scholars slave. Even in those dark periods poet's rhyme flashed like the lightining in the gloomy night. Presently we are quoting an excerpt from a poem of Kazi Nazrul Islam, who is known as rebel poet. He wrote the poem in protest against the caste discrimination.

জাতের নামে বজ্জাতি সব জাল জালিয়াত খেলছ জুয়া
ছুঁলেই তোর জাত যাবে, জাত ছেলের হাতের নয় তো মোয়া
হুঁকোর জল আর ভাতের হাঁড়ি ভাবলি এতেই জাতির জান
তাই তো বেকুব করলি তোরা এক জাতিকে একশখান।

এখন দেখিস ভারত জোড়া
পচে আছিস বাসি মড়া
মানুষ নাই আছে শুধু জাত শেয়ালের হুক্কা হুয়া
জানিস না কি ধর্ম সে যে বর্মসম সহনশীল
তাকে কি ভাই ভাঙতে পারে ছোঁয়াছুঁয়ির ছোট্ট ঢিল।

All of you are playing foul game in the name of caste
If touched, you think your caste will disappear
Then it is nothing but children's fun
You think smoking pipe and cooking pot is the
soul of the caste
That is the reason you have splitted
The whole nation into hundred sects.
What is happening in the whole of India
All of you are rotting like countless corpse.
Now a days, hardly you hear human voice

Every where caste jackals are howling
It is true, faith is protective and tolerant
like armour
How it can loose its purity by the touch another caste.

—**Kazi Nazrul Islam**

II

In this booklet we have selected the following songs. Songs from prominant composers are included in it. They were sung by eminent artists of Bangladesh and presented in a Bangla-German-Sampreeti peace cassette.

হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী, নিত্য নিষ্ঠুর দ্বন্দ্ব;
ঘোর কুটিল পন্থ তার, লোভজটিল বন্ধ।
নূতন তব জন্ম লাগি কাতর যত প্রাণী—
কর ত্রাণ মহাপ্রাণ, আন অমৃতবাণী,
বিকশিত কর প্রেমপদ্ম চিরমধুর নিষ্যন্দ।
শান্ত হে, মুক্ত হে, হে অনন্তপুণ্য,
করুণা ধরণীতল কর কলঙ্ক শূন্য।

The world is mad with hatred
Frequent cruelty abound there
Its circle is vicious, greed reigns every-where
All awaiting souls are craving for your new birth
Oh great saviour take our away suffering
And bring divine message of salvation.
Help bloom, love lotus that releases eternal flow of honey.
Oh peaceful One, salvated One, emblem of eternal good

Oh compassionate One transform the world
By washing out its black stains.

—Rabindranath Tagore

আনন্দ ধারা বহিছে ভুবনে
দিন রজনী কত অমৃতরস উথলি যায় অনন্ত গগনে।
পান করে রবি শশি অঞ্জলি ভরিয়া—
সদা দীপ্ত রহে অক্ষয় জ্যোতি—
নিত্য পূর্ণ ধারা জীবনে কিরণে।
বসিয়া আছে কেন আপন মনে
স্বার্থনিমগণ কী কারণে?
চারিদিকে দেখ চাহি হৃদয় প্রসারি
ক্ষুদ্র দুঃখ সব তুচ্ছ মানি
প্রেম ভরিয়া লহ শূন্য জীবনে।

The stream of joy is flowing through the
Veins of the world
Day and night endless nectar gushes forth
To the eternal sky.
And sun, moon, drink to the full
So that celestial light remains alive
Filling the earth continuously with
Sunshine and life.
Why sitting idle and morose
Why feel so much concern with petty interest
Behold all around, extend your heart
Pay no heed to the small worries.
Fill up your empty cup with the essence of love.

—Rabindranath Tagore

বরিষ ধরা—মাঝে শান্তির বারি
শুষ্ক হৃদয় লয়ে আছে দাঁড়াইয়ে
ঊর্ধ্বমুখে নরনারী ॥
না থাকে অন্ধকার, না থাকে মোহপাপ
না থাকে শোকপরিতাপ।
হৃদয় বিমল হোক, প্রাণ সবল হোক,
বিঘ্ন দাও অপসারি ॥
কেন এ হিংসাদ্বেষ, কেন এ ছদ্মবেশ,

কেন এ মান-অভিমান।
বিতর' বিতর' প্রেম পাষাণ হৃদয়ে,
জয় জয় হোক তোমারি।

Through peace benediction in this tormented world
With dry heart men and women standing gazing above,
Let there be no darkness, no sign of greed
And no grief and wailing.
Let the heart be pure and life
become strengthened
Remove all obstacles.
Why this hatred and why this disguise
Why this sense of honour and pride
Give love to the heart which became hard like stone.
Oh God, let victory be yours.

—Rabindranath Tagore

আমায় তোমার শান্তির দূত কর প্রভু হে, প্রভু হে ৷
যেথায় জীবন উষর মরু যেথা নাই প্রেম-স্নিগ্ধ তরু
অজস্রধারে ঢালি সেথা যেন তোমার শান্তিবারি
—প্রভু হে, প্রভু হে ৷
হতাশার মেঘ যেথায় রয়েছে ভরা
প্রত্যাশা যেথা মরীচিকা দিয়ে গড়া
সেথা যেন নবারুণ আলো সবারে দেখাতে পারি
—প্রভু হে, প্রভু হে ৷
তব প্রেম চাই, সান্ত্বনা চাই
তার চেয়ে প্রভু মিনতি জানাই
প্রেম-সুগন্ধ ক্ষমা-আনন্দ যেন সবারে গো দিতে পারি
—প্রভু হে, প্রভু হে ৷

Make me your peace envoy
Oh God, my God
Where life is barren desert all around. nowhere
Visible the plant of love
Give me the strength so that I can bring
profound peace benediction
Oh God, my God
Where the cloud is abonading with despair and desolation

Where hope and expectation is mere illusion
There I long to throw the ray of new born light to all.
Oh God, my God
I seek thy love and solace
Above all, I beg you
I want to give the pleasure of forgiveness to all
Oh God, my God.

—Sunil Dutt

তোমার পতাকা যারে দাও তারে বহিবারে দাও শকতি।
তোমার সেবার মহান দুঃখ সহিবারে দাও ভকতি।
আমি তাই চাই ভরিয়া পরাণ দুঃখের সাথে দুঃখের ত্রাণ,
তোমার হাতের বেদনার দান এড়ায়ে চাহি না মুকতি।
দুখ হবে মম মাথার ভূষণ সাথে যদি দাও ভকতি।
যত দিতে চাও কাজ দিয়ো যদি তোমারে না দাও ভুলিতে,
অন্তর যদি জড়াতে না দাও জালজঞ্জালগুলিতে।
বাঁধিয়ো আমায় যত খুশি ডোরে মুক্ত রাখিয়ো তোমাপানে মোরে,
ধুলায় রাখিয়া পবিত্র ক'রে তোমার চরণধূলিতে—
ভুলায়ে রাখিয়ো সংসারতলে, তোমারে দিয়ো না ভুলিতে।
যে পথে ঘুরিতে দিয়েছ ঘুরির— যাই যেন তব চরণে,
সব শ্রম যেন বহি লয় মোরে সকল শ্রান্তি হরণে।
দুর্গম পথ এ ভব গহন, কত ত্যাগ শোক বিরহদহন—
জীবনে মৃত্যু করিয়া বহন প্রাণ পাই যেন মরণে—
সন্ধ্যাবেলায় লভি গো কুলায় নিখিলশরণ চরণে।

To whom you give your banner endow him
With the strength to carry it
Fill my heart with intense love, so that I can
Endure the noble pain of your service.
I want it from the core of my heart
Grief is there, but I want to put an end to it.
I do not long to have delibesateness avoiding
The gift of your suffering.
If you give me devotion, suffering shall be my crown
In order to keep my heart free from the filthiness
Of the world.
Put me into action— that helps me remind you.

Engage me in action but keep me
Free to remember you
Keep me sacred under the dust of your feet
You, make me forgetful in the world so that
I do not forget you.
The path you mentioned I shall lead steadfastly
Be it my lord, all my labour carry me into the
state of blissfulness.
This world is an abode of trouble, full of sorrow and
lamentation.
By carrying death in life, I want life after death.
By the dusk I long to take shelter
Where all shelterless take resort.

—Rabindranath Tagore

সত্য বল সুপথে চল ওরে আমার মন
সত্য সুপথ না চিনিলে পাবিনে
মানুষের দরশন।
খরিদ্দার মহাজন যেমন
বাটখারাতে করে ওজন
গদিয়ান মহাজন যেজন
বসে কেনে প্রেম রতন।
পরের দ্রব্য পরের নারী হরণ কর না
পাড়ে যেতে পারবে না
যতবার করিবে হরণ
ততবার হবেরে জনম।
লালন ফকির আসলে মিথ্যে
ঘুরে বেড়ায় তীর্থে তীর্থে
সই হল না এক মন দিতে
আসলেতে প'লো কম।

Oh my mind tell truth, follow the right path
If you fail to follow the truth and the right path
The essence of manhood shall remain unveiled
He who is a petty trader
Weighs things with measuring stone

But a wealthy merchant
Buys the jewels with little ease.
In fact Lalon Fakir is full of falsehood
And roams around various holy places
As he failed to concentrate on single objects
His entire effort went fruitless. '

—Fakir Lalon Shah

সব লোকে কয় লালন কি জাত সংসারে
লালন কয় জাতের কি রূপ
দেখলাম না ভাই নজরে ॥

কেউ মালা কেউ তসবি গলায়
তাইতে কি জাত ভিন্ন বলায়
যাওয়া কিংবা আসার বেলায়
জাতের চিহ্ন রয় কাররে ॥

যদি ছুন্নত দিলে হয় মুসলমান
নারীর তবে কি হয় বিধান
বামন চিনি পৈতেয় প্রমাণ
বামনী চিনি কিসেরে ॥

জগৎ বেড়ে জাতের কথা
লোকে গর্ব করে যথাতথা
লালন সে জাতের যাতা
ডুবাইছে সাধের বাজারে ॥

People ask me, Lalon what is your caste
Lalon answers, I have never seen with my eyes
What is the colour of caste.
Some put mala and some put tasbi beads
But that does not make any difference
Can one discern caste marks either at birth or in death.
If circumcision is the sign of mussulman male
Then what is it for woman.
Male Brahmin can be discerned by a sarced thread
Then what is the identification mark of a female Brahmin?

In this world everyone everywhere
sings the glory of caste
But Lalon sold the caste symbol
In the market of the world.

—**Fakir Lalon Shah**

দুর্গম গিরি, কান্তার-মরু, দুস্তর পারাবার
লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি-নিশীথে, যাত্রীরা হুঁশিয়ার!
দুলিতেছে তরী, ফুলিতেছে জল, ভুলিতেছে মাঝি পথ,
ছিঁড়িয়াছে পাল, কে ধরিবে হাল, আছে কার হিম্মৎ
কে আছ জোয়ান, হও আগুয়ান হাঁকিছে ভবিষ্যৎ।
এ তুফান ভারী দিতে হবে পাড়ি, নিতে হবে তরী পার॥
তিমির রাত্রি, মাতৃমন্ত্রী সান্ত্রীরা সাবধান।
যুগ-যুগান্ত সঞ্চিত ব্যথা ঘোষিয়াছে অভিযান।
ফেনাইয়া উঠে বঞ্চিত বুকে পুঞ্জিত অভিমান,
ইহাদের পথে নিতে হবে সাথে, দিতে হবে অধিকার॥
অসহায় জাতি মরিছে ডুবিয়া জানে না সন্তরণ,
কাণ্ডারী! আজ দেখিব তোমার মাতৃমুক্তি পণ।
"হিন্দু না ওরা মুসলিম" ওই জিজ্ঞাসে কোন্ জন?
কাণ্ডারী! বল, ডুবিছে মানুষ, সন্তান মোর মা'র।

Unsurmountable mountain, fierce desert
And wide ocean lie ahead
You have to cross everything in this dead
Of night, passengers, be aware.
The ship is trembling, water swelling and the
Captain is making mistakes.
The mast is torn apart, is there anybody, who
Is bold and young enough to the keep rudder under control?
Oh bold one, young one, come forward
The future is calling you.
This is a perilous storm, yet you have to guide
The ship into the safe harbour.
The night is dark, you on whose shoulder
The fate of mother rests, take care.
The tormenting pain of age suddenly starts moving

So the anguish of the deprived streaming forth.
You have to take them with you and give them their right.
Helpless nation is drowning, does not know how to swim
Well captain, now test your strength
For the liberation of mothers.
Who drowns wheather he is Hindu or Mussulman
Who asks this foolish question.
Say captain, drowning are the sons of your mother.

—Kazi Nazrul Islam

সবারে বাসরে ভালো নইলে মনের কালো ঘুচবে না রে
আছে তোর যাহা ভালো, ফুলের মত দে সবারে ॥
করি তুই আপন আপন হারালি যা ছিল আপন
এবার তোর ভরা আপন বিলিয়ে দে তুই যারে তারে ॥
যারে তুই ভাবিস ফণি তারো মাথায় আছে মণি
বাজা তোর প্রেমের বাঁশি ভবের মনে ভয় বা কারে।
সবাই যে তোর মায়ের ছেলে রাখবি কারে কারে ফেলে?
একই নায়ে সকল ভায়ে যেতে হবে যে ওপারে ॥

Love all, otherwise the stain of your heart will not disappear
The good you have, give it all like the smell of a flower.
By declaring everything your own
you are deprived of your most precious own.
Now is the time to distribute your very self to others
Who you consider a venomous snake
Also contains jewels in the hood.
Play the flute of love, you who is there to be
Dreaded in this jungle of the world.
All are the sons of your own mother
Whom you save and whom you leave behind
All shall have to cross by the same boat.

—Atulprasad Sen

নিচুর কাছে নিচু হতে শিখলি নারে মন
সুখীজনের করিস পূজা দুঃখীর অযতন
লাগেনি যার পায়ে ধূলি
কে নিবি তার চরণধূলি

নয়রে সোনা বনের কাঠে
হয়রে চন্দন।
প্রেমধন অমূল্য রতন
অন্ধ সুতে অধিক যতন
সে ধনেতে ধনী যেজন
সেই সে মহাজন।
মতামতের তর্কে মত্ত
আছিস ভুলে সরল সত্য
সকল ঘরে সকল নরে
আছেন নারায়ণ।

You did not practice oh my mind
To lower yourself to the lowliest.
You worship the happy people
And do not care about the destitute
He who does not put his feet on dust
Can any one collect dust from his feet?
It is jungle-wood not gold
That produces scented sandals.
Love is the priceless wealth
Mothers love most her blind childen.
Only he who is rich with this wealth
Can be counted as a noble soul
Engaging futile debate
You forget the basic simple truth
That God lives in every man and every house.

—Atulprasad Sen

ধন-ধান্য পুষ্পভরা আমাদের এই বসুন্ধরা
তাহার মাঝে আছে দেশ এক সকল দেশের সেরা
ও সে স্বপ্ন দিয়ে তৈরি সে যে স্মৃতি দিয়ে ঘেরা।
এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি
সকল দেশের রানী সে যে আমার জন্মভূমি।
চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা, কোথায় এমন উজ্জ্বল ধারা!
কোথায় এমন খেলে তড়িৎ এমন কালো মেঘে!
তারা পাখির ডাকে ঘুমিয়ে পড়ে পাখির ডাকে জাগে—

এমন স্নিগ্ধ নদী কাহার, কোথায় এমন ধুম্র-পাহাড় ।
কোথায় এমন হরিৎক্ষেত্র আকাশ তলে মেশে
এমন ধানের উপর ঢেউ খেলে যায় বাতাস কাহার দেশে ।
পুষ্পে পুষ্পে ভরা শাখী, কুঞ্জে কুঞ্জে গাহে পাখি
গুঞ্জরিয়া আসে অলি পুঞ্জে পুঞ্জে ধেয়ে
তারা ফুলের উপর ঘুমিয়ে পড়ে ফুলের মধু খেয়ে
ভায়ের মায়ের এত স্নেহ কোথায় গেলে পাবে কেহ
ওমা তোমার চরণ দুটি বক্ষে আমার ধরি
আমার এই দেশেতে জন্ম যেন এই দেশেতে মরি ॥

This is our world with the wealth
Of paddy fields and flowers
Amidst that is a land, best of all lands
Which is made of dreams and woven with memory.
Nowhere you will find a place like this.
My motherland is the queen of all lands
Where do you see the bright sun, a mellow moon and twinkling stars.
Where do you see flashes of lightning in the dark cloud.
Nowhere you find a place like this
Where is such a smooth flow of rivers and
Where does air visit frequently smoky hill tops.
Shivering the undulating paddy field.
Nowhere will you find a place like this.
Branches, abundant with flowers birds sing in the groves.
The drones come in swarms with sweet sounds
They fall asleep by the song of a bird and are
Awakened by the bird song again.
After drinking honey, they sleep on the petals of flowers.
Where do you get so much intense love for brother and mother.
Oh mother, I shall hold thy feet at my breast.
My prayer I want to be born and die here
Nowhere will you find a place like this.

—**Dijendralal Roy**

একবার গালভরা মা ডাকে
মা বলে ডাক, মা বলে ডাক, মা বলে ডাক মাকে ॥
ডাক এমনি করে আকাশ ভুবন সেই ডাকে যাক ভরে
আর ভায়ে ভায়ে এক হয়ে যাক যেখানে যে থাকে ॥
দুটি বাহু তুলে নৃত্য করে ডাকরে মা মা বলে,
আর নেচে নেচে আয়রে আয়রে মায়ের ঝাঁপিয়ে পড়ি কোলে
মায়ের চরণ দুটি জড়িয়ে ধরে আনবে মায়ে লুটে
ছেলের শুনলে সে ডাক দেখব সে মা কেমন করে থাকে।
দিয়ে করতালি মা মা বলি' ডাকরে এমনিভাবে,
উঠে প্রবল বন্যাভাবে ভুবন ভাসিয়ে দিয়ে যাবে
মায়ের বুকের ওপর আছড়ে পড়ে চক্ষু দুটি মুদে ॥
আমার গান ভেসে যাক প্রাণ ভেসে যাক দেখি শুধুই মাকে ॥

Call our mother with fullthroated voice
All together call mother, mother
Raise the voice so that heaven and
Earth are filled with that voice.
Brothers get united, embrace each other
And dance with raised hands calling
Mother, mother, mother
In dancing throw yourself into the lap of the mother
Grasp the mother's feet and rub it
When the mother hears this call
She will keep herself aloof
Clap your hands along with calling
Overflood the world with calls.
I shall throw myself to the core of my mother and shall
Wipe my tears away.
Let my song and life be torn apart, I shall
look at Only my mother.

—Dijendralal Roy

আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি।
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস,
আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি ॥
ও মা, ফাগুনে তোর আমের বনে ঘ্রাণে পাগল করে,
মরি হায় হায় রে—

ও মা, অঘ্রাণে তোর ভরা ক্ষেতে আমি কী দেখেছি মধুর হাসি ॥
কী শোভা, কী ছায়া গো, কী স্নেহ কী মায়া গো
কী আঁচল বিছায়েছ বটের মূলে, নদীর কূলে কূলে।
মা, তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মতো,
মরি হায় হায় রে—
মা, তোর বদনখানি মলিন হলে, ও মা, আমি নয়ন জলে ভাসি ॥
তোমার এই খেলাঘরে শিশুকাল কাটিলরে
তোমারি ধূলামাটি অঙ্গে মাখি ধন্য জীবন মানি।
তুই দিন ফুরালে সন্ধ্যাকালে কী দীপ জ্বালিস ঘরে
মরি হায় হায় রে—
তখন খেলাধুলা সকল ফেলে, ও মা, তোমার কোলে ছুটে আসি ॥
ধেনু ভরা তোমার মাঠে, পারে যাবার খেয়াঘাটে
সারাদিন পাখি-ডাকা ছায়ায়-ঢাকা তোমার পল্লীবাটে
তোমার ধানে-ভরা আঙ্গিনাতে জীবনের দিন কাটে
মরি হায় হায় রে—
ও মা, আমার যে ভাই তারা সবাই,
ও মা, তোমার রাখাল, তোমার চাষী ॥
ও মা, তোমার চরণেতে দিলেম এই মাথা পেতে
দেগো তোর পায়ের ধূলা, সে যে আমার মাথায় মানিক হবে।
ও মা, গরিবের ধন যা আছে তাই দিব চরণতলে
মরি হায় হায় রে—
আমি পরের ঘরে কিনব না আর, মা তোর ভূষণ বলে গলায় ফাঁসি॥

Oh my golden Bangla, I love thee
Thy sky, thy air, vibrates in my ear
Like the sound of the flute.
Oh mother, in the month of Faalgoon
The smell of mango groves turns me mad
Oh mother, what an ecstasy, what a bliss
Oh mother, in the month of Agrahayan
In the field full of crop
What a beautiful smell I come accross.
What a majestic show, what a coolshed
What love and tenderness.
What garments extend thee under the
Banyan roots and the river banks.

Thy voice, mother, in my ear sounds like sweet music
Mother, when I see thy sullen face, I can
hardly check my tears.
I spent my childhood on thy doll's house
By rubbing thy dust on my body, I feel
I am salvated
At dusk, what soft light lits thee in thy hut
Oh mother, what an ecstasy, what a bliss.
I throw away all games and seek shelter in thy lap.
In thy cow grazing field
And in the ferry stations
Where birds sing, trees throw shades on your rural abode.
In thy golden paddy strewn yards
My life passes through.
Oh mother, what an ecstasy, what a bliss.
Mother, thy cowherds, thy tillers, all of them
Are my brothers.
Mother, I throw my head on thy feet
Give me the dust of thy feet that will
Shine like jewels on my head.
Mother, I shall give all the possessions of a poorman to you.
And I will not buy anything from foreigners
As this would be like buying a hanginy rope.

—Rabindranath Tagore

য়োহান ভোলফ্‌গাঙ ফন গ্যোতে বিরচিত কাব্যনাটক

ফাউস্ট

[প্রথম প্রকাশ : ১৯৮৬]

উৎসর্গ

প্রয়াত হাসান হাফিজুর রহমানের স্মৃতির উদ্দেশে

ভূমিকা

এক

'গ্যোতের কাছ থেকে যে বিপুল পরিমাণ ঋণ আমরা প্রত্যক্ষভাবে গ্রহণ করেছি, গ্রিক যুগের পরে অন্যকোন মনীষী এককভাবে আমাদের তেমন ঋণী করতে পারেননি।' অস্কার ওয়াইল্ডের এই উক্তিটিকে অতিকথন মনে করার কোন সঙ্গত কারণ নেই। বস্তুত পৃথিবীতে লিওনার্দো দ্যা ভিঞ্চির পরে এমন কোন প্রতিভার আবির্ভাব ঘটেনি— অবদানের বৈচিত্র্যে, ঋদ্ধির গভীরতায়, সিদ্ধির উৎকর্ষ বিচারে গ্যোতের সঙ্গে যাঁর কোন তুলনা চলতে পারে। গ্যোতের কাব্যকথা অমৃতসমান। রেনেসাঁ-উত্তর ইউরোপে উইলিয়াম শেকস্‌পীয়রের কাব্যকলার পাশাপাশি একমাত্র গ্যোতের কাব্যকলাই তুল্যমূল্যে স্থান পাওয়ার দাবি রাখে। শেকস্‌পীয়র এবং গ্যোতে ইউরোপের এই দুই উত্তুঙ্গ কাব্যশৃঙ্গের মধ্যে অবশ্যই শেকস্‌পীয়রের নাম প্রথমেই উচ্চারণ করতে হবে। বিশিষ্ট সমালোচকদের মতে, গ্যোতে প্রতিভার উচ্চতা এবং গভীরতা শেকস্‌পীয়রের মত না হলেও গ্যোতেকে প্রায়ই শেকস্‌পীয়রের সমকক্ষ মনে করা হয়।

কবি, বিজ্ঞানী, দার্শনিক, নাট্যকার, প্রশাসক, খনিজ-বিশেষজ্ঞ, নাট্য-পরিচালক, চিরপ্রেমিক, চিরযুবক ইত্যাদি যে-কোন অভিধাতেই চিহ্নিত করা হোক-না কেন, গ্যোতের সামগ্রিক পরিচিতি কখনো ধরা পড়বে না। এই অনন্য সূর্য-সঙ্কাশ প্রতিভার অধিকারী ব্যক্তিত্বের বিরাশি বছরের জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি তাঁর নিজের জীবন। গ্যোতে-জীবনের গভীরতার দিকে তাকালে মহাসমুদ্রের কথা মনে হয়, উচ্চতার প্রতি দৃষ্টিপাত করলে সূর্যালোকে ঝলমলানো তুষার-কিরীট-মণ্ডিত গিরিরাজ হিমালয়ের কথা সতত স্মরণে আসে। তাঁর কল্পনার ব্যাপ্তি এতদূর প্রসারিত এবং এতদূর বিস্তৃত ছিল যে সৃষ্টির রহস্য যেন তিনি করদ্বয়ে ধারণ করে আছেন। যুগের পর যুগ পেরিয়ে যাবে, সমাজ-সভ্যতার ধরনধারণ-রীতিনীতি যথানিয়মে পাল্টাবে, মানুষ আসবে মানুষ যাবে, এই বিবর্তন পরিবর্তনের চঞ্চল ধারাস্রোতে সমূহ মহত্ত্ববিনাশিনী কাল গ্যোতের সৃষ্টির শরীরে আঁচড়টিও কাটতে পারবে বলে মনে হয় না। চীনের প্রাচীরের মত প্রকাণ্ড বিরাট অথচ একান্ত মানবিক প্রয়াসে সৃষ্ট তাঁর জীবনের প্রতি তাকালেই একটা পবিত্র আতঙ্ক সমগ্র চেতনা আচ্ছন্ন করে ফেলে, শিরদাঁড়ার ভেতর দিয়ে একটা শীতল স্রোতধারা আপনিই প্রবাহিত হতে থাকে। মানুষের জীবন এত গভীর, এত তন্ময়, এত প্রশ্নশীল, এত সৃষ্টিসক্ষম, এত বিচিত্র হতে পারে, দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। তাই হাইনরিশ

হাইনে যখন আকাশের থরে-থরে ফোটা নক্ষত্রমণ্ডলকে গ্যোতের চিন্তার ফুল বলে অভিহিত করেন, একটুও অস্বাভাবিক মনে হয় না।

দিগ্বিজয়ী বীর সম্রাট নেপোলিয়ন গ্যোতের এ্যাপোলো দেবতার মত কান্তিমান মুখমণ্ডলের দিকে তাকিয়ে অপূর্ব বিস্ময়ভরে একবার উচ্চারণ করেছিলেন, 'আ-হা দেখ, একটা মানুষের মত মানুষ।' শুধু নেপোলিয়ন কেন, গ্যোতের জীবনাবসানের পরেও যাঁরা বীর, যাঁরা জ্ঞানী, যাঁরা শ্রেষ্ঠ, মহৎ তাঁদের অনেকেই এই বিরাট জীবনের প্রতি শ্রদ্ধামিশ্রিত বিস্ময়ে, গরিমামণ্ডিত মস্তক অবনত করেছেন। বিসমার্ক, কার্লাইল, হেগেল, শীলার, বেঠোফেন থেকে শুরু করে কার্ল মার্কস, ফ্রেডারিক এঙ্গেলস, পুশকিন, লেনিন, প্লেখানভ, জওহরলাল নেহেরু— এমনি অতিকায় মানবদের অনেকেই গ্যোতে জীবনকে অনুপ্রেরণা এবং উপলব্ধির অমর উৎসস্থল হিসেবে গ্রহণ করেছেন এবং অগ্রজ হিসেবে তাঁকে মান্য করেছেন। সাহিত্যসাধনা ও মননচর্চার যে ধারাটি তিনি চালু করেছিলেন, তুলনামূলকভাবে সাম্প্রতিককালের বেনেদিত্তো ক্রোচে, আলবার্ট সোয়াইৎজার, টমাস মান থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পর্যন্ত সকলে এই একই ধারা অনুসরণ করে গেছেন। কতক বিচারশীল ইউরোপীয় পণ্ডিত মাত্র কয়েক বছর আগে প্রয়াত অস্তিত্ববাদী ফরাসি দার্শনিক জাঁ পল সার্ত্রকেও গ্যোতের উত্তরসূরী হিসেবে চিহ্নিত করতে একটুও দ্বিধান্বিত হননি। তাঁর চিন্তাধারার গতিবেগ এখন পর্যন্ত বিশ্বের মননশীল মানুষের মনের গভীরে ঝঙ্কৃত হচ্ছে। মূল্যমান, সমৃদ্ধ সমস্ত নতুন শিল্পকলা প্রাচীন উৎসের থেকেই সম্ভাবিত হয়। গ্যোতে সমস্ত পৃথিবীর প্রাচীন সংস্কৃতির ধারাস্রোতসমূহে অবগাহন করে এমন একটা সমুন্নত সংস্কৃতিচিন্তার বুনিয়াদ তাঁর গোটা জীবনের সাধনায় প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন, যেখানে ধর্ম-দেশ-জাতির সমস্ত ভেদাভেদ লুপ্ত হয়ে গেছে। একমাত্র মানুষ ও মানুষী চেতনার আগুনই তার প্রাণবস্তু।

দুই

গ্যোতের জন্মের পূর্ব থেকেই ইউরোপে আধুনিকতার হাওয়া বইতে শুরু করেছে। আধুনিক বিজ্ঞানের চর্চা হাঁটি-হাঁটি পা-পা করে অনেক দূর এগিয়ে এসেছে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের আরো নানাশাখার বিকাশ-প্রক্রিয়ার মধ্যে বেগ এবং আবেগ সঞ্চারিত হতে শুরু করেছে। দর্শন এবং সমাজচিন্তায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়ে গেছে। ইংল্যান্ডে বুর্জোয়া গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, নতুন উদ্যমসহকারে শিল্প-বিপ্লবের জয়যাত্রা সূচিত হয়েছে। বিজ্ঞানে নিউটনের আবির্ভাবের কারণে পদার্থবিদ্যার পূর্বের ধারণা পুরোপুরি অকেজো হয়ে পড়েছে। ফ্রান্সের ঈশানকোণে বিপ্লবের রক্তমেঘ ঘনীভূত হতে লেগেছে। রুশো, ভোলতেয়ার, দিদেরো এবং 'এনসাইক্লোপিডিস্ট' মুভমেন্টের আরো নানামনীষীর বিশ্লেষণধর্মী রচনার মধ্যদিয়ে নতুন প্রগতিশীল বৈপ্লবিক ভাবাদর্শ বিপ্লবের ক্ষেত্রটি প্রস্তুত করে আসছিল। সে সময় ফরাসি মনীষীদের চিন্তা-চেতনার ঢেউ গোটা ইউরোপ মহাদেশের মানস-জগতে অভাবিতপূর্ব তরঙ্গের পর তরঙ্গ সৃষ্টি করে যাচ্ছিল। গ্যোতে যৌবনকালেই ফরাসি

মনীষীদের চিন্তা-চেতনার সংস্পর্শে এসেছিলেন। গ্যোতের বয়স যখন তিরিশ, ফরাসি দেশে বুর্জোয়া বিপ্লব সংঘটিভ হয়। তার তিন বছর পূর্বে অর্থাৎ ১৭৮৬ সালে জর্জ ওয়াশিংটনের নেতৃত্বে আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়। আজকের দিনে দুনিয়ার নির্যাতিত এবং নিপীড়িত জাতি এবং শ্রেণীসমূহ যেভাবে অনুপ্রেরণার উৎসভূমি হিসেবে রুশ, চীন ইত্যাদি দেশের সামাজিক বিপ্লবকে বিচার করে থাকে, সে সময়ে রাজতন্ত্র এবং সামন্ততন্ত্রের ভারে পীড়িত জাতিগুলোও এই একই দৃষ্টিতে আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামের মূল্যায়ন করত। আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামের তিন বছর পরে সংঘঠিত হল ফরাসি বিপ্লব। যে-কোন মানদণ্ডে বিচার করা হোক-না কেন, ফরাসি বিপ্লব যে আধুনিক জগৎ এবং মধ্যযুগীয় জগতের মধ্যে একটি ছেদরেখা স্বরূপ, তাতে সন্দেহের খুব অল্পই অবকাশ আছে। ফরাসি বিপ্লব মানবজাতির জন্য যে সুদূরপ্রসারী কল্যাণ বহন করে এনেছিল, বিপ্লবের অব্যবহিত পরের ঘটনাপ্রবাহে কিন্তু তার বিশেষ লক্ষণসমূহ পরিস্ফুট হয়ে ওঠেনি। বিপ্লবের পরে ফরাসি দেশে আতঙ্কের রাজত্ব কায়েম হল, রাজপথ রক্তের বন্যায় ভেসে গেল। বিপ্লবের মধ্যদিয়ে যে অবরুদ্ধ সামাজিক শক্তি মুক্তি লাভ করে, অনেকদিন নিজেদের মধ্যে হানাহানি-মারামারির পর নেপোলিয়নের নেতৃত্বে সেই শক্তিপুঞ্জ সংহত আকার ধারণ করে একটা অত্যন্ত পরাক্রমশালী দিগ্বিজয়ী শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। নেপোলিয়নের বিজয়ী বাহিনী, রাশিয়া অভিযানের পূর্ব পর্যন্ত, ইউরোপের যেদিকেই গেছে রাজ্যসমূহ তাসের ঘরের মত লণ্ডভণ্ড ছত্রখান করে ফেলেছে, বিজয়ী বাহিনীর পদতলে পাকা তালের মত সুবর্ণ নির্মিত রাজমুকুটসমূহ লুটিয়ে পড়েছে। নতুন বিজ্ঞান, নতুন ভাবাদর্শ, নতুন-নতুন বৈদেশিক বাণিজ্যের আয়োজনের পাশাপাশি ইউরোপে চলেছে ক্রমাগত রাজ্য এবং সমাজ ভাঙ্গাভাঙ্গির তাণ্ডবলীল। গ্যোতে আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামের খবর শুনেছেন, একেবারে কাছ থেকে ফরাসি বিপ্লবের প্রচণ্ড-প্রকাণ্ড ঝটিকাপ্রবাহ প্রত্যক্ষ করেছেন, নেপোলিয়নের বিজয়ী বাহিনীর অপ্রতিহত জয়যাত্রা স্বচক্ষে দেখেছেন, নেপোলিয়নের পরাজয়, নির্বাসন এবং মৃত্যুর সময় পর্যন্ত জীবিত ছিলেন।

এই যে বিপুল, বিশাল ঘটনার অবারিত শোভাযাত্রা, সে সম্পর্কে একটা প্রাথমিক ধারণা না থাকলে গ্যোতেকে বোঝা বোধকরি সম্ভব হবে না। কারণ গ্যোতে ইউরোপীয় ভাবাদর্শের অগ্রযাত্রার যেমন শরিক ছিলেন, তেমনি ইউরোপের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে একান্ত অনিচ্ছায় হলেও তাঁকে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত থাকতে হয়েছে। সমকালে ইউরোপের শ্রেষ্ঠতম কবি, নাট্যকার, বিজ্ঞান সাধক হলেও তিনি ছিলেন ভাইমার রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী।

তিন

গ্যোতের জন্মস্থান জার্মানি, ইংল্যান্ড এবং ফ্রান্সের তুলনায় ছিল বহুদিক দিয়ে অত্যন্ত পিছিয়ে পড়া একটা দেশ। আধুনিক জাতীয়তার ধারণাটি পর্যন্ত জার্মানিতে তখন বিকাশ লাভ করেনি। দেশটি অনেকগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামান্তরাজ্যে বিভক্ত ছিল। এই

সামন্তরাজদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ কলহ-বিসংবাদের অন্ত ছিল না। ফ্রান্স এবং প্রাশিয়ার মধ্যে বিবাদের সময় সুযোগ বুঝে কেউ এ-পক্ষে কেউ ও-পক্ষে অংশগ্রহণ করে প্রতিবেশীর অকল্যাণ প্রয়াসে অধিকাংশ সময়েই তৎপর থাকতেন। জার্মানিতে ইংল্যান্ড এবং ফ্রান্সের মত সামাজিক বিকাশ প্রক্রিয়ার মধ্যদিয়ে একটা সুসংহত বুর্জোয়া সমাজ তখন পর্যন্ত আত্মপ্রকাশ করেনি। সুতরাং ইংল্যান্ড, ফ্রান্স এই ইউরোপের আরো কতিপয় দেশে যে দ্রুত সামাজিক পরিবর্তন সংসাধিত হচ্ছিল, সে তুলনায় জার্মানির পরিবর্তন প্রক্রিয়াটি ছিল অনেক বেশি শ্লথ এবং মন্থর গতিসম্পন্ন। কি ভাবাদর্শ, কি রাজনীতি, কি বিজ্ঞান সর্বক্ষেত্রেই সামন্ততন্ত্রের জগদ্দল শাসন ছিল সবরকমের অগ্রগতি এবং বিকাশের প্রধান অন্তরায়। এই সময়ে জার্মানির চিন্তা-ভাবনার অগ্রসর ব্যক্তিবৃন্দ একটা চূড়ান্ত মানস সংকটের সম্মুখীন হন। একদিক দিয়ে ইংল্যান্ড, ফ্রান্স এবং অন্যান্য ইউরোপীয় দেশের সাংস্কৃতিক প্রভাব এবং প্রবাহ—এগুলোকে তাঁরা যেমন অস্বীকার করতে পারছিলেন না, অন্যদিকে তেমনি সর্বান্তঃকরণ দিয়ে সেগুলোকে গ্রহণও করতে পারছিলেন না। তাই দেখা যায় ইউরোপীয়, বিশেষ করে বলতে গেলে, ফরাসি ভাবাদর্শ জার্মানিতে এসে অনেক সময় আধিভৌতিকতার ছদ্মবেশ ধারণ করতে বাধ্য হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, ফরাসি দেশে সমাজ-দর্শন সমাজ বিপ্লবের চালিকাশক্তির ভূমিকা পালন করেছে। কিন্তু সে দর্শন জার্মানিতে অনুপ্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই জনগণের স্পর্শলেশ-বর্জিত নিছক জ্ঞানচর্চার বিষয়বস্তুতে রূপান্তরিত হয়েছে। ফ্রান্স, ইংল্যান্ড ইত্যাকার দেশে বুর্জোয়ারাই ছিল সমস্ত কিছুর নিয়ামক শক্তি। কিন্তু জার্মানিতে সামন্ত দরবারসমূহই ছিল শিল্পকলা, বিজ্ঞান, দর্শনের মুখ্য পৃষ্ঠপোষক। তাই ইংল্যান্ড, ফ্রান্সের তুলনায় জার্মানির বিদ্বৎসমাজটির দৃষ্টিভঙ্গি ছিল গোঁড়া এবং রক্ষণশীল।

তাই বলে জার্মানির বিদ্বৎসমাজটির চেষ্টা-প্রযত্ন এবং সাধনা একেবারে বিফলে গেছে, একথা মনে করার কোনো কারণ নেই। জার্মান রক্ষণশীলতা এবং ইউরোপীয় প্রগতিশীল ধারণার মধ্যে যে সংঘাত ঘটেছে, তার ফলে গ্যোতের সমকালীন জার্মানিতে এমন কতিপয় ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব সম্ভব হয়েছে, পৃথিবীর যে কোন দেশ তাঁদের মত ব্যক্তিত্ব জন্ম দিতে পারলে সঙ্গত কারণেই গর্ব অনুভব করত। গ্যোতের কথা না হয় বাদই দিলাম। তিনি তো জ্বলন্ত সূর্যের মত প্রতিভা নিয়ে চরাচর আলো করে জেগে রয়েছেন। গ্যোতের সমসাময়িক প্রতিভার মধ্যে দার্শনিক হেগেল এবং শোপেনহাওয়ারের নাম করতে পারি। সংগীতে মোজার্ট এবং বেঠোফেনের কথা বলতে পারি। ভাষাবিজ্ঞানী শ্লেগেল ভ্রাতৃদ্বয়ের ভাষাতত্ত্বে অবদানের কথা স্মরণ করতে পারি। গ্যোতের কবিজীবনের সাথী দৃপ্ত-তরুণ শিলারের নাম উচ্চারণ না করে কি পারা যায়? সাহিত্য-সমালোচক হার্ডারের নামও শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারণ করতে হবে। এছাড়া ভিল্যান্ড, ক্লপস্টক, লেসিং কত আর নাম করব! এত গেল শুধু দিকপালদের কথা। এত সব মহৎ প্রতিভার জন্ম সম্ভব করে তুলেছে যে সকল ছোটখাটো, মাঝারি ও অনতিমহৎ ব্যক্তিত্ব, বর্তমান মুহূর্তে তাঁদের নাম উল্লেখ করার প্রয়োজন যেমন নেই, তেমনি অবকাশও নেই। প্রতিভার মধ্যে একটা অলোকসামান্য

ব্যাপার থাকে একথা সত্য। কিন্তু তারপরেও এটা অনেকটা অবধারিত যে ক্ষেত্রটি প্রস্তুত হওয়ার পূর্বে কোন প্রতিভা জন্মগ্রহণ করতেই পারে না। জার্মানিতেও গ্যোতের মত প্রতিভার জন্ম, সংবৃদ্ধি এবং বিকাশের ক্ষেত্রটি প্রস্তুত হয়েছিল। একথা বলা যায় গ্যোতে নিশ্চিতভাবে তাঁর দেশ এবং কালের সন্তান।

চার

গ্যোতের জীবনকথা বিবৃত করা আমাদের উদ্দেশ্য নয় এবং তার ক্ষেত্রও এ নয়। তথাপি তাঁর জীবন সম্পর্কে একটু ইঙ্গিত না দিলে গ্যোতের সৃষ্টিকর্মের বিষয়ে পরিচয় লাভ করা একরকম অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে। গ্যোতে জন্মেছিলেন ফ্রাঙ্কফোর্টের এক ধানাঢ্য পরিবারে। জন্ম ১৭৪৯ সালের ২৮ আগস্ট। তাঁর বাবার নাম য়োহান ক্যাস্পার গ্যোতে এবং মা এলিজাবেথ ক্যাথারিন। পিতা এবং মাতা কোনদিক থেকেই গ্যোতের পরিবার বনেদি অভিজাত ছিল না। তাঁর পিতামহ পেশায় ছিলেন দরজি এবং মাতামহ ফ্রাঙ্কফোর্ট শহরের পৌর-অধিকর্তা। বাবা ক্যাস্পার গ্যোতে ব্যবহারজীবীর পেশায় নিয়োজিত ছিলেন। গ্যোতে ছাড়া পরিবারে তাঁর একটি ছোট বোন ছিল। গ্যোতের মা এবং বাবার মধ্যে বয়সের যথেষ্ট ব্যবধান ছিল। মা এলিজাবেথ ক্যাথারিন অত্যন্ত চটপটে, প্রাণবন্ত, হাসিখুশি এবং আমুদে মহিলা ছিলেন। গ্যোতে পরবর্তী জীবনে অনেকবার তাঁর স্বতঃস্ফূর্ত প্রফুল্লতা মায়ের কাছে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া বলে উল্লেখ করেছিলেন।

অত্যন্ত শৈশবেই গ্যোতে কবিতা লিখতে আরম্ভ করেন। ফ্রাঙ্কফোর্টে বিভিন্ন উপলক্ষে অনুরুদ্ধ হয়ে বেনামিতে কবিতা লিখতেন। এক সময়ে একজনের হয়ে তার প্রেমিকার কাছে অনেকগুলো প্রেমপত্রও লিখে দিয়েছিলেন। নিতান্ত শৈশবেই বাড়িতে মুখোশ নাটকের অভিনয় দেখে তিনি এত আকৃষ্ট হন যে সারাজীবনে নাটকের নেশা তাঁর কাটেনি। প্রেমপত্র রচনা, কবিতা এবং নাটক লেখা এই তিনটি প্রধান দিক তাঁর বেবাক জীবনের প্রতিভার প্রকাশমাধ্যম হয়ে উঠেছিল এবং তিনটি বিষয়েরই হাতেখড়ি হয়েছিল অত্যন্ত বালক বয়সে।

গ্যোতের বাবা ক্যাস্পার গ্যোতে ছিলেন অত্যন্ত কড়া প্রকৃতির মানুষ। তিনি কঠোরভাবে নিয়মশৃঙ্খলা মেনে চলতেন এবং গ্যোতেকে সেভাবে গড়ে তুলতে চেষ্টার কোন ত্রুটি করেননি। যা হোক, গ্যোতে ১৭৬৫ সালে ফ্রাঙ্কফোর্টের লেখাপড়া শেষ করে লাইপসিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। সেখানে তিনি তিন বছর ছিলেন। গ্যোতে চরিত্রের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য এই সময়ে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। পরবর্তী জীবনে দেখা গেছে গ্যোতে যেখানে গেছেন, অথবা যে পরিবেশে অবস্থান করতেন, একেবারে সে পরিবেশের সঙ্গে পুরাপুরি মিশে যেতে পারতেন। লাইপসিক বিদ্যালয়ে অবস্থানের সময় তাঁর চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্যটি অত্যন্ত উজ্জ্বলভাবে পরিদৃশ্যমান হয়ে ওঠে। অসুস্থতার কারণে অধিককাল লাইপসিকে অবস্থান করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে। ১৭৬৮ সালের শেষের দিকে ফ্রাঙ্কফোর্টে পিতৃগৃহে ফিরে আসেন এবং দুবছর রীতিমত অবসর জীবনযাপন করেন। কিন্তু ১৭৭০ সালে তাঁকে আবার

পড়াশোনার জন্য স্ট্রাসবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতে হয়। সেখানে আইনশাস্ত্রের ওপর পড়াশোনা করেন। ডক্টর খেতাব অর্জন করতে না পারলেও ওকালতি করার সনদ লাভ করেন। তারপর ফ্রাঙ্কফোর্টে ফিরে এসে আইন-ব্যবসায় মনোনিবেশ করতে চেষ্টা করেন। একমাত্র পুত্রকে কুলপেশায় ফিরে আসতে দেখে তাঁর পিতা খুবই খুশি হন। আইন ব্যবসা গ্যোতেকে এক বছরের বেশি আটকে রাখতে পারেনি।

১৭৭২ সালে গ্যোতে ভেৎস্‌লারে বেড়াতে যান। সেখানে লোটে বাফ নাম্নী এক মহিলার প্রেমে পড়েন। জনৈক ক্যাস্‌নার নামক সরকারি কর্মচারির সঙ্গে লোটে বাফের বিয়ে হয়ে যায়। এতে তিনি এতই আঘাত পান যে আত্মহত্যার কথা চিন্তা করেছিলেন। সে আঘাত ভোলার জন্য 'ভের্থরের দুঃখ' শিরোনামে একটি বিয়োগান্ত উপন্যাস রচনা শুরু করেন। এই উপন্যাসটি প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই গ্যোতে রাতারাতি শুধু জার্মানিতে নয়, সমগ্র ইউরোপে বিখ্যাত হয়ে ওঠেন। বইটির প্রভাব তরুণদের ওপর এত অধিক মাত্রায় পড়ে যে বইটি প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জার্মানির তরুণদের মধ্যে আত্মহত্যার হিড়িক পড়ে যায়। বইটি অনেকগুলো ইউরোপীয় ভাষায় অনূদিত হয়। এমনকি জেনারেল নেপোলিয়ন (তখনো সম্রাট নন) পর্যন্ত মিশর অভিযানের সময় ওই বইটি সঙ্গে করে নিয়ে যান এবং আগ্রহসহকারে একাধিকবার পাঠ করেন। আরো জনশ্রুতি আছে যে চীন দেশের শিল্পীরা চীনা মাটির পাত্রের গায়ে ভের্থর উপন্যাসের নায়ক-নায়িকার ছবি এঁকে বাজারে বিক্রি করতেন। ১৭৭৩ সালে তিনি যখন এরফোর্টে অবস্থান করছিলেন, সেই সময়ে অনেকগুলো চমৎকার কবিতা রচনা করেন, 'ক্লাভিগো' নাটকটি লেখেন এবং 'এগমন্ট' লেখায় হাত দেন। 'ভের্থর'ও এই সময়ের। গ্যোতের জীবনে প্রেম একটা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। সব বয়সে সব ধরনের মহিলার প্রেমে তিনি পড়েছেন। তার মধ্যে কোনটা আসল, কোনটা প্রেমের ভণিতা, কোনটা পরিস্থিতিজনিত প্রেম বলা খুব সহজ নয়। সে যাহোক, ১৭৭৫ সালে লিলি শোয়েনম্যাসেন প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগ জন্মে। লিলিরাও ছিল ফ্রাঙ্কফোর্টের অধিবাসী। লিলিদের সঙ্গে গ্যোতে পরিবারের সৌহার্দ্যও মন্দ ছিল না। লিলি সবদিক দিয়ে গ্যোতের স্ত্রী হওয়ার যোগ্যা ছিলেন। পারিবারিক দিক থেকে আপত্তি উঠলে, লিলি গ্যোতেকে বিয়ে করে, তাঁর সঙ্গে আমেরিকা চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত পর্যন্ত গ্রহণ করেছিলেন। তবু গ্যোতের সঙ্গে লিলির বিয়ে শেষ পর্যন্ত হতে পারেনি।

১৭৭৫ সালে তিনি যখন সুইজারল্যান্ডে বেড়াতে গিয়েছিলেন, ফেরার পথে ভাইমারের ডিউক কার্ল আউগস্টের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। এই পরিচয়ের সূত্র ছিল অবশ্য জার্মান সাহিত্য। ডিউক তাঁকে ভাইমারে আসতে আমন্ত্রণ জানান। গ্যোতের বাবা তাঁর ছেলের জন্য অন্যকরম জীবন কামনা করতেন। তিনি কিছুতেই চাইতেন না তাঁর একমাত্র ছেলে একটি ক্ষুদ্র সামন্ত-রাজের অধীনে কাজ করুক। গ্যোতে কিন্তু ডিউকের নিমন্ত্রণ রক্ষার্থে ভাইমার গমন করেন। ডিউক আউগস্টের সঙ্গে তাঁর প্রগাঢ় বন্ধুত্ব হয়। তাঁরা একসঙ্গে খেতেন, শিকারে যেতেন, আমোদোল্লাস করতেন, এমন কি সময়ে সময়ে একসঙ্গে ঘুমাতেন পর্যন্ত। ১৭৭৬ সালে ডিউক কার্ল আউগস্টের

অধীনে মন্ত্রিপরিষদের সদস্য হিসেবে তিনি চাকরি গ্রহণ করেন এবং খনিজ সংক্রান্ত বিষয়ের দায়িত্ব তাঁকে দেয়া হয়। ভাইমারে আসার পরপরই শার্লোট ফন স্টেন নাম্নী জনৈক মহিলার প্রতি গ্যোতের প্রগাঢ় অনুরাগ জন্মে। এই মহিলার কাছ থেকেই গ্যোতে দরবারের আদবকায়দা রপ্ত করেন। ১৭৮৬ সালে ইতালি যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এই মহিলার প্রতি অনুরাগ একাগ্র এবং অখণ্ড ছিল। তাঁকে একবার বার্লিন যেতে হয়েছিল। বার্লিন যদিও জার্মানির প্রধান শহর, তথাপি লন্ডন কিংবা প্যারির মত বড় শহর ছিল না। গ্যোতে বড় শহর, অধিক লোকজনের হৈ-হল্লা-হট্টগোল সবসময়ে অপছন্দ করতেন। ১৭৭৯ সালে তাঁকে সমর পরিষদের সভাপতির দায়িত্ব প্রদান করা হয় এবং সেই সাথে একই সময়ে তিনি সড়ক এবং জনপথ বিভাগের দায়িত্বেও নিয়োজিত থাকেন। এই সময়ে তিনি গদ্যে 'ইফিগেনিয়া' নাটকটি রচনা করেন। ১৭৭৮ সালে তাঁকে সম্মানসূচক সামন্তের মর্যাদা প্রদান করা হয়। এই সময়ে তিনি অস্থিবিদ্যা চর্চার প্রতি মনোনিবেশ করেন। এতে তিনি মৌলিক আবিষ্কার করতে সক্ষম হন এবং তিনি Human or intermaxillare খণ্ডাস্থিটির অস্তিত্ব মানবশরীরে আবিষ্কার করেন। এই আবিষ্কারের পূর্ব পর্যন্ত ধারণা করা হত, এই খণ্ডাস্থিটি পশুর শরীরে আছে, কিন্তু মানবদেহে তার কোন অবস্থান নেই। গ্যোতের এই আবিষ্কারের ফলে সেই ভ্রান্ত ধারণার নিরসন হল। অস্থিবিদ্যার সাফল্যের পরে গ্যোতে গভীর অভিনিবেশ সহকারে উদ্ভিদবিদ্যার গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেন। বলতে গেলে কোন রকমের গবেষণার যন্ত্রপাতি ছাড়াই গ্যোতে শুধুমাত্র নিবিষ্ট পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে উদ্ভিদবিদ্যার ক্ষেত্রেও একটি মৌলিক আবিষ্কার করতে সক্ষম হন। তাঁর উদ্ভিদের রূপান্তর (Morphology of Plant) প্রস্তুকটিতে উদ্ভিদের রূপান্তর এবং বিকাশ বিষয়ে সম্পূর্ণ নতুন কথা বললেন। তিনি তাঁর সন্দর্ভে প্রকাশ করলেন যে গাছের যে কাণ্ড আমরা সচরাচর দেখে থাকি, আসলে তা পাতার ক্রমাগত বিবর্তনের মধ্যদিয়ে তৈরি হয়েছে। উপাদানগতভাবে বিচার করলে দেখা যাবে, গাছের কাণ্ড এবং পাতার মধ্যে কোন মৌলিক প্রভেদ নেই।

১৭৮৬ সালে ইটালিতে বেড়াতে যান এবং অনেকদিন সেখানে অবস্থান করেন। এই ভ্রমণ গ্যোতের জীবনের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ঘটনাসমূহের একটি। রোমে ফস্টিনা নাম্নী জনৈকা রোমান মহিলার সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে এবং অনেকদিন একই ছাদের তলায় এই মহিলার সঙ্গে তিনি বসবাস করেন। রোমে অবস্থানকালেই তিনি 'ইফিগেনিয়া' এবং 'এগমন্ট' নাটক দুটির কাব্যরূপ দেন। এরপরে রোমান কবি টাসসোর জীবনাবলম্বনে 'টাসসো' নাটকটি সমাপ্ত করেন। ইতালি ভ্রমণের পর গ্যোতে শরীরে-মনে একেবারে নতুন মানুষ হয়ে ভাইমারে ফিরে আসেন। ইতালি ভ্রমণের একটি বেদনাদায়ক দিক আছে। শার্লোট ফন স্টেনের সঙ্গে গ্যোতের যে উষ্ণ সম্পর্ক ছিল, ইতালি ভ্রমণের পর তাতে ভাটা নেমে আসে। পরবর্তী সময়ে এই ছিন্ন সম্পর্ক আর নতুন করে জোড়া লাগেনি। ইতালি থেকে ফিরে আসেন ১৭৮৮ সালে। এই সময়ে তিনি ডিউকের কাছে দৈনন্দিন রাজকার্যের ঝক্কি-ঝামেলা থেকে অব্যাহতি প্রার্থনা করেন। ডিউক তাঁর আবেদন মঞ্জুর করেন। এই একই সালে

খ্রিস্টিয়ানা ভালপিয়াসের সঙ্গে গ্যোতের পরিচয় হয়। ভালপিয়াস কোন সম্ভ্রান্ত বংশীয়া মহিলা ছিলেন না। ভালপিয়াস তাঁর ভ্রাতার জন্য একটি কর্মসংস্থানের আবেদনপত্র সহকারে গ্যোতের সঙ্গে দেখা করতে যান এবং গ্যোতের দৃষ্টিতে পড়েন। গ্যোতে তাঁকে সরাসরি বাড়িতে নিয়ে তোলেন। কোনরকমের আনুষ্ঠানিক বিবাহ ছাড়া তাঁরা একত্রে স্বামী-স্ত্রীর মত বসবাস করতে থাকেন। ভালপিয়াসের জন্য গ্যোতেকে ভাইমারে বহু সমালোচনা সহ্য করতে হয়েছে। যাহোক, ১৭৮৯ সালে ভালপিয়াসের গর্ভে গ্যোতের একমাত্র পুত্রসন্তান আউগস্ট জন্মগ্রহণ করে। তাঁর পাঁচ সন্তানের মধ্যে একমাত্র আউগস্টই বেঁচেছিল। ১৭৯০ সালের দিকে আট খণ্ডে গ্যোতে রচনাবলি প্রকাশিত হয়। এই বছর থেকেই বর্ধিত অনুরাগ সহকারে তিনি উদ্ভিদবিদ্যা এবং আলোকবিদ্যার গবেষণায় মগ্ন হয়ে থাকেন। এই সময়েই রং এবং রঞ্জনতত্ত্ব সম্বন্ধে ব্রিটিশ বিজ্ঞানী নিউটনের থেকে তিনি আলাদা মতামত পোষণ করতে থাকেন। উদ্ভিদবিদ্যা এবং অস্থিবিদ্যার মত আলোকবিদ্যায় গ্যোতের গবেষণা বিশেষ সাফল্য লাভ করতে পারেনি। পণ্ডিতরা একবাক্যে তাঁর ধারণা যথার্থ নয় বলে উড়িয়ে দেন। গ্যোতে শেষজীবন পর্যন্ত কিন্তু তাঁর ধারণায় অটল থাকেন।

১৭৯৪ সালটি গ্যোতের জীবনে এই কারণে গুরুত্ব বহন করে যে, এই বছরেই গ্যোতের সঙ্গে অপর একজন শক্তিমান জার্মান কবি শিলারের প্রগাঢ় বন্ধুত্ব হয়। গ্যোতে চেষ্টা-চরিত্র করে শিলারকে ভাইমারে নিয়ে আসেন এবং একজন অন্যজনের পরিপূরক হিসেবে সাহিত্যি সৃষ্টি করতে থাকেন। বাস্তবিকই শিলারের সংস্পর্শে এসে গ্যোতের কল্পনা নতুন একটি দিকে মোড় নেয়। এই সময়ে সম্পূর্ণ জার্মান বিষয়বস্তু নিয়ে সরল, গভীর এবং হৃদয়গ্রাহী 'হারমান অ্যান্ড ডরোথিয়া' নাটকটি তিনি রচনা করেন। গ্যোতে-শিলার বন্ধুত্বের আরেকটি ফসল হল সাময়িকপত্র 'ক্সেনিয়ন' প্রকাশ। এই পত্রিকার মাধ্যমে গ্যোতে ও শিলার একজোট হয়ে বিরুদ্ধবাদীদের আক্রমণ করতে থাকেন। শিলারের সঙ্গে পরিচিত হবার পরেই তিনি 'ভিলহেম মাস্টার্স এ্যাপ্রেন্টিশশীপ' উপন্যাসটি রচনায় হাত দেন।

১৮০৩ সালে তাঁর 'দ্যা ন্যাচারাল ডটার' গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৮০৫-এ কবি শিলারের মৃত্যু হয়। শিলারের মৃত্যুতে গ্যোতে ভয়ানক ভেঙ্গে পড়নে। ১৮০৬ সালে জেনার যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধের কারণে ভাইমার নেপোলিয়নের দখলে চলে যায়। এই যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে গ্যোতে তাঁর পুত্রের জননী খ্রিস্টিয়ানা ভালপিয়াসকে খ্রিস্ট ধর্মমতে বিবাহ করেন। ১৮০৭ সালে তাঁর অমর-কাব্যনাটক 'ফাউস্ট'র প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়। ১৭৭৩ সালের দিকে তিনি এ গ্রন্থটি রচনায় হাত দিয়েছিলেন এবং বিভিন্ন সময়ে কিছু কিছু অংশ শেষ করেন। ১৮০৮ সালে গ্যোতের সঙ্গে নেপোলিয়নের সাক্ষাৎ ঘটে। এই সাক্ষাতের ফলে দুই বিরাট ব্যক্তিত্বের মধ্যে একটা পারস্পরিক শ্রদ্ধা এবং বিস্ময়বোধ জন্ম লাভ করে।

১৮০৯ সালে গ্যোতে আত্মজীবনী রচনার কাজ শুরু করেন। ১৮১২ সালে নেপোলিয়ান রাশিয়া আক্রমণ করেন এবং এই একই বছরে গ্যোতের সঙ্গে অমর সঙ্গীতশিল্পী বেঠোফেন এবং প্রাশিয়ান সম্রাজ্ঞী লুডোভিকার সাক্ষাৎ ঘটে। ১৮১৬

সালে তাঁর পত্নীবিয়োগ হয়। ১৮১৯ সালে প্রকাশিত হয় 'দিওয়ান অব দ্যা ওয়েস্ট অ্যান্ড ইস্ট'। ইরানের কবি হাফিজের কাব্যকলার অনুসরণে অনেকটা প্রাচ্যরীতিতে গ্যোতে তাঁর দিওয়ান গ্রন্থটি রচনা করেন। কোলকাতা থেকে প্রকাশিত হাফিজের কাব্য সংগ্রহের ইংরেজি অনুবাদের জার্মান অনুবাদ পাঠ করেই গ্যোতে হাফিজের প্রতি আকৃষ্ট হন। অন্য একজনসহ মির্জা আবু তালিব হাফিজের এই ইংরেজি সংস্করণটির সম্পাদনা করেন। ১৯২১ সালে 'ভিলহেম মাস্টার্স এ্যাপ্রেন্টিসশীপ' উপন্যাসটির প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়। ১৮৩১ সালে বইটির দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয় এবং ১৮৩১ সালের ২৬ মার্চ তারিখে তাঁর জীবনাবসান ঘটে।

পাঁচ

বিশ্বের সাহিত্য, নন্দনতত্ত্ব এবং সামগ্রিক অর্থে চিন্তার বিকাশের ক্ষেত্রে গ্যোতের যেটুকু মৌলিক অবদান, তার বিষয়ে একটা মোটামুটি উপলব্ধিতে পৌঁছার জন্য গ্যোতে সমসাময়িককালে যে নন্দনতাত্ত্বিক চ্যালেঞ্জসমূহ গ্রহণ করেছিলেন সে সম্পর্কে একটা ধারণা প্রয়োজন। গ্যোতে যখন সাহিত্যে হাতেখড়ি গ্রহণ করেন, সেই সময়ে গোটা জার্মান মানসে 'ঝড়-ঝঞ্ঝার' অপ্রতিহত প্রতাপ। রুশোর চিন্তাধারা ফরাসি দেশে ফরাসি বিপ্লবের সহায়ক শক্তি হয়ে উঠেছিল। কিন্তু জার্মানিতে রুশো অপার ভাবাবেগের জাগ্রত বিগ্রহমূর্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন। জ্যাঁ জাক রুশো অপার সংবেদনশীলতাসহকারে মানব অনুভূতির গোপন ঘরে এমনভাবে আঘাত করতে পেরেছিলেন, যার ফলে অবরুদ্ধ ভাবাবেগ অনর্গল ধারায় ঝর্নার মত উছলে উঠেছে। রুশোর এই চরাচরপ্লাবী ভাবাবেগের বন্যার পেছনে যে একটা কঠিন সামাজিক প্রেক্ষিত বর্তমান ছিল, জার্মানির সৃজনশীল ব্যক্তিবৃন্দের মানসদৃষ্টির সামনে তার উপস্থিতি ছিল না বললেই চলে। জার্মান ভাষায় যাকে স্ট্রুম অ্যান্ড ড্রাং (ঝড়-ঝঞ্ঝা) এর কাল বলা হয়, তার প্রায় সবটুকুই ভাবাবেগের বাষ্পে আচ্ছন্ন। কঠিনভাবে চিন্তা করার বর্ণপরিচয় পর্যন্ত তখনো জার্মান সৃজনশীল ব্যক্তিবর্গের নাগালের বাইরে। 'ভের্থর' উপন্যাসটি গ্যোতেকে ইউরোপীয় খ্যাতি এবং পরিচিতি এনে দিয়েছিল একথা সত্য বটে, কিন্তু এ গ্রন্থেও ঝড়-ঝঞ্ঝার কালের লক্ষণসমূহ পুরোপুরি বর্তমান।

হার্ডারই প্রথম জার্মান চিন্তানায়ক যিনি দৃঢ় হাতে ভাববাষ্পের আবরণ সরিয়ে সাহিত্য-সংস্কৃতির বিষয়ে কঠিন যুক্তিশৃঙ্খলা প্রয়োগ করে চিন্তার ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। গ্যোতে প্রথম যৌবনেই হার্ডারের সংস্পর্শে এসেছিলেন। হার্ডারের প্রভাব তাঁর বোধবুদ্ধিকে অনেকদূর পর্যন্ত শাণিত করেছে, মনীষার দীপ্তিকে প্রখরতর করেছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। তিনি একজন মফস্বলবাসী জার্মান তরুণের দৃষ্টির সামনে বিশ্বের সাংস্কৃতিক প্রবাহসমূহের গতিপ্রকৃতি উপলব্ধিগোচর করে তুলেছিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তরুণের উর্বর মানসক্ষেত্রে সর্বজনীন প্রতিভা সম্পর্কিত ধারণাটিও গেঁথে দিতে পেরেছিলেন। হার্ডারের প্রভাব গ্যোতের সৃষ্টিশীলতার সামনে একটা লক্ষ্যপথ এবং একটা স্থির লক্ষ্য বেঁধে দিয়েছিল।

হার্ডারেরই অনুপ্রেরণায় গ্যোতে বিশ্বসংস্কৃতির প্রভাব সঞ্চারী মনীষীদের রচনা পাঠ, বিচার-বিশ্লেষণ করতে প্রবৃত্ত হন। ফরাসি বিপ্লবের রণরক্তের উগ্র উন্মাদনার যুগে অখণ্ড মনোযোগ এবং অনিদ্র অনুসন্ধানের মাধ্যমে তিনি গ্রিক চিরায়ত সাহিত্য পাঠ করেন, হোমারের মহত্ব উপলব্ধি করেন। সোফোক্লিস, ইউরিপিদিস প্রমুখ গ্রিক নাট্যকারের প্রকৃত শ্রেষ্ঠত্ব কোথায় সে বিষয়ে বিশদ জ্ঞান লাভ করেন। শুধু গ্রিস বা রোমের মনীষীদের মধ্যে তাঁর অনুসন্ধান সীমাবদ্ধ ছিল না। শেকস্‌পীয়র যে একজন অসাধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন স্রষ্টাপুরুষ এবং অনন্য একজন ব্যক্তিত্ব, এই ধারণা জন্মাতে অধিক সময়ের প্রয়োজন হয়নি। বস্তুত জার্মানিতে শেকস্‌পীয়রের নাট্যকলা জনপ্রিয় করতে যে কতিপয় ব্যক্তি অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন, গ্যোতে অবশ্যই তাঁদের একজন ছিলেন। শেকস্‌পীয়রকে তিনি কি চোখে দেখতেন, একটা উদ্ধৃতি থেকেই তা স্পষ্ট জানা যায়। তিনি বলেছিলেন, কোন সৃষ্টিশীল মানুষ বছরে একটার বেশি যদি শেকস্‌পীয়রের নাটক পাঠ করে তাহলে তার ধ্বংস অনিবার্য। অর্থাৎ কিনা তিনি বলতে চেয়েছিলেন, এই কালজয়ী প্রতিভার শিখায় তার অন্তর জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে।

একাগ্র শান্ত-সাহসসহকারে বিশ্বের সংস্কৃতিসমূহের প্রতি তিনি সানুরাগ দৃষ্টিপাত করেছিলেন। পারসিক সংস্কৃতির সঙ্গে তাঁর প্রগাঢ় পরিচয় ঘটেছে, হাফিজের কবিতায় তাঁর মরমী অন্তরের প্রতিধ্বনি শুনেছেন। অপার বিস্ময়সহকারে প্রাচীন হিন্দু সংস্কৃতির প্রতি মনোযোগী হয়ে উঠেছেন। ভারতীয় কবি কালিদাসের সৃষ্ট সৌন্দর্য প্রতিমা শকুন্তলার মাধুর্যে মোহিত হয়ে কবিতা লিখেছেন।

এই ব্যাপক পঠন-পাঠন আলোচনা-পর্যালোচনার মাধ্যমে তিনি একটা স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে সাহিত্য বা সংস্কৃতি কোন জাতি বিশেষের একক সম্পদ নয়। দুনিয়ার তাবৎ মানুষের অবদান একভাবে না একভাবে সমুন্নত সংস্কৃতিসমূহের মধ্যে জীবিত বা সুপ্ত অবস্থায় বিরাজমান রয়েছে। বস্তুত যে বিশ্বসাহিত্য শব্দবন্ধটি আমরা পৃথিবীর সাহিত্য সম্পর্কে প্রয়োগ করে থাকি, গ্যোতেই তা সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন। বিশ্বসাহিত্যের মত একটা বিশ্বধর্মের ধারণাও তাঁর মনে সতত ক্রিয়াশীল ছিল। খ্রিস্টানেরাই একমাত্র অনুগ্রহ-প্রাপ্ত জাতি বা সম্প্রদায় একথা তিনি বিশ্বাস করতেন না। সে যুগে ইহুদি সম্প্রদায় ছিল তৎকালীন ইউরোপে চরম সামাজিক ঘৃণার শিকার। কিন্তু গ্যোতে এই জাতির গুণপনা এবং সহনশীলতার প্রশংসা করেছেন অবলীলায়। তিনি প্রায়ই বলতেন, যেখানে মানুষের অন্তরের আকুতি ঊর্ধ্বদিকে উত্থিত হয় সেখানেই ভগবান আছেন। যে নামেই ডাকা হোক না কেন, সর্বত্র বিরাজমান সেই নির্মল সর্বনাম ভগবান অপার অনুগ্রহ মমতায় তাঁর সমস্ত মানব-সন্তানকে সর্বদা বেষ্টন করে বিরাজমান আছেন। ধর্মের বিভিন্নতা শুধু শব্দের বিভিন্নতা, তার মধ্যে কোন সারবস্তু নেই।

এ তো গেল গ্যোতের বিশ্বজনীনতার দিক। কিন্তু তিনি যে যুগে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, সে যুগের সম্ভাবনা এবং বিশেষ চারিত্র-লক্ষণসমূহ যেভাবে অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছিলেন, সে যুগের অতি অল্প ইউরোপীয় চিন্তানায়কই এই

নবযুগের লক্ষণসমূহ শনাক্ত করতে পেরেছিলেন। তিনি স্পষ্টত অনুভব করেছিলেন, অতীতকে আর নবজীবন দান করা যাবে না। অথচ বিশ্বাস করতেন মূল্যমানসম্পন্ন নবীন শিল্পকলা প্রাচীন উৎসের থেকেই সম্ভাবিত হয়। প্রাচীন উৎসের কাছে তাঁর ঋণ অপরিসীম সন্দেহ নেই। কিন্তু তিনি লিখেছেন নবযুগের জাগ্রত রস-পিপাসা মেটানোর প্রয়োজনে। তাঁর ক্ষেত্রে একটি কথা সত্য যে তিনি পুরনো আঙ্গিকটা পরিত্যাগ করতে পারেননি। সুতরাং প্রাচীন আঙ্গিকেই তাঁকে নতুন বস্তু পরিবেশন করতে হয়েছে। বালজাক প্রমুখ ফরাসি ঔপন্যাসিক যে সামাজিক বাস্তবতা উপস্থাপন করছিলেন রচনায়, গ্যোতের উপলব্ধিও সেই বহুতল বিশিষ্ট বাস্তবতার স্তর স্পর্শ করেছিল। ইতিহাসের মর্মবস্তুটিকে আপন স্বরূপে চিনে নেয়ার অসাধারণ সহজাত ক্ষমতা ছিল তাঁর। আসলে সমস্ত ইতিহাসই সাম্প্রতিকতম ইতিহাস, শুধু বিশেষ যুগের সমস্যার প্রকৃতিটিই বর্তমানের চাইতে ভিন্নরকম। সেজন্য তিনি মনে করতেন গ্রিকদের যুগে গ্রিক নাট্যকাররা মহৎ ছিলেন, শেকস্‌পীয়রের যুগে শেকস্‌পীয়রও গ্রিক নাট্যকারদের চাইতে কোন অংশে কম মহৎ ছিলেন না। মহৎ ব্যক্তিত্ব সন্ধান করার জন্য শেকস্‌পীয়র গ্রিসের কোন চরিত্র নির্বাচন না করে রোম সম্রাট জুলিয়াস সিজারকে বেছে নিয়ে উচিত কাজই করেছিলেন। তিনি বলেছেন আমাদের যুগের মহত্ব সন্ধান করার জন্য অতীত ইতিহাস পর্যালোচনা করে বিশেষ লাভ হবে না, নেপোলিয়নের মত ব্যক্তিত্ব দিয়েও মহৎ সৃষ্টি সম্ভব। তাঁর সমকালীন অন্যান্য প্রতিনিধত্বশীল লেখক এবং চিন্তানায়কদের তুলনায় এখানেই গ্যোতের অভিনবত্ব।

শিলারের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তিনি যখন জার্মান সাহিত্যে একটা দৃষ্টান্ত প্রতিষ্ঠা করতে এগিয়ে আসেন তখন কতিপয় যুগজনিত সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। জাতীয় সাহিত্য সৃষ্টির দাবি উঠতে থাকে জার্মানির সর্বস্থান থেকে। গ্যোতে এই জাতীয় সাহিত্য সৃষ্টির প্রশ্নে মন্তব্য করেন, জার্মানরা এখনো একটা জাতি হয়ে ওঠেনি, সুতরাং জাতীয় সাহিত্য সৃষ্টির কথা উঠতেই পারে না। ইংরেজ এবং ফরাসিদের যেমন একটা জাতীয় ইতিহাসের কাঠামো আছে, জার্মানদের তেমন নেই। সুতরাং জার্মানদের উচিত অন্যান্য জাতির যা কিছু ভাল সেগুলো বিনা সংকোচে গ্রহণ করা। তিনি নিজে একরোখা জাতীয় সাহিত্য সৃষ্টির অপপ্রয়াসের বদলে জার্মানির পরিচিত একটি লোককাহিনী নিয়ে সুদীর্ঘদিনের শ্রম এবং সাধনায় সর্বযুগের সর্বমানবের কাব্য 'ফাউস্ট' রচনা করেছেন। বস্তুত গ্যোতেই এখনো পর্যন্ত উল্লেখ করার মত একমাত্র প্রধান জার্মান কবি যাঁর অন্তরে জার্মান জাত্যাভিমানের লেশমাত্রও স্থান পায়নি।

ছয়

ভিন্ন ভাষার, ভিন্ন সংস্কৃতির কোন স্রষ্টাকে বুঝতে হলে, নিজের ভাষা এবং সংস্কৃতির আলোকেই তা অধিকতর সঠিকভাবে বোঝা সম্ভব। নিজের ভাষা এবং সংস্কৃতি সম্পর্কে একটি অন্তর্দৃষ্টি না জন্মালে অন্য সংস্কৃতির প্রাণরস উপলব্ধি করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। একটি সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের আওতাধীন কোন জিজ্ঞাসু ব্যক্তি যখন ভিন্ন সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের আওতাভুক্ত কোন মনীষী-পুরুষের সৃষ্টিকর্ম সম্বন্ধে পরিচয়

গ্রহণ করতে আগ্রহী হয়ে থাকেন, তখন তাঁকে আপন সংস্কৃতির সৃষ্টিশীল ব্যক্তিবর্গের সৃষ্টিকর্মের নিরিখেই ওই ভিন্ন ভাষা এবং ভিন্ন সংস্কৃতির সৃষ্টিশীল মনীষার বিচার বিবেচনা এবং পর্যালোচনার ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হতে হয়।

সেদিক দিয়ে বিচার করলে গ্যোতের সঙ্গে বাংলাভাষা এবং সংস্কৃতির প্রাণপুরুষ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটা তুলনামূলক বিচার অবশ্যই চলতে পারে। অবশ্য এ ব্যাপারে একটি প্রধান অসুবিধে রয়েছে। তা হল এই যে বাঙালি পাঠক অনেক ক্ষেত্রে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, কাজী নজরুল ইসলাম, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কিংবা মাইকেল মধুসূদন দত্তের সম্বন্ধে বিচারের যে মানদণ্ড গ্রহণ করে থাকেন, রবীন্দ্রনাথের সম্পর্কে বিচার-বিশ্লেষণেও ওই একই মানদণ্ড ব্যবহার করে থাকেন। তার ফলে রবীন্দ্রনাথের অনন্যতা কিন্তু যথার্থভাবে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে না। তবে রবীন্দ্র-প্রতিভার বিচার এবং মূল্যায়নের ক্ষেত্রে এটাও একটা পদ্ধতি বটে, সেকথা অস্বীকার করার উপায় নেই। কিন্তু ভিন্ন একটি মানদণ্ড প্রয়োগ করে ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতির মনীষী-পুরুষদের অবদানের সঙ্গে তাঁর অবদান পাশাপাশি রেখে বিচার না করলে বঙ্গসংস্কৃতি এবং সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের যে বিশেষ অবদান, সে ব্যাপারে একটা সম্যক ধারণা করা অসম্ভব হয়ে পড়বে।

সংস্কৃতি, দেশ-কাল, ভাষার বিভিন্নতার কথা বাদ দিয়ে প্রতিভার চারিত্র নির্ণয় করতে গেলে অনেকগুলো বিষয়ে গ্যোতের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মিল আপনিই ধরা পড়বে। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সর্বপ্রথম ব্যক্তি যিনি রবীন্দ্রনাথের কবিতায় স্বতঃস্ফূর্ত অসহ্য আনন্দের প্রকাশ দেখে তাঁর সঙ্গে গ্যোতের একটা মিল লক্ষ্য করেছিলেন। জীবনবৃত্তের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেও কতিপয় স্থূল দিক দিয়ে গ্যোতের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের জীবনের কতিপয় আশ্চর্য মিল অতি সহজেই প্রত্যক্ষ করা যায়। সেগুলোকে এভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে, জার্মান জাতীয়তার উত্থানের প্রাকমুহূর্তে জার্মানিতে গ্যোতে-প্রতিভার আবির্ভাব। অখণ্ড ভারত উপমহাদেশের ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হওয়ার অব্যবহিত পূর্ববর্তী সময়টিতেই রবীন্দ্রনাথ মৃত্যুবরণ করেন। উভয়েরই জন্ম ধনাঢ্য সংস্কৃতিবান মধ্যবিত্ত পরিবারে। উভয়েই সুদীর্ঘ জীবন লাভ করেছিলেন। দুজনেই ছিলেন প্রকৃত অর্থেই অদ্ভুতকর্মা পুরুষ। রবীন্দ্রনাথ এবং গ্যোতে ক্রমাগতভাবে রমণীর প্রেমে পড়েছেন। যদিও গ্যোতের প্রেম সরাসরি নারীপুরুষের দেহজ সম্পর্কের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত বলে ধরে নেয়া হয়, রবীন্দ্রনাথের প্রেম অনেক সময় নানা ছদ্মবেশ ধারণ করেছে। বোধকরি এটা ঘটেছে সামাজিক এবং সংস্কৃতিগত বিভিন্নতার কারণে। দুজনেই উগ্র দেশপ্রেমের ঘোরতর বিরোধী এবং বিশ্বমানববাদী। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে গ্যোতের যে দুটো বিষয়ে অধিক মিল বর্তমান তার একটি হল প্রতিভার বিভিন্নমুখীনতা এবং অন্যটি অফুরন্ত সৃষ্টিশক্তির প্রাচুর্য, যে কারণে গ্যোতে এবং রবীন্দ্রনাথ উভয়েরই অবদান বিপুল কলেবর ধারণ করে স্ফীত হয়ে উঠতে পেরেছে।

তাই রবীন্দ্র-প্রতিভার সঙ্গে গ্যোতে-প্রতিভার একটা মিল, একটা সাযুজ্য খুব সহজেই আবিষ্কার করা সম্ভব। বোধকরি এ কারণেই অনেকে রবীন্দ্রনাথকে সর্বাংশে

গ্যোতের সমকক্ষ একজন প্রতিভা মনে করতে কোন দ্বিধা বা কুণ্ঠা অনুভব করেন না। এর পেছনে অবশ্য কারণও রয়েছে। রবীন্দ্রনাথই প্রথম স্রষ্টাপুরুষ যিনি বাংলা সাহিত্যে সর্বপ্রথম বিমূর্ত সৌন্দর্যের প্রকাশ ঘটিয়েছেন, বাংলার মত একটি প্রাদেশিক ভাষাকে একটি বিশ্বভাষায় পরিণত করেছেন, বাংলা নাট্যকলা এবং চিত্রকলায় আধুনিক রীতিপদ্ধতি এবং রুচির বিকাশ সাধন করেছেন। তাছাড়া সর্বজনীন ভাব-অনুভূতি রবীন্দ্রসাহিত্যে এমনভাবে ফুটে উঠেছে যে অতি সহজেই তা বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে। বাংলার সঙ্গীতকলায় রবীন্দ্রনাথ একটি নিজস্ব রীতির উদ্ভাবনও করেছেন। খর্ব-আকাঙ্ক্ষা এবং ক্ষীণপ্রাণ বাঙালিদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের মত এমন একজন বিরাট ব্যক্তিত্বের আর্বিভাব হল, তা রীতিমত একটা বিস্ময়ের ব্যাপার। তাই বাঙালিরা স্বভাবতই রবীন্দ্রনাথের ব্যাপারে কোনরকম মূল্যচিন্তার তোয়াক্কা না করেই কবিগুরু, কবিসম্রাট, কবিসার্বভৌম ইত্যাদি ঢোলা ঢোলা অভিধায় তাঁকে চিহ্নিত করতে কোন রকম কুণ্ঠা অনুভব করেন্ না।

প্রতিভার আন্তপ্রকৃতি এবং চারিত্রের দিক দিয়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে গ্যোতের যথেষ্ট মিল পরিলক্ষিত হলেও, কতিপয় বিষয় অবশ্যই বিবেচনার মধ্যে আনতে হবে। রবীন্দ্রনাথ যে রকম সময়ে সময়ে আধিভৌতিক ভাবাবেগে তাড়িত হয়েছেন, গ্যোতের বেবাক জীবনের সৃষ্টিকর্মে সেরকম আধিভৌতিকতার লেশমাত্র স্পর্শও পরিলক্ষিত হয় না। গ্যোতে ছিলেন প্রকৃতির দিক দিয়ে অনেক বেশি বিজ্ঞাননিষ্ঠ। আর বিজ্ঞানে রবীন্দ্রনাথের রীতিমত কৌতূহল থাকলেও তিনি ঠিক বিজ্ঞানী ছিলেন না। আবার গ্যোতে চিত্রকর হয়ে ওঠার প্রচণ্ড প্রযত্ন সত্ত্বেও চিত্রকর হয়ে উঠতে পারেননি। শেষ পর্যন্ত তাঁকে চিত্রকলার সমঝদারই থেকে যেতে হয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথের তুলনায় গ্যোতে ছিলেন অনেক পরিমাণে নির্ভীক, সুস্থ এবং স্বাভাবিক মানুষ। মানুষ কি বলবে, সেটা তিনি কখনো পরোয়া করেননি। ভাল হোক মন্দ হোক, যা তিনি করতেন, সাহসের সঙ্গে করতেন। পাছে লোকে কিছু বলে সে কথা ভেবে বিব্রত হতে তাঁকে কখনো দেখা যায়নি। আন্তরিক সততা এবং সাহসের কারণে জীবনে যা ঘটেছে, যা করেছেন, তার অনেকটাই তাঁর আপন মুখে চোখের জলে প্রকাশ করতে কখনো বাধেনি। 'আমি ভাল হব, মন্দ হব, প্রকৃতির মত হব' এ কথা রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে প্রযোজ্য হতে পারে না। রবীন্দ্রনাথের জীবন যেমন তেমনি তাঁর সাহিত্যও গ্যোতের তুলনায় ভেতর থেকে হয়ে ওঠা যতটা, ততটা বানিয়ে তোলা। গ্যোতের মধ্যে নিখাদ সত্যের পরিমাণ অনেকটা বেশি। রবীন্দ্রনাথেও সত্য আছে, তবে তাতে গিল্টির পরিমাণও যথেষ্ট। গ্যোতের রচনার দাহিকাশক্তি রবীন্দ্রনাথের চাইতে অনেক বেশি। রবীন্দ্রনাথ ধর্মের সঙ্গে সাহিত্যের সামঞ্জস্য ঘটাতে চেয়েছিলেন। আর গ্যোতে সাহিত্যের সঙ্গে বিজ্ঞানের মেলবন্ধন ঘটিয়েছিলেন। তাই উভয়ের বাস্তব বিশ্লেষণ এবং নিরীক্ষার প্রকৃতি এক নয়। রবীন্দ্রনাথ যখন বাস্তবতাকে কামড়ে ধরতে গেছেন, আধিভৌতিকতা তাঁকে বারবার সরিয়ে নিয়ে গেছে। এ কারণে রবীন্দ্রনাথে ভণিতার পরিমাণ অধিক।

রবীন্দ্রনাথ এবং গ্যোতের গোটা পরিপ্রেক্ষিতটা বিচার না করে একতরফাভাবে বিচার করলে অবশ্যই তা একমুখী হতে বাধ্য। রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় সমাজের

প্রতিনিধিত্ব করেছেন, গ্যোতে করেছেন জার্মান তথা ইউরোপীয় সমাজের। রবীন্দ্রনাথের মেকিত্ব তাঁর সমাজের মেকিত্বেরই সাহিত্যিক রূপায়ণ। তথাপি বাংলা-সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের যে অবদান জার্মান-সাহিত্যে গ্যোতের অবদানের তুলনায় তা কিছু পরিমাণে কম নয়। গ্যোতের সমসাময়িক কালে জার্মান ভাষা, বিজ্ঞান, দর্শন এবং কলাবিদ্যার অন্যান্য শাখায় যথেষ্ট পরিমাণে পরিপুষ্টি লাভ করেছে। জার্মানিতে দার্শনিক হেগেল, কান্ট এবং শোপেনহাওয়ার জন্মগ্রহণ করেছেন। সঙ্গীতে বেঠোফেন এবং মোজার্ট এসে গেছেন। সঙ্গীতের অপর দুই প্রতিভা বাক, হেন্ডেল তাঁদের সাধনার ললিত মধুর অথচ দীপ্ত ধারাটি তারও আগে রচনা করে গেছেন। বিজ্ঞানের আরো নানা শাখায় যথেষ্ট সাধক আত্মাহুতি দিয়ে যাচ্ছেন এবং তাঁদের সকলের অবদানের প্রকাশমাধ্যম জার্মান ভাষা। বাইবেল অনুবাদ এবং ধর্মতত্ত্ব প্রচারের বাহন হিসেবে ব্যবহার করে মার্টিন লুথার জার্মান গদ্যরীতির বহু পূর্বেই পেশীবহুল একটা কাঠামো নির্মাণ করে গিয়েছিলেন।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের পেছনে কি ছিল? রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সর্বসাকুল্যে এই তো রবীন্দ্রনাথের মূলধন। জ্ঞানবিজ্ঞানের নানা শাখার অনুসন্ধান এবং গবেষণার দান বাংলাভাষার মাধ্যমে প্রকাশ করা দূরে থাকুক, বাঙালি এলিটরা ব্যক্তিগত চিঠিপত্র পর্যন্ত বাংলাতে লিখতে লজ্জাবোধ করতেন। রবীন্দ্রনাথের এই তেজারতিতে এত অল্প মূলধনে কত বেশি লাভ হয়েছে তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ আজকের দিনের বাংলাভাষাটি। একটি প্রাদেশিক ভাষাকে সারাজীবনের সাধনায় একটি বিশ্বভাষার স্তরে উন্নীত করা— এটা কি কম শ্লাঘার বিষয়? অন্তত আমাদের পৃথিবীতে তার অন্যকোন নজীর নেই। তাই গ্যোতের প্রতিভার তুলনায় রবীন্দ্রপ্রতিভা যতই অস্পষ্ট এবং ঝাপসা মনে হোক না কেন, বাংলাভাষার ক্ষেত্রে এবং বাঙালি রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে যে বিপুল পরিমাণ ঋণ গ্রহণ করেছে, এককথায় তাকে অন্তহীন বললে খুব বেশি বলা হবে না।

সাত

রবীন্দ্রনাথ আশি বছর বয়সে ফাউস্ট পড়ার জন্য নাকি জার্মান ভাষা শিখেছিলেন। কথাটি কতদূর সত্য বলা একটুখানি মুশকিলের ব্যাপার। মোটের উপর কথাটি যদি সত্যও হয়ে থাকে, অবাক হওয়ার কিছু নেই। রবীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের মত কাজই করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের মত একজন বিরাট পুরুষের পক্ষে আশি বছর বয়সে জার্মান শিখে পড়বার মত একটি গ্রন্থ বটে 'ফাউস্ট'। রাশিয়ান কবি পুশকিন এই ফাউস্টকে একটি আধুনিক 'ইলিয়াড' বলে উল্লেখ করেছিলেন।

মানবজীবনের উচ্চতা, গভীরতা, পাপ-পুণ্য, প্রেম, দেহজ কামনা, ক্ষমতার মোহ, মানবিক উদ্যম, আত্মবিনাশী ধ্বংসশীল প্রেরণা, জ্ঞানতৃষ্ণা সবকিছু কবি এই গ্রন্থে এমনভাবে প্রতিভাসিত করে তুলছেন যে বিস্ময়ে থ মেরে যেতে হয়। সামাজিক মানুষের সম্মিলিত জীবনপ্রবাহের এই যে বিশাল বিরাট শোভাযাত্রা, এই অন্তহীন সংঘাত, জীবনধারণের এই অতৃপ্তি, জীবনানন্দ দাশের ভাষায়, 'আমাদের অন্তর্গত

রক্তের ভেতরে যে বিপন্ন বিস্ময় খেলা করে, তার এমন হার্দ্য-মধুর বিষাদ-মাখানো চিত্রলেখা এই কাব্য; যুগান্তরের মুখে নতুন অর্থময়তার দীপ্তিতে জ্বলা এবং নতুন ব্যঞ্জনায় ব্যঞ্জিত হয়ে ওঠার ক্ষমতা রাখে। ফাউস্ট কাব্য, আবার নাটকও বটে, কিন্তু এটা হল আঙ্গিকের বিষয়। কিন্তু কাব্যের মধ্যদিয়ে প্রবাহিত হয়েছে নানা জটিলতাযুক্ত মন্ময় মানুষের অনিঃশেষ হৃদয়াবেগ। এই কাব্যকে মানব মনের একটি স্বচ্ছ আর্শি বলে অভিহিত করা হলে একটুও অন্যায় করা হবে না। গ্যোতে তাঁর সমসাময়িককালে যে সমস্ত জিজ্ঞাসার আবেগে তাড়িত হয়েছিলেন, যে গভীর ক্ষুধা তিনি সর্বসত্তা দিয়ে অনুভব করেছিলেন, এই গ্রন্থে তার সবকিছুর উত্তর দিতে চেষ্টা করেছেন।

'ফাউস্ট' নাটকের মধ্যে গ্যোতে একটা ক্ষুদে ব্রহ্মাণ্ড তৈরি করেছেন। ব্রহ্মাণ্ডে যা কিছু আছে, যা কিছু থাকতে পারে, 'ফাউস্ট' ভাণ্ডে তা অবশ্যই আছে। এটা এমন সমুন্নত মহিমার অধিকারী, এমন আশ্চর্য একটা গ্রন্থ, যে গ্রন্থের ছত্রে-ছত্রে পবিত্র অগ্নি বিকিরিত হয়েছে, যুগে যুগে পতঙ্গের মত ভাবুকচিত্ত তার প্রতি অমোঘ আকর্ষণ অবহেলা করতে পারেনি। 'ফাউস্টে' চিরন্তন মানবিক সমস্যাসমূহের এমন আশ্চর্য উদ্ভাসন ঘটেছে, যে অপার কাব্য-কুশলতা যে উদার আকাশবিহারী কল্পনার শব্দময় পক্ষধ্বনি গুঞ্জরিত হয়ে উঠেছে, পৃথিবীর সাহিত্যে তার তুলনা কোথায়? শেকস্‌পীয়র বিরাট বটে, মহৎ বটে, কিন্তু অত যত্নচর্চিত মননশীলতা, অত তীব্র প্রখর দহন-বেদনা শেকস্‌পীয়রে কোথায়? ফাউস্টের পাশাপাশি শেকস্‌পীয়রের নাটকগুলো বিচার করলে শেকস্‌পীয়রকে মনে হবে অতিপ্রাকৃত ক্ষমতাসম্পন্ন দেবতার মত একজন মানুষ। সর্বত্র তাঁর অবারিত গতায়াত, তার জন্য কোন কষ্ট, চেষ্টা কিংবা যত্ন-শ্রমের প্রয়োজন নেই। শেকস্‌পীয়রে সবকিছু আপনি হয়ে ওঠে। কিন্তু গ্যোতের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা একটু অন্যরকম। এখানে তিনি বিপুল পরিমাণ শ্রম, অভিজ্ঞতা এবং অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের সাহায্যে একটু একটু করে সমস্তটা ঘটিয়ে তোলেন।

ফাউস্টকে এ পর্যন্ত নাটক বা কাব্য হিসেবে যেমন দেখা হয়েছে, তেমনি একে একটি জ্ঞানগর্ভ পুস্তক বলেও ধরে নেয়া হয়েছে। দুই খণ্ডে 'ফাউস্ট' গ্রন্থটি সমাপ্ত করতে মহাকবির লেগেছে প্রায় পঞ্চাশ বছরেরও অধিককাল সময়। এই গ্রন্থ রচনায় যখন হাত দিয়েছিলেন তখন তাঁর বয়স ছিল চব্বিশ-পঁচিশ বছর। প্রথম খণ্ড শেষ করতে তিরিশ বছরের অধিক সময় লেগে যায়। দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশ করতে প্রায় আরো তিরিশ বছর সময় অতিবাহিত হয়ে যায়। একচোটে তিনি এ গ্রন্থটি রচনা করেননি। মোটামুটি মনের ভেতর গোটা বিষয়টা সাজিয়ে তিনি অংশ-অংশ করে লিখেছেন। মধ্যের অংশ প্রথমে রচনা করেছেন, তারপর শেষের অংশ, তারপর প্রথম অংশ। এইভাবে কতবার অদলবদল করেছেন, কতবার কপি করেছেন, তার কোন ইয়ত্তা নেই। তরুণ বয়সে 'উয়র ফাউস্ট' (Ur Faust) বা 'আদি ফাউস্ট' গ্রন্থটি রচনা করেছিলেন। মূল সমস্যার প্রকৃতিটি এখানে তুলে ধরা হয়েছিল। এই আদি ফাউস্টকে কেন্দ্রবিন্দু ধরে নিয়ে শাখা, প্রশাখা, পত্রপুষ্প, শেকড়, কাণ্ডে বিকশিত হয়ে বর্তমান দুই খণ্ড ফাউস্টের আকার ধারণ করেছে। তীক্ষ্ণ মেধা এবং মননশক্তিসম্পন্ন

সমালোচকবৃন্দ কত মানদণ্ড এবং দৃষ্টিকোণ প্রয়োগ করে এই গ্রন্থের আলোচনা সমালোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন তা বলে শেষ করার নয়। তথাপি এই গ্রন্থ অদ্যাবধি পুঞ্জীভূত রহস্যের আধারই রয়ে গেছে। এই গ্রন্থ সম্পর্কে চূড়ান্ত কথা কেউ বলতে পারেননি। ধর্মতাত্ত্বিকদের দৃষ্টিতে এই গ্রন্থ ধর্মপুস্তকের মর্যাদা বহন করে, সংশয়বাদী এই গ্রন্থে তাঁর মতামতের মর্মরিত প্রতিধ্বনি শুনতে পান, নাস্তিক্যবাদী তাঁর বিশ্বাসের রক্ষাকবচ হিসেবে এবং বিজ্ঞানী তাঁর সন্ধানপ্রক্রিয়ার যুক্তিনিষ্ঠ শৃঙ্খলার প্রতীক হিসেবে এই গ্রন্থকে বিচার করে থাকেন। এই গ্রন্থের অন্তরে এমন কিছু রয়েছে যার ফলে সকলে আপনাপন অভীষ্টের সন্ধান পেয়ে যান।

অথচ একথা সত্য যে, ফাউস্ট গ্যোতের কল্পনাবলে উদ্ভাসিত কোন চরিত্র নয়। গ্যোতের জন্মের বহু পূর্ব থেকেই জার্মানিতে নাটকের কাহিনীটি রূপকথার আকারে প্রচলিত ছিল। শেকস্‌পীয়রের পূর্ববর্তী ইংরেজি সাহিত্যের আর একজন পারঙ্গম কবি মার্লো এই কাহিনীটি অবলম্বনে 'ডক্টর ফস্টাস' নামে একটি নাটক লিখেছিলেন। এটি ইংরেজি সাহিত্যে একটি বিশিষ্ট নাটক। গ্যোতের জন্মের প্রায় দু'শ বছর আগে মার্লো জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ইংরেজি সাহিত্যে এই কাহিনীর ওপর ভিত্তি করে একটি নাটক আছে সে খবর গ্যোতে জানতেন না। রূপকথাটিতে যে সমস্যাটি বিবৃত হয়েছিল, তাই-ই গ্যোতেকে অভিভূত করেছিল। ডক্টর ফস্টাসের গল্পটি জার্মানিতে বহু আগে থেকেই প্রচলিত ছিল। এই ফস্টাস প্রথমে ধর্মতত্ত্বের অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিল। একসময় ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে তার মনে সংশয় দেখা দেয়। এই সংশয়ের পথ ধরেই শয়তান তার কাছে উপস্থিত হয়। শয়তান এবং তার মধ্যে এক চুক্তি হয়। এই চুক্তির শর্ত ছিল শয়তান তার হাতে জাগতিক কর্ম-সম্পাদনের জন্য অপার ক্ষমতা প্রদান করবে, পরিবর্তে পঁচিশ বছর পরে শয়তান তার শরীর থেকে আত্মা ছিনিয়ে নেবে। শয়তানের কাছে আত্মা বিক্রয় করে ডক্টর ফস্টাস অসীম ক্ষমতার অধিকারী হয়। অনেক দুরারোগ্য রোগীকে আরোগ্য করে, অনেক অসম্ভব কাজ সম্ভব করে তোলে। অনেক রাজা, মহারাজা এবং বিখ্যাত ব্যক্তি ফস্টাসের অনুরাগী হয়ে পড়ে। কোন কোন রাজপুরুষ ডক্টর ফস্টাসকে অসম্মান দেখালে ফস্টাস তাদের মস্তকে যাদুক্রিয়ার বলে শিং গজিয়ে দিয়ে ভয়ঙ্করভাবে নাজেহাল করে। একবার গরম মৌসুমে এক ডিউক পত্নীর আঙুর খাওয়ার ইচ্ছা জন্মালে, ডক্টর ফস্টাস তাঁকে তাজা সুমিষ্ট আঙুর প্রদান করে অবাক করে দেয়।

শয়তানের সহায়তায় ডক্টর ফস্টাসের ক্ষমতা এতদূর বৃদ্ধি পায় যে ফস্টাস রোমে পোপের প্রাসাদে গমন করে পোপকে নানাভাবে নাজেহাল করে। শুধু রোমের পোপ নয়, কনস্টান্টিনোপলের সুলতানও এই ডক্টর ফস্টাসের হাতে অপরিসীম নিগ্রহ ভোগ করেন। সে সুলতানের হারেমে প্রবেশ করে সুলতানের বেগমদের সঙ্গে সহবাস পর্যন্ত করে।

এতসব বিচিত্র কাণ্ড সমাপনান্তে পঁচিশ বছর পার হয়ে গেল। পঁচিশ বছরের শেষের দিনটিতে ডক্টর ফস্টাস তার পরিচিত বন্ধু-বান্ধবদের একটি সরাইখানায় নিমন্ত্রণ করে উৎকৃষ্ট রকম আহার্যসামগ্রী এবং দামি সুরা সরবরাহ করল। খেতে

খেতে, পান করতে করতে ডক্টর ফস্টাস আনুপূর্বিক তার জীবনের সমস্ত কাহিনী বর্ণনা করল এবং আরো জানাল আজ তার জীবনের অন্তিম রাত। এই রাতে শয়তান চুক্তি মোতাবেক তার শরীর থেকে আত্মা ছিনিয়ে নেবে। ফস্টাস তার কৃত পাপকর্মের প্রতিফলন ভোগ করতে যাচ্ছে। তাই রাতে যদি হঠাৎ আগুন জ্বলে ওঠে, বিকট আওয়াজ হয় এবং সদম্ভ হুঙ্কারে বজ্রের দল চিৎকার করতে থাকে কেউ যেন ভয় না পায়। সত্যি সত্যি মধ্যরাতের দিকে আগুন জ্বলে উঠল, প্রচণ্ড শব্দে সরাইখানার কক্ষগুলো প্রকম্পিত হল, আকাশ থেকে বজ্র ঝরে পড়ল। তারপর অবস্থা শান্ত হলে সরাইখানার সমস্ত অতিথি ডক্টর ফস্টাসের কক্ষে এসে দেখে তাঁর সারা শরীর থেতলে গেছে এবং মাংসপিণ্ড এখানে ওখানে ইতি-উতি ছড়ানো রয়েছে। এই কাহিনী অবলম্বনে ইংরেজ নাট্যকার মার্লো প্রথমে 'ডক্টর ফস্টাস' নাটক রচনা করেন। মার্লো অসাধারণ ক্ষমতাশালী নাট্যকার ছিলেন, এই নাটকটি বেশ জনপ্রিয়তাও অর্জন করেছিল। কিন্তু তিনি ডক্টর ফস্টাসের রূপকথাটি নাটকীয় প্রয়োজনে অদলবদল করে কেটেছেঁটে নিয়েছিলেন। তাই মূল কাহিনীর সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে দেখা যাবে, মার্লো ডক্টর ফস্টাসের জামাকাপড়ের নিখুঁত ছবি পরিবেশন করতে পারলেও তার আত্মাটি স্পর্শ করতে পারেননি।

গ্যোতের ফাউস্ট মার্লোর তুলনায় জার্মান রূপকথার কাঠামোটির অনেক বেশি অনুগত। এই কাঠামোকে অনেকটা অবিকৃত রেখেই গ্যোতে ফাউস্ট নাটক রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। বাহুল্যবোধে আমরা নাটকের আখ্যান অংশটি বর্ণনা থেকে বিরত থাকলাম। ফাউস্ট প্রথম খণ্ডের অনুবাদটি পড়লে পুরো বৃত্তান্তটি জানতে পারবেন। ফাউস্ট প্রথম খণ্ডের তুলনায় দ্বিতীয় অংশে বেশি শক্ত, সমৃদ্ধ এবং দার্শনিক জিজ্ঞাসায় পরিপূর্ণ। কিন্তু দ্বিতীয় খণ্ড সম্পর্কে কোন কথা বলার অধিকার উপস্থিত মুহূর্তে বর্তমান নিবন্ধকারের নেই। এই খণ্ডটি সম্পর্কে তাৎপর্যপূর্ণ কিছু বলার জন্য সুদীর্ঘ সময়ের পঠন-পাঠন এবং চিন্তার যে পরিশ্রুতি প্রয়োজন তার কোনটাই বর্তমান নিবন্ধকারের আওতার ভেতরে নেই। তাই একান্ত অনিচ্ছায় আলোচনা প্রথম খণ্ডের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতে হচ্ছে। ফাউস্ট নাটকের প্রথম খণ্ডটি গ্রেচেন ট্র্যাজেডি হিসেবেও পরিচিত। একটি অবলা সরলা বালিকার গভীর প্রেমের মর্মান্তিক পরিণতি এই অংশের প্রধান উপজীব্য হয়ে উঠেছে। গ্রেচেন চরিত্রটি গ্যোতের একটি অমর সৃষ্টি। শেকসপীয়রের 'হ্যামলেট' নাটকের ওফেলিয়ার মনে যে আবেদন সৃষ্টি করে, গ্রেচেন চরিত্রও অনুরূপ ভাবাবেগ জন্ম দিতে সক্ষম। কোন কোন দিক দিয়ে ওফেলিয়ার চাইতে গ্রেচেন চরিত্রটি অনেক বেশি সুগঠিত, পরিপূর্ণ এবং বিকশিত মনে হওয়া একটুও অস্বাভাবিক নয়। এই গ্রেচেন চরিত্রের মধ্যে গ্যোতের প্রথম জীবনের এক প্রেমিকার ছায়াপাত ঘটেছে বলে সমালোচকেরা মনে করেন।

ফাউস্ট নাটকের প্রথম অংশে গ্রেচেন ছাড়া অপর দুই প্রধান চরিত্র হল ফাউস্ট এবং মেফিস্টোফেলিস। ফাউস্ট হচ্ছেন সংশয়-সন্দেহে দোলায়মান একজন পণ্ডিত। তার মনে প্রবল অন্তর্দ্বন্দ্ব একদিকে পৃথিবীর আনন্দ-সুখ সবকিছু দুহাত ভরে ভোগ করতে চান, অন্যদিকে জীবনের নশ্বরতা এবং ত্যাগের বাণী তাঁর অন্তরাত্মার

হাহাকারের ঝড় সৃষ্টি করে। ফাউস্টের মনে যে ব্যাকুলতা তা অনেকেই গ্যোতের নিজের মনের ব্যাকুলতা বলে মনে করে থাকেন। গ্যোতে গোটাজীবন ধরে যে জিজ্ঞাসার হুলে দংশিত হয়েছেন, ফাউস্ট চরিত্রের মধ্যদিয়ে তাঁর প্রশ্নভার জর্জরিত ব্যথাদীর্ণ মানসের ছবিটি ফুটিয়ে তুলেছেন। এই নাটকের অপর প্রধান চরিত্র মেফিস্টোফেলিস। বাইবেল কথিত শয়তানের আরেক নাম মেফিস্টোফেলিস বলে ধরে নেয়া হয়। কিন্তু গ্যোতের মেফিস্টোফেলিস বাইবেলোক্ত শয়তান বা রূপকথার মেফিস্টোর চাইতে সম্পূর্ণ আলাদা ব্যক্তি। কারো কারো মতে, গ্যোতের প্রথম যৌবনের সাহিত্যগুরু হার্ডারের চরিত্রের অনুকরণে তিনি মেফিস্টোফেলিস চরিত্রটি সৃষ্টি করেছেন। আবার কেউ কেউ মনে করেন, আসলে মেফিস্টোফেলিস এবং ফাউস্ট উভয়েই গ্যোতের আপন সত্তার দুটি আলাদা অংশবিশেষ। সমাজবিজ্ঞান নির্ভর সাহিত্য-সমালোচকরা গ্যোতের মেফিস্টোকে আধুনিক যন্ত্রসভ্যতা এবং বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থার প্রতীক বলে ব্যাখ্যা করে থাকেন। কেননা মেফিস্টো যন্ত্রবিজ্ঞানের প্রসার ঘটিয়ে মানব-সমস্যার সমাধান দিতে পারে, কাগজের মুদ্রার প্রচলন করে জনগণের দৈনন্দিন চাহিদা মেটাতে পারে। এই নাটকে পৃথ্বিআত্মার অবতারণা গ্যোতের এক অভিনব পরিকল্পনা। এই পৃথ্বিআত্মা আসলে কোন শক্তির প্রতীক তা আজ পর্যন্ত অনেকটা অনির্ণীতই থেকে গেছে। মহাকবির মনের কি গূঢ় অভিলাষ ছিল কে বলতে পারে? তবে বেশিরভাগ সমালোচকই মনে করে থাকেন এই পৃথ্বিআত্মাকে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎসস্থল হিসেবে প্রতিষ্ঠা দেয়াই ছিল মহাকবির উদ্দেশ্য।

মধ্যযুগের অবসানের পূর্বলগ্নে সমকালীন ইউরোপীয় তথা জার্মান সমাজের গোটা প্রতিচ্ছবিটিই এই নাটকে ফুটে উঠেছে। যাদুমন্ত্র-তুকতাক সবকিছুই সেই সময়ের নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার ছিল। গ্যোতে শুধু নিহিতার্থের মধ্যে তাতে নতুন একটা মাত্রা সংযোজন করেছেন মাত্র। বিশ্বাস আর সংস্কার সবকিছুই গ্যোতে এই নাটকের প্রয়োজনে ব্যবহার করেছেন। 'ডাইনির রসুই ঘর' বা 'ভাল পুর্গিস রজনীর স্বপ্ন' দুটি অনিবার্য নাটকীয় প্রয়োজনে সৃষ্টি করা হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু মধ্যযুগে সত্যি সত্যি এ বিশ্বাস বলবৎ ছিল যে ডাইনিরা সঞ্জীবনী রস পান করিয়ে বৃদ্ধের শরীরে নবযৌবনের সঞ্চার করতে পারে। মধ্যযুগে এ বিশ্বাসও সক্রিয় ছিল যে ক্রমাগত পরিশোধনের মাধ্যমে অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট ধাতুকেও সোনায় পরিণত করা যায়। ইউরোপ এই সাধনার পদ্ধতিটি আরবদের কাছ থেকে গ্রহণ করেছিল। পরবর্তীকালে এই কিমিয়া শাস্ত্র থেকেই কেমিস্ট্রি শাস্ত্রটির উৎপত্তি। গ্যোতে তাঁর নাটকের চরিত্রের পূর্ণতাদানের উদ্দেশ্যে আচার, সংস্কার, সাধনার গোপন-গহন রীতি সবকিছুও ব্যবহার করেছেন অবলীলায়।

'ভালপুর্গিস রজনীর স্বপ্ন' দৃশ্যটিতে অনেক বেশি অবাস্তব বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে। নাটকের প্রয়োজনীয়তার দিক দিয়ে বিচার করলে অবশ্যই বোঝা যাবে, পরের দৃশ্যে গ্রেচেনের যে শোচনীয় পরিণামের মুখোমুখি ফাউস্টকে দাঁড়াতে হবে, সেই হৃদয়-বিদারক দৃশ্যের সম্মুখীন হওয়ার জন্য ফাউস্টকে মানসিক দিক

দিয়ে তৈরি করার আকাঙ্ক্ষার তাগিদে এই দৃশ্যটি সংযোজন করেছেন। কিন্তু একটা লোকবিশ্বাস প্রচলিত ছিল যে বছরের একটা বিশেষ দিনে ডাইনিরা হার্টজ পর্বতে মিলিত হয়ে রঙ্গরস লীলা লাস্যের যথেচ্ছাচার চালাত। অন্য একজন দ্বিতীয় শ্রেণীর লেখকের হাতে পড়লে এটা একটা গাঁজাখুরি গল্পে পরিণত হতে পারত। কিন্তু গ্যোতের সমুন্নত প্রতিভার সোনার কাঠির ছোঁয়ায় 'ফাউস্ট' মানুষের চিরন্তন জীবন-সমস্যার একটি আলেখ্য হয়ে উঠতে পেরেছে।

আট

বাংলাভাষায় গ্যোতে যথেষ্ট পরিচিত নাম। কিন্তু গ্যোতের ওপর সে পরিমাণ আলোচনা-সমালোচনা হয়নি। বোধকরি তার একটা কারণ এই যে আমাদের কৃতবিদ্য পণ্ডিতসমাজের ওপর এ্যাংলো স্যাকসন মানসিকতার প্রচণ্ড প্রতাপ। আমরা ইউরোপীয় সাহিত্যের স্বাদ গ্রহণ করেছি ইংরেজ এবং ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে। প্রায় দেড়শ বছর ধরে ইংরেজিভাষা এবং সাহিত্য এখানকার কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বাধ্যতামূলকভাবে পড়ানো হয়েছে। সে কারণে সামগ্রিকভাবে ইংরেজি সাহিত্যের ভাবাকাশটিই এখানকার শিক্ষিত সম্প্রদায়ের দৃষ্টিভঙ্গিকে একরকম নিয়ন্ত্রিত করেছে। যাকে বলা হয় 'কন্টিনেন্টাল লিটারেচার' তা-ও এখানে এসেছে ইংরেজি সাহিত্যের অনুষঙ্গ হিসেবে, ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে, ইংরেজ-আমেরিকান পুস্তকব্যবসায়ীদের তেজারতির পণ্য হিসেবে। দুয়েকটা ব্যতিক্রম বাদ দিলে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে কন্টিনেন্টাল ভাষাসমূহ শিখে ওই সকল ভাষার সৃষ্টিশীল মনীষীদের রচনার পঠনপাঠন, আলোচনা, পর্যালোচনা এবং সমালোচনার ধারাটি বিশেষ প্রসারতা লাভ করেনি।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত খুব ভালভাবেই গ্যোতে সাহিত্য পাঠ করেছিলেন। বন্ধু গৌরদাস বসাকের কাছে এক চিঠিতে জানাচ্ছেন, "এই কবির রচনায় কল্পনাশক্তির সূক্ষ্মতা সতত পরিলক্ষিত হয়।"

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মুখে আমরা গ্যোতের নামোচ্চারণ শুনতে পাই। তিনি প্রসঙ্গক্রমে রবীন্দ্রনাথের সৃজনীশক্তির সঙ্গে গ্যোতের সৃজনীশক্তির আশ্চর্য মিল প্রত্যক্ষ করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথের সৃজনীশক্তি সম্পর্কে এমন একটা লাগসই মন্তব্য বঙ্কিম করতে পেরেছিলেন। গ্যোতের রচনার সঙ্গে পরিচয় না থাকলে এরকম একটা সঠিক মন্তব্য করতে পারতেন বলে মনে হয় না। আমরা ধরে নিতে পারি যে গ্যোতের কাব্যকলার সঙ্গে বঙ্কিমের প্রত্যক্ষ পরিচয় ছিল। হয়ত সে যুগে আরো অনেকে গ্যোতের রচনা পাঠ করেছিলেন, কিন্তু সে বিষয়ে অন্যকোন সংবাদ আমাদের হাতে নেই।

ঘুরে ফিরে আমাদের রবীন্দ্রনাথে আসতে হয়। আশি বছর বয়সে ফাউস্ট পড়ার জন্য জার্মান শেখার জনশ্রুতিটি ধর্তব্যের মধ্যে না আনলেও নিশ্চিত করে বলা যায় রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে গ্যোতের রচনা পাঠ করেছিলেন। একবার রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত খেদসহকারে তাঁর সমসাময়িক পরিস্থিতি এবং গ্যোতের সমসাময়িক পরিস্থিতির তুলনা করেছিলেন। অর্থাৎ কিনা রবীন্দ্রনাথ বলতে

চেয়েছিলেন, গ্যোতে তাঁর পরিবেশ-পরিস্থিতির কাছ থেকে যে পরিমাণ আনুকূল্য লাভ করতে সক্ষম হয়েছিলেন, তিনি সে তুলনায় খুব স্বল্প আনুকূল্যই লাভ করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের 'প্রতিবেশী' গল্পে 'টাসসো' নাটকের উল্লেখ দেখতে পাই। গল্পের নায়ক একটি নাটক লিখেছিলেন। কলেজের অধ্যাপক এই প্রবল যশাকাঙ্ক্ষী ছাত্রের লিখিত নাটকের মূল ভাববস্তু যে টাসসো নাটক থেকে চুরি করা সেটা ধরিয়ে দিয়েছিলেন। খুব খুঁটিয়ে না পড়লে এরকমভাবে 'টাসসো' নাটককে টেনে নিয়ে আসা সম্ভব নয়।

বাংলা সাহিত্যের কোন কবির ওপর গ্যোতের যদি প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়ে থাকে, তখনো অবশ্যই রবীন্দ্রনাথের নামোল্লেখ করতে হয়। তাঁর কবিতায় গ্যোতের প্রভাব কখনো সরাসরি, কখনো বা একটু ঘুরতি পথে এসে পড়েছে, প্রমাণ করার জন্য দীর্ঘ অনুসন্ধানের প্রয়োজন হবে না। রবীন্দ্রনাথের 'মানসী' কাব্যের 'আমি' কবিতাটির প্রথম স্তবকটি ফাউস্ট দ্বিতীয় খণ্ডের একটি অংশের একেবারে আক্ষরিক অনুবাদ বললে অত্যুক্তি করা হবে না। মনে হয়েছে গ্যোতের কাছ থেকে মূলভাবটি গ্রহণ করেও রবীন্দ্রনাথ কোন কোন কবিতা রচনা করেছেন। যেমন 'ভাষা ও ছন্দ' কবিতাটি; মূলভাব ফাউস্ট প্রথম খণ্ডের গৌরচন্দ্রিকায় কবির উক্তি :

'মানুষের মহিমাকে দেবত্বের স্তরে
নিয়ে যেতে একমাত্র কবিকৃতি পারে।'

পাঠ করে যে কেউ অতি সহজেই উপলব্ধি করতে পারবেন 'ভাষা ও ছন্দ' কবিতাটির 'শানে নজুল' কোথায়। আবার 'বৈষ্ণব কবিতা' কবিতার চরণ দুটি—

'আর পাবো কোথা
দেবতারে প্রিয় করি প্রিয়েরে দেবতা'

এই অংশটিও মনে হয় ফাউস্ট প্রথম খণ্ডের মার্গারিটার কাছে ফাউস্টের ঈশ্বরের স্বরূপ বর্ণনা অংশ থেকে নেয়া। তাছাড়া, 'কাহিনী' এবং 'কথা ও কাহিনী'র অনেকগুলো কবিতায় সরাসরি গ্যোতের প্রভাব যে এসে পড়েছে বলার অপেক্ষা রাখে না। এতে রবীন্দ্রনাথের কোন অপরাধ হয়েছে বা তিনি গ্যোতের কবিতা অনুবাদ করে নিজের নামে চালিয়ে দিয়েছেন, সেকথা বলা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। রবীন্দ্রনাথের পঠনপাঠন এবং অনুসন্ধানের পরিধি কতদূর বিস্তৃত এবং প্রসারিত ছিল, সে বিষয়ে একটা ইঙ্গিত দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে মাত্র।

মাইকেল, বঙ্কিম এবং রবীন্দ্রনাথ ছাড়া বাংলা সাহিত্যের অপর কোন লেখক বা কবি গ্যোতে সম্পর্কে কোন মন্তব্য করেছেন, আমাদের জানা নেই। সম্প্রতি ঢাকার আলিয়া মাদ্রাসার লাইব্রেরি থেকে উয়র ফাউস্ট বা আদি ফাউস্টের বাংলা অনুবাদের একটি কপি উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। এই অনুবাদটি করেছিলেন মজিদ বক্স নামে এমন এক ব্যক্তি যাঁর কোন সাহিত্যিক পরিচিতি ছিল না। যে কপিটি আমাদের কাছে এসেছে তাতে অজস্র মুদ্রণপ্রমাদ এবং অনুবাদের মানও অত্যন্ত খারাপ। আমি সংবাদ পেয়েছি সেকালে প্রমথ চৌধুরী সম্পাদিত 'সবুজপত্রে' একজন মুসলিম ভদ্রলোক ফাউস্টের কিছু অংশ অনুবাদ করে প্রকাশ করেছিলেন। আমাদের হাতে

নিশ্চিত কোন প্রমাণ নেই, মজিদ বক্স সাহেব সবুজপত্রের সেই মুসলিম ভদ্রলোক কিনা? পি. চৌধুরী নামে আরেক ব্যক্তি মজিদ বক্সের অনুবাদে কয়েক লাইনের একটি ভূমিকা লিখেছিলেন। এখন জিজ্ঞাসা— আই পি চৌধুরী কি সবুজপত্র সম্পাদক প্রমথ চৌধুরী? খুব সম্ভবত মজিদ বক্সের আদি নিবাস যশোহর এবং পেশায় তিনি উকিল ছিলেন। গ্যোতের সম্পর্কে বাংলাভাষায় প্রথম প্রামাণ্যগ্রন্থ রচনা করেন কাজী আবদুল ওদুদ। 'কবিগুরু গ্যেটে' শিরোনামে দুই খণ্ডে সমাপ্ত এই গ্রন্থে ওদুদ সাহেব গ্যোতের জীবন এবং সাহিত্যকর্ম সম্পর্কে যথাসাধ্য আলোচনা করেছেন। স্বর্গীয় শ্রী ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় তাঁর একটি প্রবন্ধে বলেছেন, গ্যোতের ওপর এরকম একটি প্রামাণ্যগ্রন্থ ইংরেজি সাহিত্যেও নেই। ধূর্জটিবাবুর এ মন্তব্য যথার্থ বলে মেনে নেয়া কষ্টকর হলেও একথা সত্য যে, কাজী আবদুল ওদুদের গ্যোতের ওপর লেখা গ্রন্থের দুটি খণ্ডই অত্যন্ত সুলিখিত এবং পাণ্ডিত্যপূর্ণ রচনা। বিপুল পরিশ্রম এবং চিন্তা-ভাবনার স্বাক্ষর এতে রয়েছে। অন্তরের প্রগাঢ় অনুরাগ না থাকলে এ ধরনের উৎকর্ষযুক্ত গ্রন্থ রচনা করা সম্ভব নয়। গ্যোতের প্রধান প্রধান রচনার বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করে ওদুদ সাহেব তাঁর গ্রন্থ দুটিকে অধিকতর প্রাসঙ্গিক করে তুলেছেন। তাঁর অনুবাদ স্বচ্ছ এবং সাবলীল। মূলভাব অনেকটা অবিকৃতভাবেই উঠে আসতে পেরেছে। গ্যোতের কাব্যের ভাবসৌন্দর্য তিনি চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। কিন্তু কাব্যেসৌন্দর্যের সবটুকু যদি ফুটিয়ে তুলতে না পারেন, সেজন্য ওদুদ সাহেবকে দোষ দেয়া যাবে না। কারণ তিনি কবি ছিলেন না। মোটকথা গ্যোতের পূর্ণাঙ্গ জীবনবৃত্ত এবং সাহিত্যকর্ম বাংলাভাষার পাঠকদের কাছে পরিচিত করার সবটুকু কৃতিত্ব কাজী আবদুল ওদুদের একার। দুটি খণ্ডই অন্তরের তাগিদে লেখা অনুপ্রাণিত গ্রন্থ এবং পাঠ করে অনেকেই গ্যোতে সম্বন্ধে জানতে, তাঁর রচনা পাঠ করতে আগ্রহী হয়ে উঠেছেন। এটি কম সাফল্যের বিষয় নয়। কিন্তু প্রথম প্রকাশের পরে গ্রন্থ দুটোর আর কোন সংস্করণ হয়নি। বর্তমানে বাংলাভাষায় গ্যোতে সম্পর্কিত আর কোন বই-পুস্তক নেই।

শ্রী অন্নদাশঙ্কর রায় তাঁর একটি প্রবন্ধে গ্যোতে এবং রবীন্দ্রনাথের তুলনামূলক আলোচনা করেছিলেন। শ্রী রায়ের রচনাটি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। তাতে গ্যোতে-প্রতিভার চারিত্র নির্ণয়ের কোন বিশেষ প্রয়াস গ্রহণ করা হয়নি। শ্রী শিবনারায়ণ রায় তাঁর 'সাহিত্য চিন্তা' গ্রন্থে মোটামুটি দীর্ঘ একটি প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ এবং গ্যোতের ওপর একটি তুলনামূলক আলোচনা করেছিলেন। রচনাটি যখন 'দেশ' পত্রিকায় ধারা-বাহিকভাবে কয়েকটি সংখ্যায় প্রকাশিত হয়, তখন তুমুল বিতর্কের জন্ম দিয়েছিল। ইন্টেলেকচুয়াল সুলভ অহমিকা এবং দাম্ভিকতাটুকু বাদ দিলে অবশ্যই স্বীকার করতে হবে এটা একটা যুক্তি ও বিচারনিষ্ঠরচনা। শুনেছি অতি সাম্প্রতিককালে জার্মানি থেকে শ্রী অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের 'Goethe and Tagore' শিরোনামে একটি তুলনামূলক আলোচনাগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। যেহেতু গ্রন্থটি আমাদের হাতে এসে পৌঁছায়নি তাই কোন মন্তব্য করা সম্ভব নয়। মাত্র দুই-তিন মাস পূর্বে কোলকাতা থেকে প্রকাশিত 'প্রতিক্ষণ' পত্রিকায় 'গ্যোতের ভূগোল' শীর্ষক একটি সুলিখিত প্রবন্ধ

প্রকাশিত হয়েছে। এতে গ্যোতের ভ্রমণ বিষয়ক তথ্যাবলি অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সঙ্গে উপস্থাপন করা হয়েছে। দুর্ভাগ্যবশত লেখকের নাম এ মুহূর্তে মনে আসছে না।

এ পর্যন্ত বাংলাভাষায় প্রকাশিত ফাউস্ট প্রথম খণ্ডের তিনটি অনুবাদ আমাদের হাতে এসেছে। প্রথম অনুবাদটি করেছেন শ্রী কানাইলাল গাঙ্গুলী। তিনি মূল জার্মান থেকেই রচনাটির বাংলা করেছেন। এটি অত্যন্ত উৎকৃষ্ট অনুবাদ। শ্রী সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এই গ্রন্থে একটি দীর্ঘ ভূমিকা রচনা করেছেন। চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের ভূমিকাটিও জ্ঞানগর্ভ এবং সুলিখিত। কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এই বই প্রকাশ করেছেন। দ্বিতীয় অনুবাদটি করেছেন মরহুম মহীউদ্দিন। প্রকাশ করেছিলেন বাংলা একাডেমী। মহীউদ্দিন সাহেবকে ব্যক্তিগতভাবে আমি চিনতাম। তাঁর চরিত্রের ঋজুতা এবং আন্তরিক মহত্ত্বেরও পরিচয় পেয়েছিলাম। ফাউস্ট ছাড়া তিনি 'জরথুস্ত্রের সংলাপ' (Thus speaks Zarthustra) অনুবাদ করেছিলেন। মহৎ এবং জ্ঞানগর্ভ বিষয়ের প্রতি তাঁর বরাবরই একটা জাগ্রত আগ্রহ লক্ষ্য করেছি। কিন্তু ভাষার অস্বচ্ছতা এবং রচনাভঙ্গির দুর্বলতার কারণেই বোধকরি অনুবাদটি বিশেষ প্রভাব রাখতে পারেনি। তৃতীয় অনুবাদ, যেটি আমাদের হাতে এসেছে সেটি করেছেন শ্রী শুধাংশু চট্টোপাধ্যায়। এটি যথার্থ অর্থেই একটি আক্ষরিক অনুবাদ। তথাপি শুধাংশুবাবুকে ধন্যবাদ জানানো উচিত মনে করেছি, এ কারণে যে তিনি তাঁর 'গ্যোতে সমগ্র' গ্রন্থটিতে গ্যোতের উল্লেখযোগ্য রচনার অনুবাদ করেছেন। 'ভের্থর' 'ভিলহেম মাস্টার্স' 'ফাউস্ট' দ্বিতীয় খণ্ড এবং আরো কিছু রচনা বা রচনাংশ এতে স্থান পেয়েছে। বাংলায় অদ্যাবধি শুধাংশুবাবুর গ্রন্থটিই গ্যোতের রচনার সাথে পরিচিত হওয়ার একমাত্র মাধ্যম। তবে তিনি গ্যোতে সমগ্র নামটি না দিলে ভাল করতেন।

মহীউদ্দিন সাহেব এবং শুধাংশুবাবুর অনুবাদ দুটি পড়ে মনে হল, উভয়েই লুই ম্যাকনিসের বিখ্যাত ইংরেজি অনুবাদ থেকেই বাংলা করেছেন। এই অনুবাদক তিনজনের প্রত্যেকের প্রতি আমার শ্রদ্ধা রয়েছে। অন্তরের মহৎ আকাঙ্ক্ষার দ্বারা তাড়িত না হলে কেউ 'গ্যোতে' অনুবাদ করতে আসে না। এতদিনে এই উপলব্ধি জন্মেছে। এই ভূমিকা লিখতে গিয়ে বারবার ওদুদ সাহেবের নামটি স্মরণে আসছে। এই মহাপ্রাণ মানুষটি প্রসন্ন মনীষা এবং অপার শ্রম স্বীকারের মাধ্যমে গ্যোতের প্রতি যে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করে গেছেন, তা অনেকদিন পর্যন্ত গ্যোতে-সাধকদের অনুপ্রেরণা যোগাবে।

নয়

আমি ফাউস্ট গ্রন্থটির অনুবাদ শুরু করেছিলাম ১৯৭৫ সালে। ১৯৬৪ সালের দিকে এই গ্রন্থটির সঙ্গে আমার আকস্মিকভাবে সাক্ষাৎ ঘটে যায়। সেই তখন থেকেই এই গ্রন্থ এবং গ্রন্থের রচয়িতার প্রতি একটা তীব্র অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণ ক্রমাগত অনুভব করতে থাকি। 'ফাউস্ট' এবং গ্যোতে সম্পর্কিত যা কিছু চোখের সামনে এসেছে আগ্রহসহকারে পাঠ করে গেছি। এমনিভাবে এই গ্রন্থটির অনুবাদ করার ইচ্ছা ধীরে ধীরে আমার মধ্যে জন্মলাভ করতে থাকে। যখনই সময় পেয়েছি, অনুবাদ করা যায়

কিনা চেষ্টা করে দেখেছি। কিন্তু প্রতিবারই আমার প্রয়াস ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। দুই-তিনটি বাংলা অনুবাদ আমার কাছে ছিল, কিন্তু সেগুলোও আমাকে কোন পথ দেখাতে পারছিল না। তীব্র একটা মানসিক চাপ অনুভব করেছিলাম এই কারণে যে, প্রচলিত যে অনুবাদগুলো আমার হাতের কাছে ছিল, সেগুলো একদিকে যেমন আমাকে সন্তুষ্ট করতে পারেনি, তেমনি অন্যদিকে আমার মন যেমনটি চায়, সেরকম একটা অনুবাদ আমার কলম সৃষ্টি করতে পারছিল না। এই মানসিক দোদুল্যমানতার মধ্যে অনেকদিন অতিবাহিত হয়ে যায়। অবশেষে ১৯৭০ সালের দিকে এক বাসায় বসে উৎসর্গ অংশের অর্ধেক অনুবাদ করে ফেলি। অনুবাদের ধরন দেখে আমার কেমন বিশ্বাস জন্মে যায়, যে ভাষা-রীতিটি আমাকে অনুসরণ করতে হবে তা আমার কলমে এসে গেছে। তা সত্ত্বেও পরবর্তী পাঁচ বছরে আর একটি ছত্রও অনুবাদ করতে পারিনি। ১৯৭৫-'৭৬ সালের দিকে হঠাৎ করে কল্পনার একটা নতুন শক্তি আমার মনের মধ্যে জেগে ওঠে। একচোটে প্রায় অর্ধেকেরও বেশি অনুবাদ করে ফেলি এবং মাসিক 'সমকাল' পত্রিকায় প্রকাশ করতে থাকি। সেসময়ের সমকাল সম্পাদক মরহুম হাসান হাফিজুর রহমান এই অনুবাদের প্রতি যে যত্ন এবং স্নেহ প্রর্দশন করেছেন তার কোনই তুলনা হয় না। মূলত হাসান হাফিজুর রহমানের উৎসাহেই এক নাগাড়ে অর্ধেকের বেশি অনুবাদ করতে পেরেছিলাম।

অপ্রাসঙ্গিক হলেও একটা কথা এখানে বলা উচিত মনে করছি। ১৯৭৬-'৭৭ সালের দিকে যখন অনুবাদটি সমকালে প্রকাশ পাচ্ছিল, তখন আমি ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে একটা থিসিস তৈরির কাজে ব্যস্ত ছিলাম। কিন্তু গ্যোতের চিন্তার গভীরতা এবং কল্পনার অনুপম সৌন্দর্য আমাকে এমনভাবে তন্ময় করে রাখে যে ঐ গবেষণার কাজটিকেই আমার নিতান্ত অশ্লীল বলে মনে হতে থাকে। এই ধারণা মনে জন্ম নেয়ার সঙ্গে সঙ্গে গবেষণার কাজটি আমি ছেড়ে দেই। মজার ব্যাপার হল, অনুবাদকর্মেও আর অধিকদূর অগ্রসর হতে পারিনি। একূল-ওকূল হারানোর মত ব্যাপার। বর্তমান বছর অর্থাৎ ১৯৮৬ সালের শুরুর দিকে আমি জার্মান কালচারাল ইনস্টিটিউটে জার্মান ভাষা শিক্ষার একটা কোর্সে ভর্তি হই। এই জার্মান ভাষা শিক্ষা করতে গিয়ে কালচারাল ইনস্টিটিউটের ডিরেক্টর হের পিটার জেভিতসের সঙ্গে পরিচয় এবং বন্ধুত্ব হয়। তাঁর সংস্পর্শে আসার পর অসমাপ্ত অনুবাদ কর্মটির একটি গতি করার আকাঙ্ক্ষা মনে ঘনিয়ে ওঠে এবং খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার যে মাত্র অল্পদিনের মধ্যেই কাজটি শেষ করে ফেলি। 'মুক্তধারা' যে এ বইটি প্রকাশ করছে, তাও একটি আশ্চর্য যোগাযোগের ব্যাপার। সবকিছু মিলিয়ে মনে একটা বিশ্বাস স্থিতু হয়েছে যে, উর্ধ্বলোকের দয়া ছাড়া কেউ কোন বড় কাজ করতে পারে না। এই অনুবাদকর্মটি করার সময়ে কত লোক কতভাবে যে আমাকে সাহায্য করেছেন, বলে শেষ করতে পারব না, ঋণ শোধ করার তো প্রশ্নই ওঠে না। যাঁদের কাছে অধিক পরিমাণে ঋণী তাঁদের অধিকাংশের নামই উল্লেখ করা হল। বিস্মৃতিবশত যাঁদের নাম বাদ পড়ে গেছে তাঁদের কাছে আমি ক্ষমাপ্রার্থী। এই অনুবাদ করার সময়ে গদ্য-পদ্য মিলিয়ে অনেকগুলো অনুবাদ আমাকে পড়তে হয়েছে। উপলব্ধিকে একটুখানি

প্রসারতর করার জন্য গ্যোতের জীবনী, তার অন্যান্য রচনাবলি, জার্মানি ও জার্মান সাহিত্যের ইতিহাসও যথাসম্ভব পাঠ করতে চেষ্টা করেছি। কিন্তু বাংলা অনুবাদ করার সময় ফিলিপ ওয়েন এবং লুই ম্যাকনিসের কাব্যানুবাদ গ্রন্থ দুটোকে মুখ্য ধরে নিয়েছিলাম। দুটির মধ্যে আমার কাছে লুই ম্যাকনিসের অনুবাদটি অধিকতর আধুনিক মনে হওয়ায় সেটিকেই অবলম্বন করেছি।

আক্ষরিক অনুবাদ আমি করিনি। ভাবানুবাদ করেছি, একথাও সঠিক নয়। ফাউস্টকে জার্মান পরিপ্রেক্ষিত থেকে তুলে এনে বাঙালি ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতির মধ্যে যাতে প্রতিষ্ঠিত করা যায় সে রকমের একটি প্রচেষ্টা আমি করেছি। জার্মান ছন্দ অনুবাদ করার প্রশ্নই ওঠে না, কারণ সে যোগ্যতা হয়ত আমার কোনদিন জন্মাবে না। তাই বাংলা ছন্দ যেটা যখন স্বাভাবিক মনে হয়েছে, সেটিই ব্যবহার করেছি। কৃত্তিবাস, কাশীরাম, বৈষ্ণব কবিকুল, আলাওল, ভারতচন্দ্র, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নবীনচন্দ্র সেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, কাজী নজরুল ইসলাম থেকে আধুনিক কবিদের শব্দসম্ভার পর্যন্ত আমি অবলীলায় গ্রহণ করেছি। এই অনুবাদের কাব্যভাষাটির জন্য রবীন্দ্রনাথই যে আমাকে সর্বাধিক সাহায্য করেছেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। প্রাচীন ভাষারীতির সঙ্গে চলিত ভাষার মিশ্রণ ঘটিয়ে একটা ক্লাসিক আবহ তৈরি করা যদি কৃতিত্বের কাজ হয়ে থাকে, সেটুকু আমি দাবি করতে পারি। পরিশেষে পাঠকদের কাছে আমার অনুরোধ, তাঁরা যেন আমার এই দীর্ঘ ভূমিকাকে পাণ্ডিত্য প্রকাশের অপপ্রয়াস মনে না করেন। এই ভূমিকায় গ্যোতে সম্পর্কে আমি কত কম জানি সেটুকু ঢেকে রাখারই চেষ্টা করেছি মাত্র। আমি অত্যন্ত ভালবেসে এই কাজটি করেছি। সমান ভালবাসা দিয়ে সকলে যদি এই অনুবাদকর্মটি গ্রহণ করেন, আমি ধন্য হয়ে যাব।

তারিখ
৯ শ্রাবণ, ১৩৯৩ বাংলা

বিনীত
আহমদ ছফা
বি-৪ এফ-৬ রূপনগর হাউজিং এস্টেট
সেক্‌শান নং ২
মিরপুর, ঢাকা ১৭

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

জাতীয় অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাক, জনাব আজিজুল হক, ইসমাইল মোহাম্মদ, কবি সুফিয়া কামাল, অধ্যাপিকা হুসনে আরা হক, কবি মুহম্মদ নুরুল হুদা, অধ্যাপক নরেন বিশ্বাস, অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হক, ড. হারুনুর রশীদ, জনাব ফ. ও. ম. নুরুল হুদা, শ্রী তপন চক্রবর্তী, ড. মফিজ চৌধুরী, জনাব আবু জায়েদ শিকদার, অধ্যাপক সলিমুল্লাহ্ খান, জনাব মোরশেদ শফিউল হাসান, জনাব মাশুক চৌধুরী, জনাব মফিজ দীন শেখ, জনাব মতিয়ার রহমান খান, জনাব মোহাম্মদ ফারুক, জনাব নাজিম উদ্দীন মোস্তান, আলহাজ্ব হাবীবুর রহমান, জনাব মাসুম, ড. সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম, জনাব আনিসুজ্জামান, শ্রী পিনাকী দাম, অধ্যাপিকা সুরাইয়া খানম, অধ্যাপক স্বপন আদনান, জনাব কামাল সিদ্দিকী, জনাব দিলওয়ার হোসেন, জনাব আহবাব আহমেদ, শ্রী অচ্যুতানন্দ সাহা, শ্রী চিত্তরঞ্জন সাহা, হের পিটার জেভিৎস, হের এলমার টীম্পে এবং আরো অনেকে।

ম্যাকসম্যূলর ভবনে সংবর্ধনার জবাবে অভিভাষণ দানরত অনুবাদক

১৯৯৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে কোলকাতাস্থ ম্যাকসম্যূলর ভবনে ফাউস্ট অনুবাদের একটি পশ্চিম বঙ্গীয় সংস্করণ প্রকাশোপলক্ষে অনুবাদককে একটি সংবর্ধনা প্রদান করে। ওই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের অংশ হিসেবে ফাউস্টের নির্বাচিত অংশ শ্রুতিনাট্য হিসেবে দর্শকদের সামনে পরিবেশিত হয়। শ্রুতিনাট্য অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছিলেন প্রতিভাময়ী অভিনেত্রী শ্রীমতী অপর্ণা সেন, শ্রীমতী সোহাগ সেন, শ্রী তাপস ঠাকুর এবং শ্রী অঞ্জন দত্ত। নট-নটীদের সঙ্গে অনুবাদক।
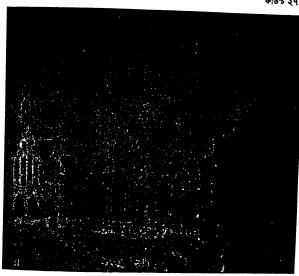
ফ্রাঙ্কফোর্টের এ বাড়িতে ১৭৪৯ সালের ২৮ আগস্ট গ্যোতে জন্মগ্রহণ করেন

কবি ক্লপস্টক
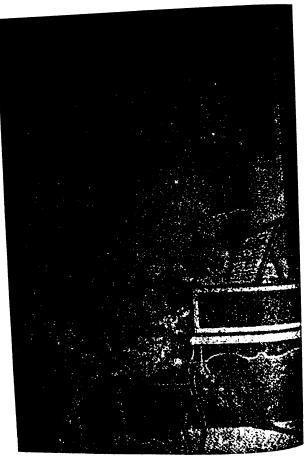
সঙ্গীতশিল্পী মোজার্ট

দার্শনিক শোপেনহাওয়ার

দার্শনিক ইমানুয়েল কান্ট

ক্যাথারিনা মমসেন অঙ্কিত 'গ্যোতে'র বিখ্যাত তৈলচিত্র
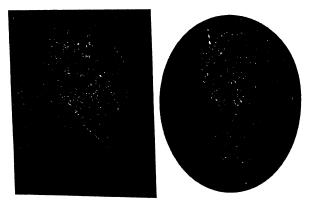
গ্যোতের বাবা ও মা

গ্যোতে ১৯১৭ সালে
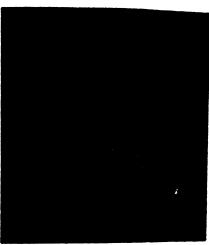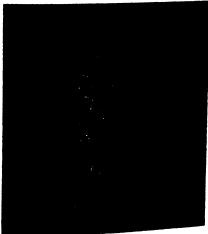
গ্যোতের প্রথম জীবনের প্রণয়িনী লোটে। পরে গ্যোতে যখন ভাইমারের প্রধানমন্ত্রী তখন লোটে তাঁর সাথে দেখা করেন। এ বিষয়ে টমাস মানের 'লোটে ইন ভাইমার' নামে একটি চমৎকার উপন্যাস আছে।

কবি ক্রিস্টোফ মার্টিন ভিল্যান্ড

গ্যোতে ২৬ বছর বয়সে

দার্শনিক হেগেল
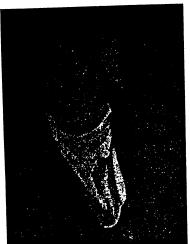
অমর সঙ্গীতশিল্পী বেঠোফেন
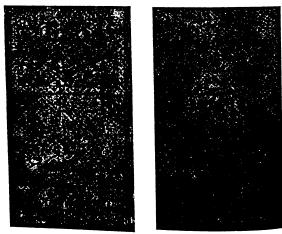
গ্যোতের প্রাচ্য প্রতীচ্যের 'দিওয়ান' গ্রন্থের মলাট ফার্সি ও জার্মান ভাষায়

ইতালিয় ভাস্কর আলেকজান্ডার ট্রিপ্যালকৃত গ্যোতের আবক্ষ মূর্তি

খ্রিস্টিয়ানা ভালপিয়াস— গ্যোতের স্ত্রী

কবি ফ্রেডরিখ শিলার
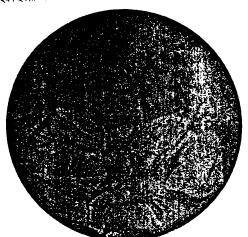
গ্যোতের স্ত্রী খ্রিস্টিয়ানা ও পুত্র আউগস্ট

কবি ফ্রিডরিক হোলডারলিন

উৎসর্গ

মূর্ত হও আরো এবার
কান্তিমান কায়া প্রফুল্ল আননরাজি;
একদা দেখেছি আমি
যৌবন বেদনা ক্ষুব্ধ ছলছল চোখে।
আমার মানস নেত্রে উদ্ভাসিত হও
ধরা দাও পূর্ণরূপে পলাতক দিন,
মহানন্দ মন্থনিত সুন্দর রঙিন,
ঘন হয়ে বস চেতনায়
স্মৃতির কুজ্ঝটি ঠেলে প্রকাশো স্বরূপ।
আমার আমাকে কর কঠোর নির্দেশ
যেন নাচে এ হৃদয় অপূর্ব সঙ্গীতে
সংখ্যাহীন দৃশ্যপট
মন্ত্রস্পর্শে প্রাণ যেন পায় আচম্বিতে।

হে স্মৃতি, হে প্রিয় সখা, ধারণা করেছ তুমি
প্রাণের মাধুরি মাখা আনন্দিত মধুদিনগুলো
বিছিয়ে রেখেছ আহা প্রীতিঘন ছায়া
পুরাণ কাহিনী প্রায় যাতে অনুক্ষণ
কূজনে গুঞ্জনে কাঁপে অতীতের ধ্বনি।
বেদনা-বিহ্বল প্রেম কোথা হতে ছুটে আসে
বন্ধুত্ব মধুর মত জমেছে হৃদয়ে।
পুরাতন দুঃখ যত ফণা তুলে নাচে
হৃদয়ের ক্ষত হতে পুনর্বার তপ্ত রক্ত ঝরে।
জটিল জীবনখানি দৃষ্টি পথে ভাসে
যেন একখানি কম্পমান স্থির চিত্রলেখা।
ভেসে ওঠে সেইসব প্রিয়তম মুখ
আলো প্রেমহীন লোকে নিদ্রামগ্ন
ভাগ্যহত করুণ সুন্দর।
আমার কৈশোর গীতি শুনেছিল যারা

যাদের প্রশংসা শুনে সঙ্গীতের ধারা
জেগেছিল এই কণ্ঠে ঝরনার মত আত্মহারা
কেউ নেই সকলেই বিগত অতীত
কারে বা শোনাই বল বিলম্বের বিরচিত গীতা।
অন্তর্হিত সেদিনের প্রিয় কলধ্বনি
আমার চৌপাশে জাগে মৌনতার অতন্দ্র প্রহরী
অপূর্ব রোদন ভরা সঙ্গীতের সুর
কি করে বিনিয়ে তুলি আগন্তুক জনের সমাজে
যাদের প্রশংসাবাক্যে পীড়িত শ্রবণ
করে তোলে এ হৃদয় দুঃখভারাতুর।
আর যারা চিত্ততলে আমার কণ্ঠের মধু
অনুরাগে করেছে লালন
সুবিশাল পৃথিবীতে কে কোথা ছড়িয়ে আছে
মৃত কেউ, নিঃশব্দে হারিয়ে গেছে এই চরাচরে।
বিস্মৃত আকাঙ্ক্ষারাশি জাগে আজ মনে
স্বর্গগত আত্মাদের প্রেমময় স্মৃতি
সঙ্গীতে উথলে উঠে ছন্দে নাচে প্রাণ
রক্তে তরঙ্গের দোলা
বুকে জাগে উদ্দাম কম্পন।
বেণুরন্ধ্রে হাওয়া যেন ফিরে আসে
বারংবার যৌবনের দিন
দ্রবীভূত হল হিয়া শিশির সজল
অহঙ্কার গলে গলে হয়ে গেল জল।
যা কিছু জড়িয়ে ধরি মরীচির মত সব করে অন্তর্ধান
হারানো অতীত মর্মে উপলব্ধি হানে
সত্যের প্রতীতি ভরা ছিল তারা
উজ্জ্বলিত জীবনের স্থির ধ্রুবতারা।

গৌরচন্দ্রিকা

অধিকারী :

ওগো বন্ধু তোমরা দু'জন
আমার সহায় ছিলে ঝড়ঝঞ্ঝাকালে
আরো একবার দেখ ঠেকেছি মুশকিলে।
আমাদের নাট্যশালা কি চায় এখন
চাহিদা সঠিকভাবে মেটাতে বা পারি কতদূর।
মনোগত কামনা আমার
যে জনতা নিজে বেঁচে অপরে বাঁচায়।
সেই সমষ্টির প্রাণে বিলাব সন্তোষ
তুড়িতে ভাসাব সবে আনন্দ সাগরে।
রঙ্গমঞ্চ ফিটফাট দৃশ্যপটও উন্মোচিত প্রায়
অপেক্ষায় রত বসে
সারি সারি মানুষের কুতূহলী চোখ।
নিশ্চিত সবাই শুরু হবে
অভিনব নাট্যকলা আশ্চর্য কথন
মুহূর্তেই মূর্ত হবে বিদগ্ধ আখ্যান।
আমি চিনি বিলক্ষণ আমার খদ্দের,
অত্যন্ত বিশদ জানি তুষ্ট কিসে তারা।
মর্মে যে সামান্য ক্ষোভ তাও ব্যক্ত করি
কেউ কদাচিৎ দেখে উৎকৃষ্ট নাটক
যোগ্যতম মানুষেরা অধিকাংশ অধ্যয়নে সময় কাটান।
বড় ভয় কি কৌশলে দৃশ্যমান করে তুলি
কোন কিছু প্রাণবন্ত অথচ নবীন
নিখুঁত আঙ্গিকে গড়া
তারি সঙ্গে দ্রবীভূত মহত্তর জীবন প্রেরণা।
সত্য যদি বলি
আমার যা ভাল লাগে
অপরাহ্নে ছুটে আসা ঝাঁকে ঝাঁকে ব্যাকুল মানুষ
প্রায় তরঙ্গ কল্লোল নদী ঢেউয়ে ঢেউময়
ভিড় ক'রে করে মারামারি

প্রবেশপত্রের লোভে এ ওর গর্দানে চড়ে
রক্তচক্ষু কনুইতে কনুই ঠেকায়
যেন দুর্ভিক্ষের দেশে খাদ্যলোভী ভিক্ষুক দঙ্গল।
পেরিয়ে সংকীর্ণ ঋজু ফটকের দ্বার
উঠে আসে নাট্যশালে
যেন ঝাঁকে ঝাঁকে উজানি ইলিশ।
ইত্যাকার দৃশ্যাবলি আমার নয়নে ঠেকে আশ্চর্য সুন্দর
একমাত্র কবির হাতে সহজে বিরাজ
শক্তিমন্ত ইন্দ্রজাল— তৃষ্ণাতুর মানুষের সরল সান্ত্বনা।
অতএব বিলম্ব কিসের কবিবর কর্মে দাও মন
কবিতার কল্পবৃক্ষে ফুটুক মুকুল।

কবি : এই ক্ষণে বলে রাখি, কখনো আমার কাছে
উচ্ছৃঙ্খল জনতার কথা করবে না উত্থাপন
যাদের দর্শন মাত্র কল্পনার সূক্ষ্মতন্তু
মন ছেড়ে আতঙ্কে পালায়, রক্ষা কর,
কোপন স্বভাব সেই জনতার শব্দঝড় থেকে
আমাদের করে ফেলে তরঙ্গ তাড়িত মূক অসহায়।
বরং নিয়েই চল অনুপম স্বর্গের কিনারে
যেখানে সর্বদা ফোটে পুষ্পের স্তবকে
কবিদের প্রাণের সন্তোষ।
স্নিগ্ধ শান্তি মধুরতা নীরবে বিলায় শুধু করুণার ধারা।
যেখানে প্রেম ও বন্ধুত্ব মিশে ঘন ঘনাকারে রচে
অভিনব স্বর্গলোক তুলনাবিহীন
প্রাণবন্ত উদারতা স্বচ্ছন্দে বিরাজে
যেন দলে দলে দেবতারা সুপ্তি হতে জাগে।
থরথর কম্পমান যেই শব্দ ধ্বনি
আবেগী অন্তর থেকে অনুরাগে উঠে এসে
ওষ্ঠাধরে নাচে, জেনে রাখ একজন কবির শ্রবণে—
ওই শব্দ, ওই ধ্বনি
একমাত্র কালো সিন্ধু সন্তরণ তরী
মুহূর্তের রূঢ় ব্যবহারে ডোবায় সমস্ত কিছু অতল সাগরে।
সুদীর্ঘ সাধনা বলে দিনের আলোকে ফোটে
অনিন্দ্য সুন্দর কান্তি শিল্পের গোলাপ
ভোরের শিশির যেন তরলিত সোনা
লোকোত্তর মহিমায় করে ঝলমল
সত্যের মোহন কান্তি প্রতিশ্রুত অনাগত সময়ের কাছে
দীপ্তি দেবে স্থির শিখা নিস্তব্ধ বিদ্যুৎ।

নট : আমাকেই যদি ধর গণনায়
বলি শোন রেখে দাও
তোমার ঐ অনাগত কাল
বর্তমানে কে তবে বিলাবে হাসি আনন্দ প্রমোদ।
অদ্যকার দাবি হেলা করে
যে চায় আগামীকাল মূর্খ তারে বলি।
সুন্দর যৌবনবন্ত উদ্দীপিত মনে
জাগিয়ে তুলতে হবে আনন্দ অঙ্কুর
স্থূল রক্তমাংস নিয়ে বিবাদে কি ফল।
যেজন সহজে করে ক্ষমতা প্রয়োগ
দোষে না লোকের রুচি
বাঁশরীর মত তার প্রতি রন্ধ্রমূলে
জীবনের সারবস্তু ব্যক্ত হয় বসন্তের ফুলে।
যে মানুষ আপনার দীপ্তপ্রতিভায়
বিচিত্র স্বভাবী সব মানুষের
অগ্নিবর্ণ চিন্তারাশি সহজে দোলায়
যেন দোলে কৃষ্ণচূড়া মৌসুমি হাওয়ায়।
নিষ্করুণ জনতা জঙ্গলে তার প্রাণ পায় ক্ষিপ্রগতি
থরথর নাচে যেন প্রাণবন্ত জলের ঝরনা।
অতএব বন্ধুবর হিয়ায় হিম্মত বাঁধো
আনন্দে বিকাশ কর নমনীয় শিল্পকান্তি
সুন্দর মহান, মুক্ত কর প্রাণ
জাগাও প্রজ্ঞার বাণী, টেনে আন
যৌবন বাঞ্ছিত ধন বিশুদ্ধ আবেগ।
আন স্নিগ্ধ কোমলতা স্ফটিকে ছুটন্ত যেন
স্বচ্ছ জলধারা, মৃদুমন্দ ধীরগতি নীরব নিটোল
দিয়োনা হুজুগে কান, যুগের বিকৃত রুচি
মান্য করে দিয়োনা বাতুল পরিচয়।

অধিকারী : যেহেতু দর্শক চায় নিতান্ত জমাট কিছু
তাদের সন্তুষ্ট কর, নাটকে সংযুক্ত হোক এন্তার ঘটনা
ঘটুক তুমুল কাণ্ড
ব্যাকুল দর্শককুল মুগ্ধ দৃষ্টি মেলে
দেখুক অবাক চোখে চিত্তহারী দৃশ্যকাব্য
অনায়াসে মিলে যাবে জনগণ নন্দিত স্বীকৃতি।
ললাটে অঙ্কিত হবে সৌভাগ্যের স্বর্ণরশ্মিরেখা
প্রেক্ষাগৃহে মুহুর্মুহু ফুল্ল করতালি

বাজবে অশান্ত রবে আনন্দে আন্দোলি।
এই জনসমষ্টিরে যদি তুষ্টি দিতে চাও
টেনে আন বড়সরো রসাল ঘটনা
যেন প্রতিলোক সহজেই পেয়ে যায় বস্তু মনমত।
বিলাও বিস্তর তুষ্ট কর বহুজনে
দিকে দিকে রটে যাবে শুভ্র যশরাশি
যেন শরতের চন্দ্রিমার বিকশিত হাসি।
গৃহে ফেরা জনতার দল উচ্ছ্বসিত মুক্ত সাধুবাদে
বলবে সবাই তারা
উত্তম নাটক বটে জমেছে সুন্দর।
উৎকৃষ্ট খাবারে কর মশলা মিশাল
তারপর ক্রীড়াচ্ছলে সহজ কৌতুক
নানাজনে নানারস কর বিতরণ।
জেনে রাখ তোমার সৃজিত সত্তা অতি অল্প আয়ু
জনতার রুচি তারে করে বিদারণ।

কবি : তুমি কি কর না মনে
ওরকম কলাকৃতি অপকৃষ্ট অতিশয়।
যেজন আসল শিল্পী কি করে সে
আপনার স্বধর্ম হারায়।
আমার অবাক লাগে কোন্ মুখে করছ প্রচার
সুকুমার কলা বলে
যত সব নির্বোধের অক্ষম চাতুরি।

অধিকারী : ওরকম অপবাদে খুবই সহজে
আমি অবিচল থাকি।
যত ইচ্ছা মূর্খ বলে কর তিরস্কার
মনে রেখ, তোমাকে চিরতে হবে শক্ত আঁশ কাঠ
অতএব বেছে নাও উত্তম কুঠার।
ভেবে দেখ, কারা হবে তোমার দর্শক
কেউ আসে রাত্রি জাগরণ ক্লান্তি তাড়াবার আশে
মুখোশ পোষাক ছাড়া অন্য কিছু দেখেও দেখেনা
কেউ আসে কুতূহলে;
ভোগসুখ লালসায় কেউ কেউ,
সবচেয়ে বেদনার কাগজে সংবাদ পড়ে
কেউবা আবার, নাট্যশালে করে পদার্পণ।
সুদৃশ্য আসনে বসে মহিলারা আমাদের
কৃতার্থ করেন, যেন বিনি বেতনের শিল্পী

নড়েচড়ে কথা বলে করে যান দিব্যি অভিনয়।
তোমার নাটক যদি বয়ে আনে সফলতা
কবির হয়ত সপ্তম স্বর্গে
আনন্দে উড়িয়ে দেবে কল্পনার ঘোড়া।
যদি বন্ধু জানতে চাও আসল সংবাদ
খোলা চোখে চেয়ে দেখ পৃষ্ঠপোষকের রুচি
কিরকম তারা— এক শ্রেণী কাঁচা অতি
অন্য শ্রেণী বরফের মতন শীতল।
অভিনয় সাঙ্গ হলে কেউ খেলে তাস-পাশা
বারাঙ্গনা বুকে নিয়ে কেউ করে রাত্রি উজাগর।
তা বলে কি স্বর্গমুখী ধাবমান আকাঙ্ক্ষা তোমার
স্তব্ধ হয়ে যাবে উৎসমূলে
কিংবা কবিতা-লক্ষ্মীকে তুমি ভক্তিভরে করবে না মুগ্ধ সম্ভাষণ?
আমার সুযুক্তি মত গেঁথে তোল
নাটক তোমার, ক্রমে ক্রমে টের পাবে
এভাবে নিজেকে রাখতে শেখ আপন সীমায়,
জনমন তুষ্ট করা দেবতারও সাধ্যের অতীত
তাই দাও নানান মিশাল যুক্ত ঝাঁঝাল ব্যঞ্জন
ও কি কবি, মুখের ভঙ্গিমা দেখে বুঝতে পারি না
কোন্ ভাব হৃদয়ে বিচরে— আনন্দ না ক্ষোভ?

কবি : এই দণ্ডে যাও তুমি বেঁধে আন কোন ক্রীতদাস
বল কোন্ কবি পারে,
স্বর্গজাত অমৃতে তার জন্ম অধিকার ক্ষুণ্ণ করে
নিজেকে নামিয়ে নিতে দাসত্বের স্তরে।
মানুষের কামনার সারভাগ সহযোগে
কে করে মজদুরি বল সংকীর্ণ প্রহরে।
বল কোন্ উৎস থেকে আসে
ভুবনবিজয়ী শক্তি প্রতিটি অন্তর করে জয়
যেমন গুণীর হাতে কম্পমান বীণায় হৃদয়।
অন্তর্গত মনোলোক মান্য করে সুরের শাসন
বেহালার ছড় থেকে প্রাণকোষে যে শক্তি সঞ্চারে
তার বলে নবীন ব্রহ্মাণ্ড গড়ে ছন্দ-লয়-মিলে
সে কি হবে বিদূষক?
নিসর্গের সংগোপনে সূত্রগুলো
সর্বক্ষণ ঘূর্ণায়মান অনাদ্যন্ত বেগে
ঘর্ষণে-ঘর্ষণে জাগে বিসংগত ধ্বনি,

নিরেট পাথর যেন শব্দেপুঞ্জ ঠনঠন্ বেজে যায়
সংগতিবিহীন, গায়ে গায়ে ঠেকে থাকে মিলমিশহীন।
বল কে যে তবে মন্ত্র বলে একটি ফুৎকারে
এলোমেলো ধ্বনি থেকে জন্ম দেবে
লঘুপক্ষ সুমিত সঙ্গীত, সুরেলা নিশ্বাসে যার
উন্মুলিত অন্তরের শিরা-উপশিরা
আত্মার গহনে নামে, শান্তি মনোরমা।
বল আবেগের সিংহাসনে বসে কোন্ জন
সন্ধ্যার শোণিতে করে সংকীর্তন'— ধীরশান্ত মৃদু বোলে
প্রেয়সী চরণপ্রান্তে কে ছড়ায় বসন্তের রক্ত পুষ্পমালা
সম্মানের সিংহদ্বার কে রাঙায় কল্পনা শোণিতে।
বল হীনজন প্রাণবান বাক্য কোথা করে উচ্চারণ,
যাতে স্বর্গ ধরা পড়ে দেবদল করে কোলাকুলি
মানুষের মহিমাকে দেবতার স্তরে
নিয়ে যেতে একমাত্র কবিকৃতি পারে।

নট : তাহলে এবার বন্ধু কাজে যাও লেগে
যাদুকরি প্রেরণাকে ইচ্ছামত কর ব্যবহার
কাজে নাম দৃঢ় কিন্তু অতি সন্তপর্ণে।
ধরে নাও মজে গেছ প্রেমে...
যেতে যেতে তার সঙ্গে দেখা হল
কুহকী মমতা এসে অন্তরে জড়াল,
বারংবার চিন্তা কর আনন্দিত মনে
যেন অন্তরের প্রেমতরু দর্শন-স্পর্শনে
নীরবে বর্ধিত হল পল্লব মুকুলে।
পহেলা সাচ্চা হবে, বাধাগুলো কর নিরীক্ষণ
হাওয়ায় উড়াল মার, তারপর নামো অকস্মাৎ
দারুণ তিক্ততা মাখা মধুময় রসে।
দেখতে পাবে হয়ে যাবে দ্রুত সমাপন
তোমার আরব্ধ কর্ম রোমাঞ্চকথন।
নাটক জমাতে হলে তুলে আন সেই বন্ধু
বাস্তব জীবনে যার নিত্য অধিষ্ঠান।
সুখদুঃখ হাসিকান্না মিলিয়ে মিশিয়ে
মানুষও মানুষীর রসে পূর্ণ করে জমাও নাটক।
সনাতন ও কাহিনী, তবু তার নিহিতার্থে
পাল্টে যাবে সব, সেই রক্ত সূত্রটিকে ঘিরে
বুনে যাও বাক্যজাল মৌমাছির মত।

প্রতি ফুলে ধরা দিত রাঙ্গা প্রতিশ্রুতি
প্রতি অধিত্যকাতলে শান্তি নিথর নিবিড়।
আমার সঙ্গীত রসে পুষ্পবৃন্তে কলি
শিউরাতো ক্ষণে ক্ষণে শাখা-প্রশাখায়।
নিতান্ত দরিদ্র তবু প্রাণে ছিল সত্যের আগুন
দৃষ্টির সম্মুখে ছিল প্রসারিত উদার আকাশ।
আমাকে ফিরিয়ে দাও হৃদয় শোণিতে সিক্ত
সেইসব দিন
বেদনা ঘনিয়ে তোলা অতল প্রশান্তি দাও
ঘৃণার সে তীব্র শক্তি দাও
পুনর্বার দাও প্রাণে প্রেমের যাতনা
আহা, আমাকে ফিরিয়ে দাও যৌবন আমার।

নট : মল্লযুদ্ধে যদি তুমি রত হতে চাও
তোমার যৌবনে সখা বড় প্রয়োজন;
কিংবা ষোড়শীর উষ্ণ আলিঙ্গনে ধরা দিয়ে
ধিকি ধিকি প্রেমতৃষ্ণা মিটাবার চাও,
নতুবা দূর থেকে দৃশ্যমান ঝলমলে লক্ষ্যবস্তু
যশ-মাল্যগাছি জিনে যদি নিতে চাও;
গোটা রাত মহানন্দে নেচে-গেয়ে
প্রভাতী তারার স্তবে আন্দোলিত চাও যদি হতে
তোমার যৌবন ধনে বড় প্রয়োজন
সখা হে উপযুক্ত তারে যদি করুণ ঝঙ্কারে
উদ্দেশ্য গোপন রেখে একটুকু টোকা দিতে পার
প্রতিটি অন্তর হবে প্রসারিত সুরে-সুরে!
পোষিত বিহঙ্গসম ইচ্ছামত সুরকে খেলানো
নিয়ে যাওয়া উচ্চ থেকে উচ্চতর গ্রামে
প্রকৃত গুণীর কর্ম আমি তাকে বলি।
মস্তকে বর্ষিত হোক লক্ষ সাধুবাদ
ক্ষতি নেই বিলক্ষণ
আমরা বয়সে নই শিশু রই মনে।

অধিকারী : থামাও থামাও তবে কথা ছোঁড়াছুঁড়ি
আমি চাই শুরু হোক কাজ।
অসার বিতর্ক রেখে একচিত্তে রত হতে যদি
জটিল সংশয় গ্রন্থি খসে যেত, কর্ম পেত গতি।
কেন বল বারংবার প্রেরণার কথা
দ্বিধান্বিত চিত্তে কবে কে পেয়েছে স্বর্গের প্রসাদ

অন্তরের অন্তস্থলে যদি থাকে বাণী
ফোটাও কবিতা তবে কুসুমের মত
জ্ঞাত আছ বিলক্ষণ আমাদের দাবি।
প্রয়াস ঝিমিয়ে গেছে, জাগো বন্ধু
কষে ধর হাল, অদ্যকার কাজ
সমাপ্ত না কর যদি করতে হবে কাল
দিয়ো না হেলায় যেতে একটি দিবস।
বিশ্বাস স্পন্দিত বক্ষে ঝাঁপ দাও কর্মের সাগরে
দুই হাতে জাপটে ধর, প্রতিজ্ঞায় বাঁধো প্রাণমন,
কর্ম নিজে খুঁজে পাবে গতি
সুনিশ্চিত হয়ে যাবে দ্রুত সমাপন
তোমার আরব্ধকর্ম আলেখ্য কথন।
জার্মানির নাট্যশালা সবার নিরীক্ষাতীর্থ
যেমনটি ইচ্ছা যার নাট্যকলা করে রূপায়ণ।
আজ এই শুভদিনে আমাকে নিযুক্ত রাখ
যদি চাও এনে দেব
যন্ত্রপাতি জেল্লাদার সেকেলে পোষাক।
দৃশ্যপটে সূর্য আঁক রুদ্র তেজীয়ান
চাঁদের কিরণ ধারা কোমলসুন্দর।
আমাদের নেই কোন বেলোয়ারি ঝাড়ের লণ্ঠন
রঙমশালের আলো, তাই আকাশে জ্বালিয়ে দাও
ঝাঁকে ঝাঁকে তারার চেরাগ।
পশুপাখি নেই তাই, নিয়ে এস
শৈলচূড়া নির্ঝরিণী নদী তীরে কল্লোলিত
সমতল মৃত্তিকা বিধৌত এক রোমাঞ্চ কথন
অপূর্ব আমেজমাখা গভীর গহন।
আমাদের সংকুচিত নাট্যশালে
তাবত বিশ্বের লীলা কাছে থেকে দূরে
অপরূপ লাস্যভরে চঞ্চল শিখার মত
ক্ষিপ্রগতি নৃত্য পরায়ণ, দ্রুত আসে দ্রুত যায়
কল্পনারও ঘটে পরাজয়, স্বর্গভাসে
মানুষের অন্তরের ধবল কামনা
মৃত্তিকার ছবি জাগে
নরকে দাউ দাউ জ্বলে অগ্নি ভয়ঙ্কর।

স্বর্গলোকের প্রস্তাবনা

[স্বয়ং খোদাতালা। ফেরেশতাবৃন্দ। একটু পরে এল মেফিস্টোফেলিস।
তিনজন প্রধান ফেরেশতা সম্মুখে এগিয়ে এসে দণ্ডায়মান হলেন।]

ইস্রাফিল

দ্রুত ধায় দিব্য রথে দীপ্ত দিনমণি
বজ্রেরা বাজায় পথে রুদ্র বাদ্যধ্বনি।
সৃষ্টির প্রথম দিনে প্রাণ পেল যে সঙ্গীত
অপরূপ চলমান গতি ভঙ্গিমায়
সূর্য আর সহযাত্রী জ্যোতিষ্কমণ্ডল
ঘনীভূত অনুরাগে আজো সে একই গান গায়
অনুপম অতুলন বিধাতৃ সৃজনলোক
অকলঙ্ক সুন্দর মহান
আদি সৃষ্টি সকালের দীপ্র প্রতিভায়
কান্তি ধরে জেগে আছে মোহন মায়ায়।
ভয়ার্ত ব্যাকুল চোখে অসহায় ফেরেশতারা
অনাদি অনন্ত পানে যখন তাকায়
শক্তির চঞ্চল দোলা শিহরে পাখায়।

জিব্রাঈল

খরতর তীব্রবেগে সুন্দর ভূলোক ছোটে
নিশিদিন ঘূর্ণমান বিরামবিহীন
এক উজ্জ্বল গোলক,
সোনালি সূর্যের শিখা নাচে তার সর্ব অঙ্গে
ঢলঢল আলোর লাবণি।
গম্ভীর রজনী নামে পালাক্রমে
ব্যাপ্ত করে ভয়ঙ্কর কৃষ্ণ যবনিকা
চরাচর ধরে এক ভীষণ মূরতি।
সফেন সমুদ্র নাচে তরঙ্গ দোলায়
ক্ষুধার্ত সিংহের মত প্রচণ্ড চিৎকারে
অভ্রভেদী গিরিশৃঙ্গে কর্কশ বিদ্রূপ হেনে
ফেটে পড়ে শৈলমূলে নির্মম নির্ঘোষে
এই মত সাগর ভূধর অবিরাম
ক্লান্তিহীন করে আবর্তন।

মিকাইল	স্থলে আর সিন্ধুজলে
সিন্ধু থেকে স্থলভূমে
গতির সংরোগভরা শৃঙ্খলিত ঝঞ্ঝা এক
বিধ্বংসী নেশায় ঘোরে
যেন নাচে মূর্তি ধরে ভয়াল সুন্দর।
তরুণ বজ্রের দল সদম্ভ হুঙ্কারে
ঘর্ষণে ঘর্ষণে জ্বালে হুতাশন শিখা।
হে প্রভু, সৃষ্টির পিতা, ত্রিলোকের পতি
আপনার অন্তহীন মহিমা সকাশে
যুক্ত করে নম্র প্রার্থনায়
স্বর্গবাসী ফেরেশতারা সবিনয়ে মস্তক নোয়ায়ে
প্রসন্ন আলোকভরা প্রস্ফুটন্ত দিবসেরে
স্বাগত জানায়।

ফেরেশতা একসঙ্গে : প্রভু হে সৃষ্টির নাথ
আদিহীন অন্তহীন তোমার সৃজনলোক
বিস্ময়ে নেহারে
তরল ধারায় নাচে সঞ্জীবনী শক্তিপুঞ্জ
ফেরেশতা অন্তরে।
তোমার গৌরবদীপ্ত মহীয়ান কীর্তিমালা
সৃজন সকালে ছিল যেমন আকার
সেই শোভা, সেই নবীনতা
নয়নে ঘনিয়ে তোলে অপূর্ব মুগ্ধতা।

মেফিস্টোফেলিস	আরো একবার বিশ্বপ্রভু করলে গ্রহণ
সেই অনুগ্রহে করে ভর
এলাম সম্মুখে পুনঃ বিধাতা তোমার।
শোন তবে বিশ্বনাথ
চলছে কেমন ধারা সয়াল সংসার
একদা আমিও এই দিব্য জ্যোতির্লোকে
আনন্দে করেছি বাস
শিশিরের মত পান করেছি করুণা।
অদ্যদিনে আমার মুখের বাক্য
যদি তোলে জ্যোতির্লোকে সুউচ্চ ধিক্কার
হে প্রভু মার্জনা কর।
শয়তানের কণ্ঠে যদি উর্ধ্বমুখী স্তব জন্ম নয়
সবার বিচারে হবে বিদ্রূপের সরস বিষয়।
যদি করি নিজ মুখে দুখের বাখান

তোমার হাসির শিখা
লক্ষ লক্ষ সূচিমুখে বিঁধাবে আমার অঙ্গ
তপ্ত তাজা অগ্নির সমান।
সূর্যচন্দ্র নীহারিকা জ্যোতিষ্কমণ্ডল
তোমার অপূর্ব কীর্তি উচ্চ মহীয়ান
চলে তারা চক্র পথে দ্রুত তীব্র তালে
চলুক অনন্তকাল ক্ষতি নেই তাতে।
শুধু দু'ঠেঙে মানুষ আর মানুষের অদ্ভুত বিকার
সত্য কহি খোদাতালা এই শুধু ভাবনা আমার।
অতিশয় খর্বকায় পৃথিবীর ক্ষুদে মহারাজ
আজব স্বভাব তার
প্রথম সৃজন ভোরে পেয়েছিল যেমন আকার
অবিকল রয়ে গেছে তেমন গাদ্দার।
কষ্টের কন্টকমুক্ত হত তার পার্থিব জীবন
যদি কৃপাভরে বিশ্বপ্রভু চেতনার মূলে
অনুরাগে না পরাতেন
প্রগাঢ় হরিদ্রা বর্ণ আলোর তিলক
যাকে সে বলেছে বোধি
যার বলে হয়ে বলীয়ান
পশুত্বে সে পশুদেরও সীমানা ছাড়ায়।
নিতান্ত গরিমাহীন ঘাসফড়িঙের মত
ভূমিপৃষ্ঠে ক্রমাগত লম্ফ দিয়ে চলে
উর্ধ্বপানে শুঁড় তুলে কর্দম মৃত্তিকা পঙ্কে দেয় গড়াগড়ি।
তবু তার কণ্ঠে ঝরে সেই এক পুরনো সঙ্গীত
মাটিতে লুটায় বটে বুকে জ্বলে বেদনার চিতা
দুষ্ট দৃষ্টি বার বার পাপ পথে ধায়।

খোদাতালা — অধিক বলার আছে?
নালিশ সে তো তোমার সত্তার অংশ
কিছুই তোমার চোখে ঠেকেনি সুন্দর?

মেফিস্টো — না-হে প্রভু, সত্য কহি
তোমার এ দুনিয়াটা অতিশয় খল
সেখানে মানুষ গেলে
এত বেশি পাপে ডোবে
শয়তানও বিরক্ত হয় চাতুরী খেলাতে
পাপপুণ্য বোধহীন পামর মানুষ।

খোদা — ফাউস্টকে চেন তুমি?

মেফিস্টো	সেই যে পণ্ডিত।
খোদা	অনুগত সেবক আমার।
মেফিস্টো	খোদাতালা কর অবধান
সে এক আজব লোক অনুগত অতিশয়।
ধরণীর বস্তুপুঞ্জে অরুচি ভীষণ
কখনো কখনো তাকে অন্তরের জ্বর
আকাশে উড্ডীন করে
মুছে যায় তার চোখে সঙ্কীর্ণ সীমানা
সংশয় মত্ততা মিশে কাঁপে তার ডানা।
সুচিত্রিত ইন্দ্রধনু বর্ণ সুকুমার
মস্তকে জড়াতে চায় স্বর্গের চাদর
ধরণীর বস্তুরাশি ছুঁয়ে ছেনে, সে চায়
নির্মল আনন্দধারা শিল্পের নির্যাস।
নিকটে সুদূরে ভাসে যেইসব দৃশ্যাবলি অতি মনোহর
যেই সব শব্দপুঞ্জ প্রীতিপদ মনুষ্য শ্রবণে
কিছুতে মজে না মন
জেগে থাকে নিশিদিন অন্তরে অসুখী।
খোদা	যদিও বন্দনারত সেবক আমার
মোহের ছলনা তার অন্তর ধাঁধায়।
অতি শীঘ্র সুনির্মল আমার আলোক
হতাশার প্রান্ত থেকে টেনে নেবে তাকে।
বীজ বপনের কালে কিষাণ হৃদয়ে
যে-রকম হরিতাভ আশা জন্ম লয়
চেকন সুতার মত ক্ষীণ বীজাঙ্কুর
ফাগুনের ফুলে-ফলে ভরে দেবে ক্ষেত
হেমন্তে দোলাবে আ-হা
উজ্জ্বল কনকবর্ণ আয়েশি ফসল।
মেফিস্টো	বাজি রেখে বলি
যদি পক্ষপাতহীন থাকে
আপনার প্রখ্যাত করুণা
মনোমত পথে তাকে টেনে নিতে পারি।
খোদা	যেমনটি ইচ্ছা তুমি চাতুরীর কর ব্যবহার
যতকাল মনুষ্য নিবাসভূমি থাকবে পৃথিবী
স্বতঃসিদ্ধ এ মানুষ চেষ্টার আলোকে
নিশ্চিত ঝালিয়ে নেবে নব পরিচয়।
তবে, একথাও মিথ্যা নয়

মাঝে মাঝে ভুলস্রোতে ভাসাবে সে
চেষ্টার সাম্পান।

মেফিস্টো
খোদাতালা, বহু মেহেরবানি
অকপট কণ্ঠে বলি
নিতান্ত লজ্জার কথা ঘাটের মরার পিছে
সুনিপুণ প্রয়াসের অপব্যবহার।
ভোজের আনন্দ পাই, যদি মেলে
উজ্জ্বল নধর গণ্ড রক্তিম কপোল।
মৃত অর্ধমৃত নিয়ে সুখে সেই চাতুরী খেলিয়ে
ইঁদুর ও বিড়ালের সম্বন্ধ যেমন
সে-করম ক্ষিপ্রগতি অথচ নিষ্ঠুর
খরতর খল বড় দ্বন্দ্বপরায়ণ
আমার স্বভাব খানি।

খোদাতালা
তবে তাই হোক
দিলাম তোমার হাতে অপার ক্ষমতা
যদি পার ছিঁড়ে নাও
আত্মা তার উৎসধারা থেকে।
নিয়ে যাও অধঃপতনের অন্তিম সীমায়।
চূড়ান্ত সময়ে তোমার শক্তির কাছে
যদি না সম্পূর্ণরূপে মানে পরাভব
মনে রেখ
নিতান্ত লজ্জিত হবে পুনরায় দাঁড়ালে সমুখে।
যে মানুষ সত্যবান আপন অন্তরে
দিগ্বিদিক চিহ্নহীন ঘন অন্ধকারে
কুয়াশার ভ্রমচক্রে কমনীয় আত্মার আলোক
সত্যপথ অনিবার দেখাবে সঠিক।

মেফিস্টো
প্রভু হে, রাজি আমি
বাজিতে নিশ্চিত জেতে একরম দ্রুতগতি তুরঙ্গম সম
জিতি যদি, তুমি প্রভু নিরঞ্জন পুরায়ো বাসনা
নিজ হাতে তুলে দিয়ো দীপ্ত জয়মালা।
আপন আদিম ভ্রাতা সর্পের সমান
মৃত্তিকা সে নিত্য খাবে
কর্দম মৃত্তিকা পঙ্কে দেবে গড়াগড়ি।

খোদাতালা
নাও তুমি ইচ্ছামত আপন সুযোগ
তোমার স্বজনবৃন্দে নেই কোন রোষ, কোন ঘৃণা।
যেই শক্তি সমস্ত মহত্ত্বকে করে অস্বীকার

সে তার সঙ্গে অনায়াসে পাল্লা দিতে পারে।
আরামের কোলে শুয়ে সুখে নিদ্রা দিতে চায়
যেহেতু মানুষ, মুখ বুঁজে থাকে তার দুর্বল প্রয়াস
কর্মধারা তীব্রস্রোতে ছোটে না সমুখে।
তাই আমি শয়তানে পাঠাই—
আঘাতে-সংঘাতে ঘটে তীব্র জাগরণ
তারপর অন্তরের রাঙ্গা অনুরাগে
সৃষ্টিকে লালন করে শ্রমে আর স্বেদে।
ওহে অমৃতের সন্তানের দল,
জাগ্রত সৌন্দর্যলোকে স্থির দৃষ্টি রেখে
আনন্দে নিবাস কর
জীবন ভরিয়ে তোল জীবনের পরিপূর্ণতায়।
মুক্ত কর প্রাণ, করুক মোহনকেলি জীবনের জল
যেন এক প্রাণবান বর্ধিষ্ণু ফোয়ারা
ছলকে ছলকে নাচে পূর্ণতার সাক্ষাৎ প্রতীক।
যা কিছু সঞ্চরমান, দৃষ্টির সম্মুখে ভাসে
বিন্দু বিন্দু ঝরে পড়া প্রাণের কণিকা আহরণ কর সব;
মননের স্পর্শে কর চির আয়ুষ্মান।
[স্বর্গদ্বার বন্ধ হল, ফেরেশতারা গমিত হলেন]

মেফিস্টো

মাঝেমধ্যে তার সঙ্গে দেখা করে সুখ
সতত সচেষ্ট থাকি যাতে থাকে সম্পর্কটা ভাল
একটু আস্পর্ধা বটে;
তিন ভুবনের এত বড় কর্তা মহাশয়
বন্ধুভাবে শয়তানেরে স্বাগত জানায়।

প্রথম দৃশ্য

বিয়োগান্ত নাটক

নিশিরাত : ফাউস্টের পাঠকক্ষ (এক)
[গাথক ধাঁচের তৈরি একটি সংকীর্ণ পরিসর কক্ষে ফাউস্ট ডেস্কের সামনে উপবিষ্ট। অত্যন্ত চঞ্চল এবং অশান্ত।]

ফাউস্ট

করেছি দর্শন পাঠ ব্যগ্র কুতূহলে
আইনশাস্ত্র চিকিৎসার গুপ্ত সারাৎসার
তুলনাবিহীন শ্রমে অধিকারে এনেছি আমার
ডুবুরির মত ডুবে ধর্মতত্ত্ব করেছি মন্থন।
কাণাকড়ি মূল্যহীন
এইসব স্বেদসিক্ত অন্তরের শ্রম
এখনো পূর্বের মত রয়েছি নির্বোধ।
সুপণ্ডিত উপাধ্যায় খেতাব আমার
কণ্ঠভরা সুগম্ভীর বাক্যের ঝঙ্কারে
দশটি বছর
নাকে ধরে ঘুরিয়েছি শিষ্য দলে দলে।
যে পথে যাই না কেন সোজা কিংবা বাঁকা
আমি তো নিশ্চিত জানি
অবশেষে অজ্ঞতাই ভাগ্য আমাদের।
একথা যখন ভাবি ঘৃণায় কুঞ্চিত হয় সমস্ত শরীর।
সত্য বটে, তাবত পণ্ডিতকুল, উপাধ্যায় দলে
মামুলি শিক্ষক আর ধর্মের বেপারি
সবারে পেছনে ফেলে একা আমি গেছি বহুদূর।
তর্কশাস্ত্রে সুনিপুণ
সমস্ত দ্বিধার রেখা, সন্দেহ-কন্টক
চোখের পলকপাতে করতে পারি দূর।
নিঃশঙ্ক আমার চিত্ত নরকে করি না ভয়
শয়তানেরে সমুচিত শিক্ষা দিতে পারি

এসব কিনেছি আমি জীবনের আনন্দের দামে।
জেনে গেছি অন্তহীন জ্ঞানের ছলনা
যা কিছু শেখাই তার শূণ্যতার ভার
পাথরের মত জমে দীর্ণ অন্তর্লোকে
চেতনা উদ্বুদ্ধ করা অসাধ্য আমার।
নিদারুণ অর্থকষ্টে আমার দিবস কাটে,
আমার রজনী কাটে,
এরকম সংসারের সম্মান বঞ্চিত
পথের কুকর বাঁচে তার চেয়ে ভাল।
তাই অমি প্রেতলোকে ফিরিয়েছি চোখ
যাদুদণ্ড করি ব্যবহার
পৃথ্বির পাতাল থেকে মন্দিরার মত
দেখি জাগে কিনা অভিনব বাণীর নির্ঘোষ।
দেখি প্রেতের অতুল শক্তি
আমার দৃষ্টির মুখে মূর্ত করে তোলে কিনা
নিসর্গের সংগোপন বিষয়-আশয়।
অজ্ঞতার ক্লান্তি থেকে যদি পারি
মুক্তি চাই, মুক্তি চাই আমি।
দেখব শাণিত চোখে কোন্ রসায়নে
সুন্দর জমাট বাঁধে অতি সংগোপনে
ইতস্তত ভ্রাম্যমাণ বস্তুকণারাজি
চরাচর জুড়ে কোন্ অদৃশ্য শৃঙ্খল
বিরাজে গোপন রূপে দৃষ্টি অন্তরালে।

এইক্ষণে তাই বাক্যের বেসাত ছেড়ে
বস্তুর অন্তরে করি একাগ্র মনন।
হে রূপালি আভার রাত শান্ত সুগম্ভীর
আ-হা চাঁদ, চেয়ো না আমার পানে অমন নয়নে।
কত কতবার মধ্যরাতে বিষণ্ন বন্ধুর মত
চেয়েছ আমার দিকে দূরবর্তী ম্লানচোখ মেলে
প্রশান্ত কিরণ করে ছুঁয়েছ কাগজপত্র গ্রন্থ রাশি রাশি
শৈলচূড়া আলো করে পূর্ণিমা নিশীথে
কাননে এঁকেছ আহা ছায়া কালো কালো।
প্রান্তরে ছড়িয়ে গেছ রৌপ্য উত্তরীয়।
জোছনা আলোকসিক্ত বিন্দু বিন্দু রাতের শিশির
করেছে কি নিবারণ অন্তরের দাহ?

জ্ঞানের যন্ত্রণা থেকে মুক্ত করে চেতনা আমার
করেছে কি সম্প্রসার জলে স্থলে
সর্বঘটে আকাশে আলোকে।
চৌদিকে অর্গল ঘেরা সংকীর্ণ খাঁচার মধ্যে
বন্দি হয়ে কাঁদে শোকার্ত বিহ্বল আত্মা
বেদনার্ত দৃষ্টি মেলে দেখি
স্ফটিক দেয়ালে ঠেকে ফিরে যায়
অপূর্ব আলোকধারা নন্দনের পুলকপ্রবাহ।
এইখানে আমি আছি পাণ্ডুলিপি ঘেরা চারিধার
ছাদ ছোঁয়া গ্রন্থস্তূপ, তুলোট কাগজ
অপর্যাপ্ত ধূলিলিপ্ত উপাদেয় কীটের আহার।
স্ফটিকে নির্মিত ভাণ্ড, সরু নল মোটা গলা
পাত্র নানারূপ অভিনব যন্ত্রপাতি
বংশ পরম্পরা সব জমানো ভাঁড়ার
এই স্বল্প পরিসরে গণ্ডিবদ্ধ পৃথিবী আমার।
রে হৃদয়, কেন তুই সংকীর্ণ কোটরে
গুটিসুটি বন্ধ করে পাখা
কেনরে যাপিস কাল উত্থানবিহীন।
বল্ তুই কোথা হল লীন
সঙ্গীত মুখর সেই বসন্তের দিন।
চঞ্চল আবেগ ভরা মধুপ গুঞ্জন,
শোণিত সভায় জাগা অপূর্ব কূজন।
তাহলে কেন রে আমি প্রাণদ নিসর্গ ছেড়ে
হেলা করে অবারিত বিধাতার দান
তুচ্ছ করে প্রশান্ত বাতাস
কেন ছুটি কঙ্কাল জঞ্জাল ভরা মৃত্যু উপকূলে।

এই সে গোপন গ্রন্থ যাতে
লেখা আছে প্রতি ছত্রে দুর্বোধ্য সঙ্কেতে
নস্ত্রোদামোসের যত হুনুর হেকমত
অবশ্য শরণ মাগি আর কিছু করি না কামনা।
তাহলে এখন আমি নবলব্ধ প্রজ্ঞার আলোকে
অন্তরে ঘনিয়ে ওঠা উল্লম্ফিত আনন্দের ডাকে
উজ্জ্বল গ্রন্থের মত পড়ে নেব নক্ষত্রের ভাষা।
নিসর্গ মন্থন করে
কোমল ননীর মত ছেঁকে নেব জ্ঞান

শুনব বিমুগ্ধ কর্ণে
বিশ্বের মনের সঙ্গে উত্তিষ্ঠিত মন
কেমন ভাষায় করে বাক্য আলাপন।
কণ্টকিত যুক্তিজালে কখন দিয়েছে ধরা
স্বর্গের সঙ্কেত, পবিত্র রহস্য রাশি
বুদ্ধিগ্রাহ্য হয় কবে জটিল ভাষায়।
রহস্যের রাজপুত্র সহসা ঘনিয়ে এস
চেতনার বৃন্তে বস শক্তি সিংহাসনে
প্রেতলোক থেকে এস দ্রুত অগ্নিরথে
প্রাণের আবেগ ভরা অশান্ত অধীর
প্রশ্নপুঞ্জে দাও সদুত্তর।
একা আমি বসে আছি
বিষাইছে সর্ব অঙ্গ জিজ্ঞাসার হুলে
হে প্রেতাত্মা,
আমার প্রশ্নের দাও উচিত উত্তর।
(ফাউস্ট গ্রন্থ খুলে মহাবিশ্ব সঙ্কেতের ওপর আলো ফেললেন)

সহসা অন্তরে হল অনাঘ্রাত পুলক সঞ্চার
সর্ব অঙ্গ থরথর নৃত্যপরায়ণ
আমার চেতনলোকে উৎসবের সাড়া
যেদিকেই দৃষ্টি রাখি
ছলকে ছলকে নাচে প্রাণবন্ত যৌবনের প্রদীপ্ত প্রবাহ।
সংখ্যাহীন শাখা পথে শোণিত প্রবাহে ধায়
অপূর্ব লালিমা ভরা তরল আগুন।
কোন্ সে দেবতা গড়েছে আপন হাতে
এই চিত্রলেখা
স্পর্শ সুখে খেলে বুকে শক্তির লহরি
দুঃখরাশি যায় দূরে
সঘন আনন্দ ছোঁয়া কাঁপায় অন্তর।
আত্মার মুকুরে ভাসে সূক্ষ্মতর বিশ্বের মূরতি
নিসর্গের সংগোপন শক্তির লহরি
অপরূপ লীলাভরে প্রাণ পেয়ে জাগে।
তাহলে আমি কি তবে ত্রিদিব নিবাসী দেব
উন্মীলিত দৃষ্টির সমুখে
অনুরাগে মেলে ধরে
জটিল রহস্য ভরা সঙ্কেতের অর্থ সংগোপন।

একি আমি শুনি আজ উদ্বুদ্ধ শ্রবণে
নিসর্গের প্রাণে বাজে সংখ্যাহীন মাকুর গর্জন;
তন্দ্রাহীন নিদ্রাহীন একি আমি শুনি।
কে যেন দ্রষ্টার কণ্ঠে করে উচ্চারণ
রুদ্ধ নয়, বদ্ধ নয় সূক্ষ্মতর জগতের দ্বার;
রে পণ্ডিত তোর প্রাণ মৃত শুধু
তোর চোখে দোলে এক কৃষ্ণ যবনিকা।
জেগে ওঠ, গোলাপি সুষমা মাখা
তরল স্রোতের থেকে প্রাণের প্রবাহ
মন্দগতি শান্ত ধীর নীরব নিটোল,
দু'হাতে অঞ্জলি পেতে পান কর স্বচ্ছ বারিধারা।
খুলে দে-রে অন্তরের রুদ্ধ বাতায়ন
লাগুক সতেজ হাওয়া
আনন্দ মেলুক দল মর্মান্ত হরষে।
(ফাউস্ট তন্ময়ভাবে সঙ্কেতের ওপর মনোনিবেশ করল।)

প্রতিটি বস্তুকে দেখ, দেখ তার অন্তর্গত আশ্চর্য বুনন
মিশ খেয়ে পরস্পর কেমন সক্রিয় হয়
সমগ্রের সঙ্গে করে সঙ্গতি বিধান
ক্রমাগত উল্লম্ফনে উচ্চগ্রামে করে আরোহণ
বেগবতী শক্তি হয়ে তীব্র সুখে ঊর্ধ্বমুখে ছুটে;
জাগ্রত স্বর্গের সিঁড়ি অভিনব স্বর্ণকুম্ভে নিয়ত সাজায়।
ইতস্তত বিচ্ছুরিত বস্তুকণারাশি যে সৌগন্ধ বয়ে আনে
তাদের ডানায় ধরে যে সুমন্দ বেগের আবেগ
প্রতিক্ষণে ঢালে যেই শান্তিরস ধারা
পূর্ণ করে চরাচর— স্বর্গ আর পৃথিবীরে
বেঁধে দেয় একখানি মধুর মিলনে
বেবাক নিখিল যেন তরঙ্গিত সুরেলা বাঁশরি।
আ-হা সংখ্যাহীন শোভাযাত্রা তোমরা সকলে
চলেছ একাগ্র বেগে নববেশে
চলিষ্ণু দৃশ্যের সারি ক্রুদ্ধ চোখে হানছে বিদ্রূপ
স্পর্শন মনন আর রুগ্ন আকাঙ্ক্ষারে।
নিসর্গের জাগ্রত ঝরণা
কোথায় সে ব্রহ্মাণ্ডের মধুভরা স্তন
পয়মন্ত দুগ্ধধারে নিখিলেরে বিলাইছে প্রাণ।
অন্তঃশীলা প্রবাহিনী অপার রহস্যময়ী ব্যাকুল জননী

অকৃপণ হস্তে তুমি করছ বিতরণ
প্রাণদ অমিয়ধারা ধবল বরণ।
তবুও আমার প্রাণে ঝুলে আছে প্রকাণ্ড হতাশা
চিত্ততলে ধু ধু জ্বলে প্রখর পিপাসা
(উদ্বেগসহকারে ক্রমাগত পৃষ্ঠা উল্টাতে থাকলেন এবং তাঁর দৃষ্টি
পৃথ্বি আত্মার সঙ্কেতটির ওপর স্থির হল।)

এই সে সঙ্কেত মনোলোকে নিয়ে এল পূর্ণ রূপান্তর।
ওহে পৃথ্বিআত্মা আনন্দে ঘনিয়ে এস
আমার চেতনলোকে দীপ্তি হানে অস্থির দামিনী
অন্তরের অন্তঃস্থলে জাগিছে অন্তর
শক্তিপুঞ্জ নাচে যেন উদ্ধত কেশরী।
দৃষ্টিশক্তি বিঁধে ফেলে বিশ্বচরাচর
আঁখির পলকপাতে ঝরে যায় সুবর্ণ মদিরা।
নবীন শক্তির বলে গরীয়ান আমার অন্তর
স্পর্ধাভরে আপনারে সমস্ত বাধার মুখে ঠেলে দিতে পারি,
দুর্দৈবের কালো মুখে পদাঘাত হেনে
ঊর্ধ্বে রেখে শির
প্রবল ঝঞ্ঝার সঙ্গে ইচ্ছা হয় পাঞ্জা লড়ি।
চূড়ান্ত ক্ষতির মুখে অটল দাঁড়িয়ে থাকি অকম্পিত বুকে
গিলে খেলে সপ্তডিঙ্গা সমুদ্রের ফেনশীর্ষ নীর
একা আমি জেগে রবো চন্দ্রধর বীর
যেন নীলিমা বিদীর্ণ শির স্থির হিমাদ্রির।
আসমানে জমেছে আহা পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ
চাঁদ গেছে ঢেকে নিভে এল আলো
মস্তকে নর্তন করে ভাব বাষ্পরাশি
যেন সোনালি শৈলের পোনা
কিলবিল জাগে সংখ্যাহীন লোহিত বুদ্বুদ।
ছাদ শীর্ষ ভেদ করে কে আসে দুর্বার বেগে
গম্ভীর জীমূত মন্দ্রে তোলে উচ্চ রোল
দৃঢ় বলে কে আমারে করে আলিঙ্গন?
আমি জানি তুমি সেই পৃথ্বিআত্মা
ভয়ঙ্কর বিকট দর্শন
আমার দৃষ্টির মুখে তিষ্ঠ ক্ষণকাল
ভয়ঙ্কর বিবসন প্রচণ্ড সুন্দর।

সহসা অন্তরে হল বিদ্যুৎ সঞ্চার
অনুভূতি নৃত্য করে আগুন বরণি
শোণিত গঙ্গায় খেলে উজান লহরি
সৃষ্টিসুখে মন ক্রমাগত পাখা ঝাড়ে
যেন এক অতিকায় ফুটন্ত শিমুল।
আমার আমাকে আমি কোন্‌খানে রাখি
পৃথ্বিআত্মা দণ্ডবৎ চরণে তোমার
দিলাম দিলাম সঁপে তনুমন প্রাণ।
যায় যাক সব কিছু মুখোমুখি দাঁড়াব তোমার
নইলে জীবনখানি তুচ্ছ বলে মানি।
(ফাউস্ট গ্রন্থটি তুলে নিয়ে গোপন সঙ্কেতের গূঢ়ার্থ উচ্চারণ করলেন, সঙ্গে সঙ্গে লোহিতবরণ অগ্নিশিখা বিনির্গত হল এবং অন্তরাল ফুঁড়ে অগ্নিময় ভূষণে বেরিয়ে এলেন পৃথ্বিআত্মা।)

পৃথ্বিআত্মা	সুকঠিন নিদ্রাঘোর করেছ হরণ
বল, আমাকে ডেকেছ কোন্ জন।

ফাউস্ট	ভয়ঙ্কর রুদ্রকান্তি বিকট দর্শন
অদ্ভুত মূরতি তুমি?

পৃথ্বিআত্মা	একাগ্র মনন বলে নিয়ে এল টেনে
তোমার ধ্যানের ধ্বনি গম্ভীর পাতাল তলে
হেনে তীক্ষ্ণ অগ্নিদীপ্ত ছুরি
ভেঙ্গেছে কঠিন ঘুম, তাই এলাম
কি তোমার অভিলাষ।

ফাউস্ট	আশরীর ভয়ে কম্পমান
দূরে থাক আতঙ্কের বিকট মূরতি।

পৃথ্বিআত্মা	রুদ্ধশ্বাস প্রতীক্ষায় প্রাণপণে করে গেছ শ্রম
দেখবে আমার কান্তি এ তোমার তীব্র অভিলাষ
মুখোমুখি দাঁড়াবে সমুখে
তাই সমস্ত শক্তিকে তুমি ঘনীভূত করে প্রার্থনায়
ডেকেছ ব্যাকুল কণ্ঠে প্রাণদীপ্ত স্বরে।
স্তূপাকার অন্ধকারে পশে সেই ধ্বনি
আষ্টেপৃষ্ঠে বন্দি করে কঠিন শৃঙ্খলে নিয়ে এল
চেয়ে দেখ এই আমি দাঁড়িয়ে সমুখে।
হে অতিমানব বল দেখি কিসের তরাস
করেছ তোমার ঠোঁট এমন মলিন
অন্তর্হিত হল কই অন্তরের মরমি চীৎকার।

বিশ্বলোক সৃজনের শক্তিমন্ত প্রেরণা তোমার
পালন ও পোষণের প্রারম্ভিক মহা অঙ্গীকার
বল তবে কই গেল সখা হে আমার।
ঊর্ধ্বমুখী মহীয়ান আকাঙ্ক্ষার টানে
যে হৃদয় ঝলোমলো ছিল জ্যোতিষ্মান
সগর্বে করেছে দাবি দেবতার স্থান
এই ক্ষণে হারাল কোথায়?
তুমি কি সেই সে লোক স্পর্ধিত ধ্যানের ধ্বনি
তন্দ্রাতুর কর্ণদেশে করে গুঞ্জরণ, তীব্র তার আকর্ষণ
আমাকে প্রবল বেগে ধাবন করেছে পথে
শুনেছি প্রহর উঠেছে ভয়ে জয় জয় গানে।
তুমি কি সে একই লোক
আমার দর্শনমাত্র আতঙ্কে আশরীর হও কম্পমান
সত্রাসে গুটিয়ে যাও যেন এক অতিকায় ঘৃণ্য কৃমিকীট।

ফাউস্ট
অগ্নিপুত্র শোন,
আমি কি তোমার ভয়ে হব কম্পমান
ফাউস্ট আমারই নাম
নির্ঘাত সকল দিকে তোমার সমান।

পৃথ্বিআত্মা
জীবনতরঙ্গে নিনাদিত রঙ্গে ঝটিকাগতি কর্মধারায়
আমি বেগে ধাই পারাপার নাই জীবন-মৃত্যু নাগরদোলায়
দুলছে সতত অযুত নিযুত লক্ষ লক্ষ দোদুল মুরতি
পারাপারহীন প্রবাহে বিলীন খলখল রবে ফুকারি ফুরতি
ফেনার শিয়রে জীবন ভাসে রে সাগরে সাগরে ছুটাই লহরি
কালের চাকাটি ধরে পরিপাটি ঘুরায়ে ঘুরায়ে যাই কাজ করি
মঞ্জুল সুর প্রাণে ভরপুর দেবতার গান ঊর্ধ্বে তুলি রে
দেবতার গানে জীবনের মানে পাকে পাকে যায় খুলি রে।

ফাউস্ট
গতিমান পৃথ্বিআত্মা
দিকে দিকে অন্তহীন লীলাপরায়ণ
তুমি যেন অবিকল হৃদয়ের ভাই
তুমি-আমি অহর্নিশ একই লক্ষ্যে ধাই।

পৃথ্বিআত্মা
মননে ধরেছ যারে হতে পার সমকক্ষ তার
তুমি নও সমান আমার
(পৃথ্বিআত্মা অন্তর্হিত হলেন)।

ফাউস্ট
তুমি নও কে তবে সমান আমার
বিধাতে গড়েছে যারে আপন মুকুরে
সে নয় তোমার জুড়ি

(এই সময়ে দরজায় টোকা পড়ল)
হায় পাপের মজদুরি আমি করব চিরকাল
সম্পন্ন আকাঙ্ক্ষাপুষ্প ঝরে গেল দ্বিধার কারণে
কপাটে আঘাত হেনে জ্ঞানরাজ্যে ভারবাহী জীব;
দৃষ্টি হতে কেড়ে নিল
অতুল আনন্দ ভরা নয়ন লোভন
স্বপ্নসম চমৎকার প্রিয় প্রেতলোকে।
(রাত্রিবাস পরনে টুপি মাথায় আলো হাতে ভাগনারের
প্রবেশ। ফাউস্ট অনিচ্ছুকভাবে তার দিকে তাকালেন)

ভাগনার — অপরাধ করুন মার্জনা
মনে হল মহাত্মন রজনীর নিস্তব্ধ প্রহরে
একরাত অধ্যয়নে গ্রিসিয় নাটক
পাণ্ডিত্যমণ্ডিত আহা অপরূপ শিল্পকলা
নিতান্ত আমার মত আনাড়ি যে লোক
তারও মন হেঁচকা টানে করে আকর্ষণ।
রাত্রে তাই আগমন, সুধীজন করেন যখন
উদাত্ত গম্ভীর রবে গাঢ় উচ্চারণ
লোক সমষ্টির প্রাণে বৃষ্টিধারা সম নামে গভীর সন্তোষ।
প্রকৃত শুনেছি আমি রঙ্গমঞ্চ হতে পারে
চমৎকার আকর্ষণময় বিদ্যাপীঠ
ধর্মযাজকের মনে অভিনেতা দিতে পারে সুন্দর প্রেরণা।

ফাউস্ট — চমৎকার যুক্তি বটে
হামেশা তো এরকম ঘটে সবখানে
যাজকেরা অভিনয়ে দড়ো হয় বড়।

ভাগনার — শীত-গ্রীষ্ম বারোমাস বিরতিবিহীন
যদি সংকুচিত আয়তনে আটকে রাখি জ্ঞানের সাধনা
স্ফটিক বাতায়ন থেকে মানুষকে দেখি যদি
ম্লান পরিচয়ে বেগানার মত
তাহলে তপস্যা-সঞ্চিত ধন
কোন্ উপকারে আসে মনুষ্য জাতির?

ফাউস্ট — অন্তর প্লাবিত কোন অনুভূতি অবারণ স্বতঃস্ফূর্ততায় যদি
অন্তরের মৌল উপাদানে সূক্ষ্মতর ব্যঞ্জনায় না দিল টঙ্কার,
অন্তঃস্থ শক্তির দোলা আবেগী হিয়ায় যদি না করে গুঞ্জন
বৃথা সব শিল্পকর্ম, নিষ্প্রাণ বাক্যের রাশি
নির্বোধের অক্ষম সান্ত্বনা, যদি চাও তাই কর

কলঙ্কিত হোক বর্ণমালা
অপরের পাত থেকে টেনে আন উচ্ছিষ্ট ব্যঞ্জন
কাঁচি আর আঠা দিয়ে জড়ো কর সব
টের পাবে রুচিহীন শিল্পকর্মে
দেয় না সুন্দর শিখা প্রাণের আগুন।
তাই দাবানল জ্বালাবার মূঢ় আকাঙ্ক্ষায়
স্বল্পভস্মে নাড়া দিয়ে প্রবল ফুৎকারে
অনর্থক কর চেচামেচি, যদি চাও শুধু খ্যাতি
মিলবে তোমার ভাগ্যে কতিপয় মূর্খ আর বাচাল বালক
তারা প্রতি কর্মে উচ্চরবে দেবে করতালি।
মনে রেখ প্রাণের গহন থেকে গাঢ় অনুরাগে
তড়িত প্রেরণা স্পর্শে আলোময় যেই রাঙা বাণী জন্ম লয়
তাই করে অধিকার মনুষ্য হৃদয়।

ভাগনার
তবু মনে হয় পরিপাটি ভঙ্গি দিয়ে
কেউ কেউ জয় করে শ্রোতার হৃদয়
তাতে আমি বড় বেশি পিছে পড়ে আছি।

ফাউস্ট
যদি চাও সফলতা, অচঞ্চল সততায় চিত্ত রাখ স্থির
নিছক চীৎকার করে দিয়ো না বাচাল পরিচয়
ন্যায়নিষ্ঠা সত্যসন্ধ বোধ অন্তঃস্থ শক্তির বলে
অনিবার সমুখেতে পথ করে চলে।
যদি থাকে সত্যে স্থির তোমার হৃদয়
সুনামে কি ফল বল যশরাশি তুচ্ছ অতিশয়।
যেই সব বাক্যরাশি কথায় কথায় ঝরে ধারাল চকচকে
মানুষকে কি দিয়েছে?
শুষ্ক জীর্ণ ধুলোমাখা গ্রন্থ রাশি রাশি
স্তূপাকারে সুসজ্জিত পাষাণের ভার
যেন শরতের জীর্ণপত্র পড়ে থাকে বনতলে প্রাণ-স্পন্দনহীন
কিংবা বেণুবনে মর্মরিত উদাসীন হাওয়া।

ভাগনার
সুদীর্ঘ সময় ধরে প্রলম্বিত শিল্পের জীবন
আমাদের আয়ুষ্কাল তুচ্ছ পরিমাণ
একথা যখন ভাবি মনে ও মগজে এক
আতঙ্কিত কৃষ্ণছায়া নামে
উপযুক্ত পন্থা কিংবা রীতি উদ্ভাবন দুরূহ কঠিন বড়
যার বলে মানুষ যায় অমৃতের উৎস ধারামূলে।
মাঝ পথে ভাগ্য করে নির্মম চাতুরী
বিশদ জানার আগে মৃত্যু আসে, সব হয় শেষ।

ফাউস্ট : চমৎকার অতি চমৎকার
যে অমৃত স্পর্শমাত্র অন্তরে আসন্ন করে পূর্ণতার সুর
খোঁজ কর সেই বস্তু ভূর্জ পত্রস্তূপে?
মনে রাখ পাঁজিপুঁথি সকলই নিষ্ফল
অন্তরের উৎসস্থলে উচ্ছ্বসিত গতিবেগে জন্মে নাই যে ধারা
আপন দৈন্যের দায়ে মাঝপথে সে তো হয় হারা।

ভাগনার জ্ঞানগর্ভ আপনার মধুর ভাষণ
আনন্দে ভরিয়ে তোলে ব্যথাদীর্ণ চিত্ততল
অতীতের মনীষীরা দলে দলে প্রাণ পেয়ে জাগে
ছিন্ন করে যুগের বন্ধন
আপনার অপরূপ বাক্যসুধা স্রোতে।
তাঁদের ধ্যানের দীপ্তি চমকে ঝলকে
আলোকিত করে রাখে সঙ্কীর্ণ প্রহর।
তাঁদের প্রমাদ রাশি মেধাবী দৃষ্টির মুখে মূর্ত হয়ে ওঠে
আমরা এখন এসে গেছি
জ্ঞানের সোপান বেয়ে বহুদূর উর্ধ্বতর লোকে।

ফাউস্ট সত্য বটে দৃঢ় পদক্ষেপে উঠেছি অনেক দূর
মনে হয় আকাঙ্ক্ষায় নীলিমা ছুঁয়েছি।
সখা হে যাকে বল মোহময়ী নিদ্রিত অতীত
সে এক গ্রন্থের মত সপ্তস্তর গুণ্ঠনেতে ঢাকা
যুগের অন্তর্বাণী সত্যসন্ধ সাধুদের ধ্যানের আলোক
সকরুণ বেদনার্দ্র তাঁদের সে পুণ্যশ্লোক স্মৃতি
দৃষ্টির পলক মাত্র মানুষেরা করে পরিহার
ছুঁড়ে ফেলে নর্দমায় কিংবা কোন আবর্জনা স্তূপে
ভাগ্যবান কেউ কেউ শব্দসার তর্কের বিষয়।
সঙ্কীর্ণ দৃষ্টির মাপে কেটেছেটে সিদ্ধ করে আপন মানস
অতিকায় শব্দরাজি তার্কিকেরা করে উচ্চারণ
যেন করাতির টানে টানে ঘৃণরাশি ঝরে।

ভাগনার তাই হোক, তবুও পৃথিবী আর মনুষ্য হৃদয়
নানা জটিলতাযুক্ত, মন্ময় মানুষ
হওয়া সমুচিত বটে আমাদের বোঝার বিষয়।

ফাউস্ট কি তুমি বুঝতে চাও, কাকে বলে বোঝা
বস্তুকে আসল নামে ডাক দিতে পারে কোন্ জন?
কোটিতে মেলে না গুটি
অন্তর করেছে সিক্ত উপলব্ধি ধারা।
কল্পদৃষ্টি সমন্বিত শুদ্ধ আত্মা বিরল ভীষণ,

মনুষ্য সমাজে যারা অসঙ্কোচে করেছে প্রকাশ
কম্পমান নগ্ন আত্মা উষ্ণতায় ছাওয়া।
সেইসব সহৃদয় নির্বোধের দল
দিকে দিকে দিয়েছে ছড়িয়ে
হৃদয়ে গুঞ্জন করা অকলঙ্ক ভাষা।
মনুষ্যসমাজ আনন্দে তাদের শিরে পরিয়েছে কাঁটার মুকুট।
অগ্নিতে করেছে দাহ
দিয়েছে উৎসাহ ভরে দুঃখ নব নব।
ক্ষমা কর বন্ধুবর, রজনী গভীর হল
চাঁদ গেছে ডুবে
ক্ষান্ত দাও, অদ্যকার মত আমি হই অবসর।

ভাগনার

আপনার হিতকথা তত্ত্ব উপদেশ
অধিক সময় ধরে শ্রবণের বাসনা প্রবল
কিন্তু কাল আমাদের ইস্টারের দিন
ইচ্ছা আছে, ঘটে যদি দেখা
জেনে নেব কতিপয় জরুরি সংবাদ।
জেনেছি অনেক দূর, গ্রন্থকে করেছি দানাপানি
কিন্তু পূর্ণজ্ঞান ব্যতিরেকে বিশ্রাম না মানি।

ফাউস্ট

আমার অবাক লাগে বিচালি চর্বণ করে
এই যে নির্বোধ, ফাঁকা শব্দে কি করে সে
আকাঙ্ক্ষাকে রাখে সঞ্জীবন।
দারুণ লোভের বশে সিঁদ কেটে মনে ভাবে
পেয়ে যাবে মূল্যবান বস্তু রাশি রাশি।
এই লোক অসীম সাহস ভরে কি আবেগে তোলে শব্দঝড়
একথা জানে না মোটে
সর্বব্যাপ্ত আত্মা কোথা করে বিচরণ।
তবুও বাখানি তারে অন্তঃসারশূন্য এই খড়ের মানুষ
আমাকে করেছে রক্ষা নিদারুণ ক্ষণে।
আত্মঘাতী আকাঙ্ক্ষা সে করেছে দমন
নইলে বিবেকবুদ্ধি লুপ্ত হত কিংবা হত নিশ্চিত মরণ
ভয়ঙ্কর প্রেত আত্মা এত উর্ধ্বে উঠেছিল ফুলে
শঙ্কিত বিহঙ্গ সম থরথর কেঁপেছে অন্তর।
স্রষ্টার মুকুরে গড়া আমার মানব সত্তা
মনে হল সমস্ত বন্ধন ঠেলে
প্রায় যেন ছুঁয়ে গেল চিরন্তন সত্যের দর্পণ।
শক্তির তরঙ্গ দোলা কারার বন্ধন ছিঁড়ে

লীন হতে চেয়েছিল অন্তহীন দিবসের উজ্জ্বল প্রভায়।
তরঙ্গ মথিত বুকে যে আমি করেছি সাধ
পিছে ফেলে স্বর্গলোক, দেবদূত দলে
দুর্বার গতির তোড়ে উর্ধ্বলোকে করে আরোহণ
তরুণ দেবতা প্রায় বুকে ধরে আনন্দিত সৃজন-বেদনা
আপনারে মুক্তি দেব নিসর্গের শোণিতে শিরায়।
পরিণাম চিন্তাহীন অতি উর্ধ্ব যেহেতু চড়েছি।
আমি জানি, আমাকে বইতে হবে
অসহন ব্যর্থতার গ্লানি।
একটিমাত্র মহাবাক্য বজ্রসম প্রচণ্ড নির্ঘোষে
আমার শক্তির গর্ব করেছে হরণ
নিতান্ত সাহস হারা হৃদয় আমার।
হে প্রেতাত্মা, আমাকে ধর না তুমি আর গণনায়
যদিও আবেগে দীপ্ত শক্তিমন্ত ভাষায় ডেকেছি।
সাধ্য নেই ধরে রাখি
যখন আমার ডাকে মেঘমন্দ্র স্বরে দিলে সাড়া,
মুহূর্তে চকিত হয়ে করি নিরীক্ষণ
প্রকাণ্ডের সন্নিধানে দুরুদুরু কম্প্র বুক কত ক্ষুদ্র আমি।
মহাব্যোম প্রকিম্পত শব্দের আঘাতে
ছুঁড়ে দিল আচানক
মানুষের অনিশ্চিত জীবনসীমায়।
কে তবে আমার গুরু? কারে ছেড়ে কারে রাখি
মাথা পেতে মেনে নেই নিষ্ঠুর নির্দেশ
শক্তিময়ী কোন্ আকাঙ্ক্ষার?
দুঃখ শুধু নয়, আমাদের কৃতকর্মরাশি
পদে পদে বেঁধে রাখে, জড়ায় শৃঙ্খলে।
আত্মার মুকুরে ভাসে যে সৌন্দর্যরাশি
প্রাণের ঘৃতের দীপ
বিপরীত বস্তু তার আয়ু করে ক্ষয়।
সমন্বিত সেই বোধ তুলনায় পৃথিবীর কল্যাণস্বরূপ
ইতরের উপদেশে মনে হয় হাওয়ার ছলনা।
মহত্তর যে আকুতি আমাদের প্রাণে প্রাণে রয়
প্রাণদ ফোয়ারা হয়ে জেগে থাকে চিরদিন সত্যের শিখায়
পৃথিবীর আবর্জনা প্রতিদিন করে তারে ঘৃণ্য অবরোধ।
যদিও প্রথমে চিরন্তনতার স্বপ্নে দুইখানি ডানা
অনন্ত আকাশ পানে মেলেছে কল্পনা
তরঙ্গিত মহাশূন্যে আতঙ্কে নেহারে

শঙ্কায় গুটিয়ে গেছে, আশাভঙ্গে বিষাদিত মনে
পরাজয় আর ক্ষতি কষাঘাত হানে।
প্রাণের গভীরে তবু আশা জন্ম লয়
সুপ্ত গৃহে নিত্য রচে বেদনার কণ্টকশয়ন
ক্ষণে সুখ, ক্ষণে দুঃখ, দুই বোধ অবিরাম অন্তরে দোলায়।
বিশ্রাম জানে না মোটে
নবীন মূরতি ধরে নব পরিচয়ে
পুত্র রূপে, জায়া রূপে কিংবা ধরে গৃহের আকার
নিয়ত সে আপনার ক্রিয়া করে যায়।
ফু দিয়ে জ্বালায় কভু সশঙ্কিত আশার প্রদীপ
কখনো বা রোষাবেশে ফুৎকারে নিভায়।
অন্তরে প্রবিষ্ট হয় বিষাক্ত ভাবনা
কুরে কুরে খায় তাকে সংখ্যাহীন কীট।
তবু মানুষ যে সাগরে কোনদিন ভাসায়নি তরী
কল্পনায় তার ভয়ে করে আহাজারি।
যে ক্ষতি ছোঁয়নি তারে, যে ব্যথা পায়নি কোনদিন
সেইসব ভেবে করে একান্তে রোদন।
আমারও কি কোষে কোষে ভরা নয় ধূলার জঞ্জাল?
অন্তঃসারশূন্য সব হাতুড়ের মত।
চৌদিকে প্রাচীর নয় আমারও প্রহরী?
যেমন রেশমকীট অভ্যাসের দাসত্বে মশগুল
তেমন কি নই আমি, অধীত বিদ্যার করি চর্বিতচর্বণ
সংখ্যাহীন গ্রন্থপাঠ ভরাবে কি হৃদয়ের শূন্যতা আমার?
অধিকাংশ মানুষেরা দুঃখে করে সময় যাপন
কোথা পাব সে সন্তোষ ভাগ্যবান জনে শোভা পায়।
বল ওরে শূন্যগর্ভ করোটি আমার
কোন্ সে নশ্বর জীব একদিন বেদনা বিদীর্ণ প্রাণে
আমার মতন, রৌদ্রজ্বালা দিন থেকে
চেয়েছে ছিনিয়ে নিতে দিনান্তের সুধা।
প্রাণান্ত প্রয়াসে সত্যের কঠিন মূর্তি জিনে নিতে গিয়ে
ডুবেছে বিস্মৃতি ভরা অতল সাগরে।
চক্র আর বক্র নল লতানো পেঁচানো
নানারূপ যন্ত্রপাতি
অদৃশ্য বিজয়ের ঠিক চাবিকাঠি
একদা সকলে আমার সহায় ছিলে
এখন মুখের 'পরে কর তিরস্কার।

তোমাদের নিপুণতা হার মেনে যায়
নিসর্গের প্রহরী চতুর
অজানা রহস্য থাকে গুপ্ত আবরণে।
নিসর্গ সতত থাকে গুণ্ঠনে আবৃত
যদিও রহস্যময় প্রকাশ্যে গোপন
যেখানে মানব মেধা দৃষ্টিহারা
লৌহময় কলকব্জা কি দেখাবে পথ?
এই যে ধাবনযন্ত্র সমুখে বিরাজে
কখনো ছুঁইনি তারে অনুরাগ ভরে
জনকের উত্তরাধিকার
আমার চতুর্দিকে রচে আছে ঘোর কারাগার।
চর্মাকারে কুণ্ডলিত পাণ্ডুলিপি ধুলিম্লান মসীলিপ্ত
এরি মাঝে এখনো প্রদীপ জ্বেলে ঘেঁটেঘেঁটে
কি জানি কিসের করি নিস্ফল সন্ধান।
বরঞ্চ অন্তঃস্থ সম্পদে যদি
যত্নভরে করতাম প্রাণ সমর্পণ
মধ্যরাতে তেল অপচয় এ করম গ্লানিযুক্ত হত না কখন।
একান্ত আত্মার শ্রমে, একনিষ্ঠ সাধনার বলে
পূর্বপুরুষের ধনে
উত্তর পুরুষে জন্মে সত্যি অধিকার
যা কিছু আসে না কাজে আবর্জনা মানি।
উড়ন্ত মুহূর্তগুলো যদি বেঁধে রাখি
কান্তিমান সফলতা আসে তাড়াতাড়ি।
কাঁচে মোড়া এই আলো দৃষ্টিকে আমার
বেঁধে রাখে বারংবার ঘন সম্মোহনে
যেমন আকাশ গাঙে চাঁদের তরণী
বনপথ যাত্রীদলে প্রশান্ত কিরণধারা করে বিতরণ
অন্তর ভরিয়ে তোলে রৌপ্যকান্তি শুভ্র ভাবনায়।
শ্রদ্ধা বিজড়িত হস্ত রেখেছি যেখানে
বিরল মহত্ব ভাণ্ড, তোমাকে প্রণাম
তোমাকে সম্মান করে করি সম্মানিত
মানবীয় শিল্পকলা আর নানাজ্ঞান।
পদ্মের কোরকে গুপ্ত তুমি সেই সংগোপন মধু
তুমি সেই হন্তারক বিষের আরক।
দুই হাতে যে তোমাকে আদরে ধরেছে
বারেক দেখাও তারে সুন্দর বদন।

তোমাকে দু'চোখে দেখে, স্পর্শ নিয়ে, নিত্য শুঁকে ঘ্রাণ
জুড়াই প্রাণের জ্বালা অন্তরের দাবদাহ করি নিবারণ।
ক্রমে ক্রমে থেমে গেল প্রাণের জোয়ার
অবিশ্রাম কর্ণে বাজে প্রান্তরের গান
উদাস বন্ধনমুক্ত দিগ্বলয় ভেদ করে ওঠে উচ্চরোল
আমার চরণতলে স্ফটিকে নির্মিত এক
স্বচ্ছকান্তি পৃথিবী ঘুমায়
পদ্মের পর্ণের মত উন্মোচিত হয় এক উজ্জ্বল দিবস।
প্রফুল্ল আলোকপাতে কখনো বা কম্পমান কখনো সুস্থির
দেখা যায় ছায়াঘেরা আবছা উপকূলে।
উড়ে আসে দ্রুত বেগে আমার সকাশে
দীপ্তকান্তি অগ্নিময় রথ
প্রস্তুত রয়েছি আমি আনন্দে করব পান
মুক্তিরস ভরা এক সুধা সঞ্জীবনী।
নতুন জন্মের বরে অপূর্ব আকাঙ্ক্ষারাশি জেগেছে অন্তরে
চোখের পলকপাতে
হাওয়া ফুঁড়ে করব আরোহণ
ঊর্ধ্বলোকে শুদ্ধতম কর্মের জগতে।
এই যে ফুটন্ত প্রাণ, নতুন জন্মের এই
দেবোপম দিব্য অনুভূতি কি করে আয়ত্ত করি
কৃমিকীটে জন্ম যার
কি করে সে ছিন্ন করে অমোঘ বন্ধন?
মরমে মন্দ্রিত হল সত্যের বাঁশরি
তুচ্ছ করি দিবাকর, পৃথিবীরে যে রাঙায় আলোক বসনে
তুচ্ছ করি সুখ নিকেতন;
স্পর্ধিত দৃষ্টিকে রাখি প্রশস্ত ফটকে
কোন নর সশরীরে যায়নি যেখানে
আমার চরণচিহ্নে এঁকে যাব উজ্জ্বলিত দীপ্ত পথরেখা
সময় আসন্ন প্রায় এইবার হব আমি ভাগ্যের ঈশ্বর।
মানুষকে দেববীর্যে করব বলীয়ান।
সুড়ঙ্গের ধারে ধারে হেঁটে যাব অকম্পিত দৃপ্ত পদপাতে
অন্তর পীড়নকারী কল্পনার বলে
অপার হিম্মত ভরে প্রাণপনে করব নিক্ষেপ
বঙ্কিম শঙ্কিল অগ্নিময় নরকের সরু আলপথে
আতঙ্কের রুদ্ধদ্বারে জোরে জোরে করব আঘাত।
আনন্দ অন্তরে আমি এই করি পণ—

মৃত্যুর অধিক নেব বিপদের ঝুঁকি।
স্বচ্ছকান্তি পানপাত্র তোমাকে নিলাম তুলে
খসিয়ে গুণ্ঠন, প্রতীক্ষার স্থান থেকে ছুটে এস বন্ধু হও তুমি
ব্যাকুল পিপাসা নিয়ে গণ্ডদেশ চুমি।
সুরাভরা শরাবের জাম, এত এতকাল
চিনিনি তোমাকে আমি, দিই নাই দাম।
সুদীর্ঘ ছুটির মাসে কতবার পিতার অতিথিবৃন্দে
বিলিয়েছ মধুর আনন্দধারা গভীর সন্তোষ।
তোমার উদ্দেশ্যে তুলে ধন্য-ধন্যধ্বনি অভ্যাগত প্রতিজন
আবেগে তোমার ঠোঁট করেছে চুম্বন।
অপূর্ব শিল্পের শোভা, প্রাসাদের অলিন্দের কত কথকতা
সুরামত্ত হৃদয়ের অসংখ্য আকুতি
অগণিত অন্তরের ছন্দে ভরা বাণী
মুখেতে মিশিয়ে মুখ সুরাপায়ী দলে
চটুল ঝর্নার মত করে গেছে রাত্রি উজাগর?
তোমাকে পরশমাত্র ফিরে আসে
বেদনা-ফেনিল সেই কল্লোলিত যৌবন-রজনী।
তোমাকে বন্ধুর হাতে করবনা মিথ্যা সমর্পণ
আমার কাঙ্ক্ষিত নয় চমৎকার শিল্পের উদ্যান,
চেতনা বিবশ করা নিদ্রারসে ভরা
চাইনে এমন কোন সুরার বিলাস।
শাণিত উজ্জ্বল চোখে প্রতিজ্ঞার প্রতিলিপি করি নিরীক্ষণ
তারপর জড়ো করে অস্তিত্বের তাবত সাহস
ফেনোচ্ছল সুরাভাণ্ডে দেব তবে অন্তিম চুমুক
যেন মর্মে মর্মে বাজে, ভয়ঙ্কর আগামীর দৃপ্ত পদধ্বনি।
(ফাউস্ট পানপাত্র ওষ্ঠাধরে ঠেকাল, অদূরে শ্রুত হল ঘণ্টারব।)

ফেরেশতাবৃন্দের ঐকতান সঙ্গীত

খ্রিস্ট লভেছেন পুনঃ নবপ্রাণ
মরলোকে জাগে আনন্দ ও গান
নিয়তি যাদের জঠরে টেনেছে
হতাশার ছুরি বুকেতে হেনেছে
পাষাণ কারার আঁধার অতলে
ব্যথার সোনার মাণিক জ্বলে।

ফাউস্ট

ছুটে আসে কোথা হতে সুমন্দ সঙ্গীত
অতল প্রশান্তি ভরা চিকনিয়া ধ্বনি

প্রাণের গভীর তন্ত্রে তোলে শিহরণ
সর্ব অঙ্গে অনিবার শান্তি স্রোত ছুটে
সুপ্তির অতলে প্রাণ গেয়ে ওঠে গান।
পানপাত্র ওষ্ঠাধরে ঠেকাতে পারি না
কোমল মধুর স্বরে বাজে ঘণ্টাধ্বনি
হাওয়ার স্বননে শুনি ফুল্ল আগমনী।
ঐ ভাসে তরল তিমির তলে
গলিত কাঞ্চন কান্তি ইস্টারের দিন।
সঙ্গীতের ঐকতানে নেচে ওঠে প্রাণ
কবর বিদীর্ণ হল আলোকের শাণিত আঘাতে
সত্রাসে পালিয়ে গেছে লোমশ আঁধার
দেখা দিল প্রতিজ্ঞার দিব্য নিদর্শন।

নারীদের
ঐকতান সঙ্গীত

আতর ঢেলে লোবান জ্বেলেছি
গন্ধ চন্দন শ্রীঅঙ্গে মেখেছি
বিশ্বাসী জন হয়েছে সহায়
প্রভুরে সাজিয়ে শুভ্র বসনে
শান্তি শয়নে রেখেছি শয়ান।
ক্ষতরেখা তার আঁচলে ধুয়েছি
শুভ্র মখমল শরীরে থুয়েছি
রেখেছি মাটির গভীর তলায়
কবরে এখন তাঁরে তো মিলে না
কারে বা করি সে দুখের বাখান।

ফেরেশতাবৃন্দের
ঐকতান সঙ্গীত

খ্রিস্টের হল পুনরুত্থান
চরাচরে সবে গাও জয়গান
মরণ-বেদনা চরণে দলে
প্রেমের কুমার যায় যে চলে
দুখের সাধনা লভেছে জয়
আয়ুষ্মান তা জগতময়।

ফাউস্ট

শক্তিমন্ত সুরজাল তোমরা সকলে
কেন আস ধূলিম্লান চিত্তলোকে
যেইখানে তীক্ষ্ণতম বেদনা বিরাজে
কেন আস ফিরে ফিরে।
যাও হে সঙ্গীত ধারা যেই বুকে আজো

কোমল অন্তর রাজে বিশ্বাসে নবীন
অশরীরী বিহঙ্গের দল
সেইখানে সুখ নীড় কর গে সৃজন
শ্রবণে শুনছি বটে, বিশ্বাসবিহীন প্রাণ শুষ্ক বড়
অনুভূতি বিবর্জিত তরঙ্গ জাগে না।
আশ্চর্য সেই সে বস্তু যাকে বলে বিশ্বাসের সোনা
প্রিয়তম জনে দেয় অলৌকিক বস্তু উপহার।
এই সে বিশ্বাসলোক উচ্চতম ভাবনার আদি উৎসধারা
এত উর্ধ্বে স্থিত তুমি
খোঁড়া প্রাণ কেমনে দেয় সেখানে উড়াল।
তবুও শব্দের মন্ত্র চিত্ততলে করে কলরোল
সঙ্গীতে শৈশব হাসে সঙ্গীতে যৌবন ভাসে
সমগ্র জীবনখানি দুই বাহু আবেগে প্রসারে
ব্যাকুল মিনতি ভরে আয়-আয় ডাকে।
স্বর্গের চুম্বন আঁকা মিঠে মিঠে স্মৃতিভরা
অতিক্রান্ত প্রশান্ত সময়
মেলেছে অমল ছায়া উৎসব-দিবসে।
আমার শৈশবে শ্রুত সেই ঘণ্টারোল
পূর্ণতা প্রতীক যেন শব্দ গোল গোল
আবেগের বেগ ভরা প্রার্থনার ধ্বনি
উর্ধ্বলোকে ধাবমান প্রাণের নবনী
পবিত্র উৎসবে ফের গতি ভঙ্গিমায়
চমকে ঝলকে জাগে প্রাণের সভায়।
প্রেমের পুলক ভরা মমতা-মেদুর আর্তি
ছিন্ন করে কারার বন্ধন, আমাকে ছুটিয়ে নেয়
অতিদূর প্রান্তরের ধারে, শ্যামল বনের প্রান্তে
সরল বৃক্ষের অন্তঃপুরে, যেইখানে বৃদ্ধ বনস্পতি
শাখা বাহু মেলে করে আকাশে বিহার।
যতক্ষণ মত্তপ্রাণ করে বিচরণ
অশ্রুরাশি অকারণে ভেজায় নয়ন।
অকস্মাৎ মনে হয় এসে গেছি শেষে
শঙ্কাভয় দ্বিধামুক্ত দুঃখহীন দেশে।
এই সে সঙ্গীত ধারা সুরের পেলব জালে
বন্দি করে নিয়ে এল শৈশবের সরল পুলক
যৌবনের নির্দোষ প্রমোদ
বসন্তদিনের কত আনন্দ কূজন।

এই প্রসন্ন প্রহরে
অতল বিস্মৃতি থেকে অনুরাগে জাগে
সহস্র আকাঙ্ক্ষা ভরা যৌবন আমার।
শিশু সম নিষেধ বন্ধন মুক্ত অসীম বিস্ময়
আমার চেতনাখানি করেছে আশ্রয়।
বাজো স্বর্গের মাধুরী ভরা অনিন্দ্য সঙ্গীত
চোখে আসে জল ভরে
পুনর্বার হই যেন ধরণীর শিশু

শিষ্যবৃন্দের
ঐকতান সঙ্গীত

কবরে যিনি ছিলেন শয়ান
ঘটেছে তাঁর পুনরুত্থান
অমৃত যেখানে রেখেছে হাত
মৃত্যু হয়রান ব্যথার বাধ
অসীম শান্ত সাহস তাঁর
করেন সকলই একাকার
আমরা জগতে ধূলার জীব
ধূলায় করি দিন কাবার।
প্রভু করেছেন অন্তর্ধান
অন্তরে কাঁদে বিরস প্রাণ
তাপিত হৃদয় ব্যথিত হিয়া
প্রভু হে যাচি করুণা দান।

ফেরেশতাবৃন্দের
ঐকতান সঙ্গীত

খ্রিষ্ট লভেছেন পুনরুত্থান
কলুষিত পোষ কেটে খানখান
মরণ কারার টুটেছে বাঁধন
মুক্তির স্রোতে করো হে গাহন।
ভাইবন্ধু মিলে তোমরা সবাই
মিলবে যখন ভোজনসভায়
সবার পরাণে মিশিয়ে পরাণ
উদাত্ত কণ্ঠে গাবে নাম গান
আহার বিহার শয়ন-স্বপনে
তার নাম নাও মনের গহনে
সকল শঙ্কা আতঙ্ক তাড়িয়ে
শিয়রে প্রভু আছেন দাঁড়িয়ে।

দ্বিতীয় দৃশ্য

নগর-ফটকের দৃশ্য

[নানারকম লোকের চলাচলমুখর প্রধান সড়ক]

কতেক যোগালি : এই পথে কেন যাব চাই সদুত্তর।

অন্যান্যরা : আমরা চলেছি পাহাড় লক্ষ্যে নির্জন বড় লতাপাতা ঘেরা শিকারি সবাই পেতেছে সেখানে ক্ষণিক সুখের বাহারি ডেরা।

প্রথম বক্তা : আমরা ছুটেছি মিলে দলে দলে দেখব কি করে জল যায় ঠেলে পাক খেয়ে খেয়ে ঘুরণরত, বড় বড় সব কাঠের চাকা।

একজন যোগালি : আমি বলি চল ঐ ভোজনশালায় দেখব ঘাটেতে বাঁধা পাল তোলা নাও।

আরেকজন যোগালি : এমন সুন্দর দিনে ঘাট কূলে যায় কোন্‌জন?

অন্যান্যরা : তাহলে বল তো সবে কই যাওয়া যায়?

তৃতীয়জন : সকলের পিছে পিছে আমি আছি ভাই।

চতুর্থজন : চল যাই দুর্গের কিনার ঘেঁষা রম্যপান্থশালে
কড়ি দিলে সুরা মিলে বড় চমৎকার
সুন্দরী রমণী দেয় সঙ্গসুখ খসিয়ে কাঁচুলি
আরো নানা রঙ্গ আছে।

পঞ্চমজন : সেয়ানা ছাওয়াল বড় স্বভাবে দামাল
আদপেই নষ্টচন্দ্র বলি তোরে শোন্‌
সেই নরকের নামে কুৎসিত ঘৃণায়
আমার মুখের 'পরে বমি এসে যায়।

প্রথম পরিচারিকা : ফিরছি গৃহে দ্রুত চলনে
দাঁড়াব না কোথাও অন্য মনে।

অন্যান্যরা : জানি জানি পাব তারে ঝাউবীথিতলে।

প্রথম তরুণী : তুষ্ট হই নাই আমি তোমার কথায়
তোমার সঙ্গে চলে তোমাকে সে চায়,
তার সঙ্গে নেচে গেয়ে প্রহর কাটাও
তোমাতে আমাতে নেই গহন প্রণয়।

অন্যান্যরা : থাকবে না সে একা এমন লুটবে মজা বেশ।
আনবে এমন তরুণী এক কুঞ্চিত যার কেশ।

চতুর্থ শিক্ষার্থী : নারী চলে নিতম্বিনী গজেন্দ্রগামিনী
চল ভাই ত্বরা যাই হেলাফেলা নাই
তাম্রকুট যব সুরা যদি দিতে পারি
এসো হে নাগর বলে
বারাঙ্গনা পেতে দেবে সাধের আসন।

নাগরিক দুহিতা : উজ্জ্বল সুন্দর কান্তি অতি সুর্দশন
তরুণ যুবক আর সঙ্গীটিরে দেখ
ললিত নারীর মন পেতে পারে অতি অনায়াসে।
ও-মা কি লজ্জার কথা, ছি কি কেলেঙ্কারি
যুগল খানকির পিছে করে পায়চারি!

দ্বিতীয় শিক্ষার্থী : (প্রথম জনের প্রতি)
ধীরে যাও ওগো বন্ধু, বারেক তাকাও
পেছনে দুজন আসে সুনীল নয়না,
অনুমানে মনে হয় কুলেশীলে ধনী
আমার পড়শি কন্যা বিলক্ষণ চিনি।
মনে মনে যুবতীরে বাসি আমি ভাল
চেয়ে দেখ আগুয়ান কম্প্র পদপাতে
অবশ্যই যাবে তারা আমাদের পথে।

প্রথম শিক্ষার্থী : কাজ নাই ঘেন্না করি ভদ্র ঠিকানায়
পা দুটি চালিয়ে এস পাখি যাবে উড়ে
যেই হাত ঝাড়ু দেয় পুরো হপ্ত ভর
সেই হাত রোববারে ঢালে প্রেমাদর।

নাগরিক : নব নির্বাচিত পৌরপিতা ভাল নন মোটে
ধরাকে করেন তিনি সরাসম জ্ঞান
দিনে দিনে সব কিছু যাচ্ছে রসাতল
সম্ভ্রম সম্পদ আর সৌভাগ্য সকল।
চালু করেন মাসে মাসে বিধির পরে বিধি
এমন শাসক কোথায় মেলে হারাধনের নিধি।

একজন ভিখারি : উজ্জ্বল সুন্দর গণ্ড পরিপাটি বসনভূষণ
কৃপালু মহিলা আর ভদ্র মহোদয়
সবারে উদ্দেশ্যে রাখি বিনীত সালাম।
আমি এক মন্দভাগ্য দুঃখে করি সময় যাপন
বিফলে যায় না যেন করুণ মিনতি
পুণ্য যাঁরা চান

আমার ভিক্ষার ভাণ্ডে কিছু দিয়ে যান।
আমার সন্তাপটুকু না করলে দূর
সবার আনন্দ সুখ হবে না মধুর।

অন্য একজন
নাগরিক : রবিবারে কিংবা এমন ছুটির দিনে
যুদ্ধের কথা আলোচনা করতে অনেক সুখ।
তুর্কি দেশের না হয় আরো অনেক দূরের
খুনে ভেজা গরম খবর মজার বড়
অসন্তোষের আগুন বুকে মানুষগুলো বেরিয়ে এসে
জাপটে ধরে পরস্পরে
কুকুর যেমন ঝগড়া লাগায়।
তুমি শুধু শরাব হাতে বাতায়নের পাশে বসে
ক্ষণে ক্ষণে চুমুক দেবে দেখবে দূরের ধবল নদী
পাল ফুলিয়ে নৌকাগুলো ছুটছে কেমন নিরবধি
অনেক মধুর এমনি করে একটা জীবন কাটিয়ে দেয়া।

তৃতীয় নাগরিক : ঠিক বলেছ পড়শি তুমি তোমার কথা সঠিক মানি
দেশ-বিদেশের যুদ্ধ শকুন করে মরুক হানাহানি।
ধার ধারিনে সেসব কথার দুনিয়া যাক রসাতলে
সাবেক ধাঁচে জীবনখানি কাটিয়ে দেব ছাদের তলে।

বুড়ি : (নাগরিক দুহিতার প্রতি)
শোন ওগো ভাল মাইনসের ঝি
সাজ করেছ পরীর মত মনের ভেতর কি
দেখে দেখে চোখ পেকেছে সেসব বুজরুকি
শরীর জুড়ে নাচে তোমার ক্ষ্যাপা অনঙ্গ
ঝাঁপ দেবে যে কোথায় এমন পাগল পতঙ্গ।
মায়ের বাড়া বয়স আমার মনের খবর জানি
একটুখানি হাঁ বল চাই মন্ত্র বলে আনি।

নাগরিক দুহিতা : আগাথা সই, সরে দাঁড়াও বুদ্ধি যদি থাকে
এই যে বুড়ি শনের নুড়ি ফেলবে দুর্বিপাকে
মন্দের খনি কুহকিনী এড়িয়ে এস ভাই
হঠাৎ কেউ দেখলে আবার মুখে পড়বে ছাই।
এত্র সাধুর জন্ম দিনে মন্ত্রশক্তি হেনে
প্রিয়তমের মুখ দেখাল আরশিতলে এনে।

দ্বিতীয় নাগরিক
দুহিতা : ওগো সই, আমার খবর কই?
মন্ত্র বলে আরশিতলে দেখাল মুখখানি

প্রাণের সখা যুবক সেনা সবার সেরা যানি
সখীসার্থের মধ্যিখানে একটি ঝলক তবু
দেখা দিয়ে হারিয়ে গেল তার পরে সব ধু-ধু।
এক নিমেষে বন্দী গেল সে বেড়াই ঘরে ঢুকে
যাযার মতন তবু সখি গোচারণ কি রুখে!

সেনানিবৃন্দ : চারপাশে তার পাষাণ প্রাচীর
আকাশ বিধে দুর্গশিরে
প্রেমের বচন কানে না দেয়
এমন নিঠুর যুবতীরে
পাখির মত পোষ মানাব
অন্তরে সে সাহস ধরি।
পাষাণ প্রয়াস ঘেমিয়ে ওঠে
সুন্দরী তাই এলিয়ে পড়ে
ডাকডুমাডুম বাজনা বাজে
মরণবাঁচন নাচন করে
জয় কি আবার এসে গেছে
মরতে হলে এখন মরি।
ময়দানে বা রণাঙ্গণে
যেইখানে যাই গলায় পরি
আগুনবরণ জয়ের মালা
সাহস দিয়ে নিশান গড়ি।
নগদানগদ দাম বুঝে নাও
এই না হলে বীর সেনানী
কোন ঠিকানায় কাকে যাব
সে কথা কি সঠিক জানি।
(ফাউস্ট এবং [illegible] প্রবেশ)

ফাউস্ট : বসন্তের প্রাণপূর্ণ আলোক বর্তুল
রেখেছে চঞ্চল রেখা, জমাট তুষার কেটে
রূপালি রেখার মত সুবর্ণিম স্রোতেরা বয়
দিকে দিকে কম্পমান অঙ্কুরের প্রাণ
গলিত তুষার স্রোতে পেয়ে ওঠে গান।
সঙ্কুচিত কৌতূহলে উপত্যকা তলে
উঁকি দেবে শ্যামলিম উদ্ভিদের শীষ;
কঠিন নিষেধ তথা হিম বহু জড়ত্বের সাক্ষাৎ প্রতীক
ফিরে গেছে পার্বতীর দুর্গম আলয়ে

দিনে দিনে ক্ষীণবল হাল্কা তুষারধারা ঝরে কি না ঝরে।
সূর্যের দৃষ্টির মুখে ধবলবরণি নিদ্রাভঙ্গে চঞ্চলিত
সুন্দর ধরণী—শুয়ে আছে অনাবৃত,
প্রাণের পাতালতলে লাগে তীব্র টান
সৃজন পুলক বেগে ফোটাতেছে প্রাণ।
সৌরশিখা আপনার দীপ্ত প্রতিভায়
নানারঙে নানাবর্ণে ছবি এঁকে যায়।
যেইসব ফুলকলি নিদ্রা যায় সংগোপনে মৃত্তিকা অন্তরে
তাদের কোমল সুর প্রাণের কন্দরে
বেজেছে ব্যাকুল স্বরে সেতারের মত।
তাই দলে দলে নব বেশে নর-নারীগণে
জুটে গেছে, সরল আনন্দরসে নিশ্চিত ভ্রমণে।
চেয়ে দেখ ওই উঁচু অবস্থান হতে
আলোতে সিনান করে নিখিল নগরী।
পশুর বিবর প্রায় স্যাঁতস্যাঁতে বহির্দ্বার কর নিরীক্ষণ
মানুষ ছুটেছে যেন ঝাঁকবাঁধা লুব্ধ পঙ্গপাল।
খুপরি থেকে, বস্তি থেকে, কারখানার ঘানি থেকে
শ্বাসরুদ্ধ অস্তিত্বের কারাগার পিছে ফেলে
কর্মক্লান্ত এইসব করুণ মানুষ
প্রভুর উত্থান দিনে
কি আনন্দে সূর্যালোকে করে বিচরণ
তাদেরও জীবনে নাচে নবীন জীবন।
সূর্যহারা নরকের প্রাত্যহিক ভিড়
মন্দিরের গর্ভগুহা ছেড়ে
মুক্তির দিগন্তে এসে জুটেছে সকলে।
দেখ দিগন্ত ছড়ানো মাঠ, শ্যামলিম শস্যের সম্ভার
কি ঈশারা মেলে ধরে মোহন মায়ায়
সুন্দরের ডাক কেমন আবেগে নাচে
প্রাণবান মানুষের চপল চরণে।
আর দেখ তরল ধবল নদী জলের আর্শিতে
খেলে সীমাহীন সুনীল আকাশ
উজান স্রোতের মুখে, রাঙা রাঙা পাল তুলে
ডিঙ্গিগুলো ছোটে, নদীবক্ষ তোলপাড়
সোয়ারি ভয়েতে কাঁপে অস্থির দুলুনি।
নীল নীর পাড়ি দিয়ে পণ্যবাহী প্রকাণ্ড জাহাজ
ছুটেছে অজানা দেশে অপরূপ গতির লীলায়।

দূরবর্তী গিরিরাজি মেঘলোকে নীল শৃঙ্গ তুলে
অপূর্ব সুন্দর চিত্র ধরে আছে স্থির নীলিমায়।
আমার শ্রবণে শুনি মানুষের পরিচিত ধ্বনি
সংখ্যাহীন শব্দের অঙ্কুর
সম্মিলিত জীবনের মহা কলরোল।
চেয়ে দেখি একেবারে অতি সন্নিকটে প্রাণাবেগে উজ্জ্বল গ্রাম
দলে দলে তরুণ-তরুণী, বসিয়ে বয়সরেখা মুখোমুখি সবে,
পরম সন্তোষভরে আনন্দেতে আছে নিমগ্ন।
এইখানে এসে অন্তরে বিজুলি খেলে, উপলব্ধি জলে
অকস্মাৎ মানবীয় অনুভূতি আমাকে জড়ায়
আমিও মানুষ, টের পাই শরীরের প্রতি রক্তমূলে।

তাপনার : আপনার সঙ্গে করে তত্ত্ব আলাপন
অধিক আনন্দ পাই, ব্যক্তিত্বের ভাবি পরীক্ষান
তাই আপনাকে করি আমি সম্মানিত জ্ঞান।
একান্ত মনের কথা যদি বলি
এইসব হট্টগোল, রুচিহীন কর্কশ প্রয়োগ
আমার অসহ্য ঠেকে
ঢাকঢোল বাদ্যধ্বনি, বেহালার চিকন চিৎকার
ধেই-ধেই নাচগান অযথাতথি গোলমেলে খেলা।
সঙ্গতিবিহীন সব কিম্ভূতে আওয়াজ
শয়তান বাজায় যেন দু'হাতে খঞ্জনি।
আমার আশ্চর্য লাগে এতে কি করে আনন্দ মেলে
এতে কি সঙ্গীত মেলে কোমল মধুর?
(কদম গাছের তলায় নৃত্যগীতরত যুবকেরা)

গায়ক : রাখাল ছেলের গল্প বলি
মাথার ওপর জরির টুপি
দেখতে যেমন সোনার পাখা
ছুটির দিনে বরের বেশে
গোঁফের আড়ে হেসে হেসে
একটুখানি হেলেদুলে
নাচতে এল কদম তলে
অনেক লোকে ভিড় করেছে
রাখাল ছেলের নাচ লেগেছে
কদমগাছে কুঁড়ি কুঁড়ি
হলুদবরণ ফুলের কলি।

ধুয়া : আমার সুখ হল না-রে
সুখ পরাণের বৈরী
কাঁচকলা অর মিষ্টিকুমোড়
আকাটা তরকারি
কেঁকর-কো কেঁকর-কো বাজে বেহালা
সখি লো যায় বয়ে বেলা।

গায়ক : রাখাল ছেলের গল্প বলি
বন্ধুজনের সঙ্গে মিলে
নেচে গেয়ে দরাজ দিলে
সুন্দরী এক ধরে নিয়ে
দিল সুড়সুড়ি
লজ্জা রাঙা সুন্দরীটি
শক্ত করে বসন আঁটি
চ্যাংড়া দামাল বাছুর বলে
দিল গালাগালি।

ধুয়া : আমার সুখ হল না-রে
সুখ পরাণের বৈরী
কাঁচকলা আর মিষ্টিকুমোড়
আকাটা তরকারি।
কেঁকর-কো কেঁকর-কো বাজে বেহালা
আগুনবরণ সুন্দরীরে করল সে হেলা।

গায়ক : রাখাল ছেলের গল্প বলি
মাদলেতে বোল ফুটেছে
নাচন করার রোল ছুটেছে
চাতালখানি ঘুরে ঘুরে
ডাইনে নাচে বাঁয়ে নাচে
এমন নাচন নাচে যেন
ঘাগড়াগুলোর পাখনা আছে।
লাল হয়েছে মুখের আদল
জোরে বাজে পাগলা মাদল
সুখ হাসে ভাই প্রাণের পরে
সুখ হাসে ভাই বাহুর পরে
নারীপুরুষ বাহু বেঁধে করে ঢলাঢলি।

ধুয়া : আমার সুখ হল না-রে
সুখ পরাণের বৈরী
কাঁচকলা আর মিষ্টিকুমোড়

আকাটা তরকারি
কেঁকর-কো কেঁকর-কো বাজে বেহালা
সখি লো যায় বয়ে বেলা

জনৈক কৃষক : দয়ার সাগর বটে শক্তিমন্ত গুণী
আমাদের গণ্ডগ্রামে অতিথি আপনি;
কি দিয়ে সন্তুষ্ট করি বস্তু নেই হেন
কি আনন্দ দেখে ঐ করুণা সঘন
প্রশান্ত সুন্দর কান্তি—আপনার আগমনে
ধন্য হল আমাদের উৎসবের দিন।
একটুখানি মুখে দিন সাদাসিধা পানি
সবিনয়ে সবে মিলে করি নিবেদন
দরিদ্রের মনোবাঞ্ছা করুন পূরণ।
আকাশের পানে তুলে যুক্ত নম্রকর
আমরা প্রার্থনা করি
স্বর্গের করুণা যেন নামে শিরোপর।
কৃপা করে যেই পাত্রে দিলেন চুমুক
আমাদের প্রার্থনার বলে
তার প্রতি বিন্দু সুরা যেন দান করে
আনন্দ সন্তোষ ভরা সুদীর্ঘ জীবন।

ফাউস্ট : যে আনন্দ ভালবাসা ভরে
তোমরা আমাকে দিলে পাত্রভরা সুরা
সমান আনন্দে আমি নিই হাতে তুলে
ধন্য-ধন্য বলি
সুদীর্ঘ জীবন হোক উজ্জ্বল সুন্দর।
(জনতা চক্রাকারে তাঁকে ঘিরে দাঁড়াল)

বুড়ো কৃষক : কি আনন্দ মহামান্য পণ্ডিতপ্রবর
আপনি এলেন নিজে করতে খবর
সবার সুখের দিনে আপনার সমান করুণা
ঘিরে আছে, যেমন সক্রিয় ছিল দারুণ দুর্দিনে।
এইখানে অনেকেই আছে সজীবন
আপনার পিতৃদেব নিপুণ হেকমতে
মরণের গ্রাস হতে যাদের জীবনদীপ রেখেছেন টেনে।
আপনি তখন সবে বয়সে তরুণ—
প্লেগ আক্রান্ত গৃহে ক্লান্তিহীন অকম্পিত ধীর পদপাতে
প্রতিদিন যেন এক নব ধন্বন্তরী

পরম বন্ধুর মত দেখা দিয়ে রোগশয্যা পাশে
অর্ধেক দুঃখের দায় নিতেন হৃদয়ে।
সুপ্রসন্ন ভাগ্যের নির্দেশ
বহির্গত হত শব প্রতি গৃহ হতে
জীবন্ত নির্গত হতেন একাকী আপনি
সমস্ত ব্যথার অংশ যাতনার দাহ
নিয়েছেন বিনাবাক্যে মহামারী-হন্তারক গুণী
ঊর্ধ্বে ছিল দয়াময় সাক্ষাতে আপনি।

সকলে সমস্বরে : আমরা সকলে মিলে এ কামনা করি
সুদীর্ঘ জীবন হোক
সবল শরীর হোক প্রাণরসে ভরা
প্রয়োজনে আরো যেন পেতে পারি দয়া।

ফাউস্ট : ওপরে আছেন যিনি
করুণা সকাশে তাঁর কর প্রাণপাত
সঙ্কটে সহায় হয়ে
নিত্য প্রেমময় রূপে দেন পরিচয়।
(ফাউস্ট ভাগনারসহ পথরেখা ধরে অগ্রসর হতে লাগলেন।)

ভাগনার : কৃতজ্ঞ মানুষ, অপার বিস্ময় ভরে
যেই ক্ষণে মাথা করে নত
সবিনয়ে ভক্তিভরে হয়ে দণ্ডবত
না জানি হৃদয়ে জাগে কোন্ অনুভূতি।
সুখী বটে সেইজন, সমৃদ্ধ প্রতিভা যার
টেনে আনে মনুষ্য হৃদয়ের অর্ঘ্য উপচার।
পিতা তার শিশুপুত্রে ডাক দিয়ে বলে
ঐ দেখ সৌম্যকান্তি গুণবন্ত আশ্চর্য পুরুষ।
যেইখানে শ্রীচরণে দিয়ে যান ধূলি
বিস্ফারিত চোখে দেখে মনুষ্যমণ্ডলী
বংশীধ্বনি থেমে যায় নাচে কাটে তাল
জনতা আবেগে তোলে জয়-জয়ধ্বনি,
শিরের ভূষণ উড়ে হাওয়ায় হাওয়ায়
তারপরে সবান্ধবে হয়ে অবনত
গৃহবাসীজন যেন পূজ্যপাদ ঠাকুরেরে প্রণতি জানায়।

ফাউস্ট : আমাদের যাত্রাপথে, বেশি দূরে নয়
দেখা যাবে পাহাড়ের পাদদেশে মসৃণ পাষাণ
এখনো বিরাজে, দু'দণ্ড জিরিয়ে নেব তার পরে বসে।

কতদিন, দিনমান সেইখানে প্রার্থনায় করেছি যাপন
উপবাসে ক্ষীণতনু, আপন অন্তরতল করেছি মন্থন
সমৃদ্ধ আকাঙ্ক্ষা নিয়ে প্রাণের গভীরে
সত্যে রেখে চিত্ত স্থির, দীর্ঘশ্বাসে কত অশ্রুজলে
উপরে স্বর্গের দ্বারে করেছি মিনতি।
চেয়েছি তেমন বর যার কাছে মহামারী মানে পরাজয়।
যদি সে ক্ষমতা হত দেখাতাম করে বিদারণ—
সহস্র যন্ত্রণাভরা অন্তর আমার।
এই যে প্রশংসাধ্বনি লোকমুখে নিত্য নিত্য শুনি
আমার শ্রবণ লোকে কি নির্মম কষাঘাত হানে।
এইসব সরল মানুষ অসঙ্কোচে পিতাপুত্রে করে গুণগান
কোনদিন যোগ্যতার চায়নি প্রমাণ।
অচঞ্চল নিষ্ঠাভরে পিতৃদেব সাধনায় ছিলেন মগন
পরিচ্ছন্ন চেতনায় ব্রাত ছিল মন
প্রকৃত পণ্ডিত তিনি সসম্মানে কেটে গেছে কাল।
নিসর্গের অন্ধকারে ঘনীভূত যে রহস্য বাসা বেঁধে আছে
তাতে প্রাণ করেছেন মুক্ত সমর্পণ।
তথাপি মূঢ়ের দল বদ্ধমতে বোধবুদ্ধি দিয়ে জলাঞ্জলি
অনর্থক কূটতর্ক করেছে প্রচুর।
সেরা চিকিৎসকবৃন্দ পিতৃআজ্ঞা মেনে
সাধনায় রত হয়ে অতি সন্তর্পণে
কেমন প্রণালী মতে বানালেন বস্তু ভয়ঙ্কর।
নানা উপাদান মিশে জন্ম নিল প্রেমোন্মাদ উজ্জ্বল কেশরী
বৈদ্যরাজ দলে জলজ পঙ্কজে বেছে বানালেন ভূতি।
অগ্নিময় লোহার বাসরে প্রেমিক-প্রেমিকা মিলে জন্ম দিল
সুন্দর কনকদীপ্তি স্ফটিক প্রাচীর ঢাকা সৌন্দর্যের রানী।
বস্তুর অন্তরে কন্যা সূক্ষ্মতর বস্তুর সন্তান
মনুষ্য ভাষায় ওরে বলা তাল, বিদ্যা রসায়ন।
সত্য বলি মরেছে অনেক লোক ঔষধের গুণে
কেউ কেউ বেঁচে গেছে, রয়ে গেল অগোচরে
বিয়োগান্ত নেপথ্য কাহিনী।
মারাত্মক ছদ্মবেশী বিষের আরকসহ
উপত্যকাতলে বানিয়েছি একদিন অস্থায়ী ঠিকানা
প্রাণঘাতী মহামারী তার চেয়ে আরো ভয়ঙ্কর
পিতাপুত্র মৃত্যুদণ্ড করেছি প্রদান।
অকালে ঝরেছে কত অচিন্তাজ্ঞা প্রাণ

শরীরে জীবন বয়ে আজো আমি শুনি
হন্তার উদ্দেশ্যে জাগে জয়-জয়ধ্বনি।

ভাগনার : মহাত্মন, অর্থহীন আত্মউৎপীড়ন
অবশ্যই সে জন মহৎ, সুতীক্ষ্ণ মনন বলে
ঐতিহ্যকে করে আত্মসাত, পেরিয়েছে
প্রচলিত নিয়মের সীমা
জনকের কাছে আপনি অনেক ঋণে ঋণী
যৌবনের লব্ধশিক্ষা বিকাশ পেয়েছে দেখি পল্লব মুকুলে।
আপনার আয়ুষ্কালে যদি দেন বিজ্ঞানের নতুন বিধান
আপনার পুত্র হবে উচ্চতর সত্যে স্থিতিবান।

ফাউস্ট : আতঙ্কের অন্ধকারে ডুবে সন্দেহ দোলায় দুলে
যেইজন আমোঘ ইচ্ছার টানে উর্ধ্বে যেতে চায়
নির্ঘাত বাখানি তারে সুখী সেই লোক।
কোন নর যেই সত্য ধরেনি মননে
একমাত্র সেই বস্তু করে তারে গুণী
জেনেছি যেসব বস্তু না জানলে কি ক্ষতি এমনি।
সন্তোষের এ প্রহর ফুরাবার আগে
যেন মানবিক দুঃখসুখ না জাগে হৃদয়ে।
দেখ গোধূলির অন্তরাগে মনুষ্য আলয়
কাঞ্চনের আভা মেখে করে ঝিলিমিলি।
অগ্নিময় রথে, পশ্চিমে হেলেছে ঐ রক্ত দিবাকর
তুরঙ্গম সম, সুতীব্র গতিতে ছোটে
যেন তাকে অবিরাম আয়-আয় ডাকে
রাত্রিময় শান্ত স্থির নিবিড় জীবন।
আমিও তেমন বেগে চঞ্চল পাখায় ভর করে
মৃত্তিকার মায়া ছেড়ে, মৃত্যুহীন রক্ত সন্ধ্যা উপকূলে
অগাধ শান্তির দেশে উড়ে যেতে চাই
নিস্তব্ধ দোলনা যেন আমার চরণতলে পৃথিবী ঘুমায়
শান্তিরসে পরিপূর্ণ উপত্যকা রয়েছে মগন।
ডুবন্ত সূর্যের খুনে আশ্চর্য লালিয়ে গেছে পর্বতশিখর
রূপালি ঝর্নার জল এঁকেবেঁকে করে আত্মদান
প্রশস্ত নদীর বুকে, ছল ছল জলধারা কনকবরণ।
দেবতার মত আমার এ পরিক্রমা
ভেদ করে যাই আমি গিরির বেষ্টনী
দুর্জয় পাহাড়ি বাধা পিছে ফেলে আরো উর্ধ্বে
করে আরোহণ, দেখে যাই অপলক চোখে

তরঙ্গিত মহাসিন্ধু, সাদা সাদা ফেনার শিয়রে
অপূর্ব সৌন্দর্যরাশি নাচে লীলাভরে।
অবশেষে মনে হল চলে গেল লাল দিবাকর
তথাপি অন্তর নাচে সদ্যোজাত শক্তির দোলায়
তৃষাহর আলোকপ্রবাহ ইচ্ছা করি পান করি ধারায় ধারায়
আমার সমুখে নাচে প্রাণবন্ত দিন
সুপ্তিমগ্ন কৃষ্ণ রাত পেছনে গোঙায়
উর্ধ্বে স্বর্গ স্নেহমাখা দৃষ্টি মেলে আমারে দেখিছে
চিত্রবৎ রমণীয় অপূর্ব স্বপন, সূর্যাস্তে বিলীন হল
আমার আকাশে জমে চাপ চাপ ঘন অন্ধকার।
একান্ত আত্মার শ্রমে উর্ধ্বলোক অভিসারী যেই ডানা
করেছি অর্জন, মাটির বন্ধন কেটে দেয় না উড়াল।
তবু এক সহজাত প্রেরণার মত
নির্দিষ্ট— আকাঙ্ক্ষা-লক্ষ্যে উত্তেজিত হও
স্থির থাক, বলবন্ত বাসনায় বাঁধো কায়মন;
যেমন নিজেরে লুকিয়ে রেখে ঝিলিমিলি নীলিমার নীলে
গায়ক চাতক পাখি কণ্ঠের সঙ্গীতরসে আকাশ ভাসায়
অথবা সোনালি চঞ্চু শিকারি ঈগল
সমুচ্চ গিরির উর্ধ্বে পাখা মেলে করে বিচরণ;
কিংবা সসাগরা পৃথিবীরে পাড়ি দিয়ে
আপন কুলায়ে ফেরে লম্বগ্রীব বলাকার দল
যাদের পাখার ঘায়ে চঞ্চল পবন।

ভাগনার : এমন আমারও ঘটে, চিত্ততলে ভিড় করে রঙ্গিন কল্পনা
তবে আপনার মতন এমন
কখনো হয় না মন তীব্র উচাটন।
মাঠ আর অরণ্যের বুনো দৃশ্য বড় বেশি ক্লান্তি আনে
পাখিরে করি না ঈর্ষা সঙ্গত কারণে।
আমার সমস্ত সুখ গ্রন্থের অন্তরে
মুখ বুজে পাঠ করে ভেসে যাই আনন্দ সলিলে
যদিও শীতের রাত ঠাণ্ডা ডেকে আনে
এলোমেলো হাওয়া বয় অতি কনকনে
তথাপি আরাম ভারি অঙ্গে অঙ্গে কি-যে ওম লাগে
যখন প্রসারি কাঁথা মনে হয় স্বর্গসুখ মর্তে এল নেমে।

ফাউস্ট : একটি উদ্দেশ্য মাত্র গ্রাস করে রেখেছে তোমায়
অনিষ্ট চেতনা স্রোতে দুই ভাব কখনো জাগে না।
কিন্তু বন্ধু দ্বৈতসত্তা পরস্পর দ্বন্দ্বরত আছে সর্বক্ষণ

একসত্তা অপর্যাপ্ত স্থূল সুখ চায়
পৃথিবীর যেইখানে ইন্দ্রিয় বিবশ করা বর্ণগন্ধ রাজে
অবুঝ শিশুর মত সেইদিকে দু'হাত বাড়ায়
ভিন্ন সত্তা শ্যামল বনানীপানে ছুটে যেতে চায়
কুৎসিত কর্দম পঙ্ক করে পরিহার
আলোকিত ঐতিহ্যকে করে আলিঙ্গন।
ওহে প্রেতআত্মাগণ স্বর্গ আর ধরণীর মধ্যিখানে
আনন্দেতে পেতেছ আসন
নিঃশ্বাসের সুরভিতে চঞ্চল পবন।
আসমানের সোনালি সোপান থেকে নেমে এস
চেতনা আসনে বস, আমাকে সুন্দর কর, দাও হৃষ্টবর
জন্ম যেন লই আমি আরো একবার।
শক্তিমান যাদুর প্রসাদে দূরদেশে যাওয়া যায় দৃষ্টির নিমিষে
সেরকম একখানি উত্তরীয় যদি পেয়ে যাই
চাই না মাণিক্য-খচিত কোন রত্ন-সিংহাসন।

ভাগনার : ক্ষান্ত হোন পণ্ডিতপ্রবর
গোধূলিবিহারী আকাশসঞ্চারী
ওঁত পেতে আছে
প্রেতের বাহিনী
ভাসমান জীব, আহ্বান শুনে
দল বেঁধে যদি নামে ডাকিনী।
ছড়াবে অনল শ্বাসেতে গরল
বিষাক্ত বড় লেলিহ রসনা
আঁধারের জীব আঁধার সুতায়
ছলনার জাল করে রচনা।
বাঁধা পড়ে তাতে বড় অবেলাতে
অবুঝ সরল মানুষমীন
থামুন থামুন বড়ই করুণ
চক্রব্যূহ আছে অন্তহীন।
উত্তর হতে লাল জিভ মেলে
হিস-হিস রবে আসে যখনি
প্রেত দলে দলে আঁখির ঝলকে
মহামারী প্লেগ নামে অমনি।
পূরব হতে ঝাঁক বেঁধে পথে
প্রেতেরা সবাই মিলে দলে-দলে
ফুসফুস চিরে তরল শোণিত
পান করে যদি উড়ে যায় চলে।

দুপুরবেলায় প্রেতেরা পাঠায়
অভিসম্পাত বড় খরতর
মগজ বিকল স্নায়ু শিরা ঘিরে
কালো ছায়া নাচে থরথর।
সন্ধ্যাবেলায় আবেশে এলায়
সবুজবরণ আশার ছলনা
তার ফলে হায়, মাঠ ভেসে যায়
বুকে ঢেউ দিয়ে জাগে বেদনা
প্রেতেরা সবাই পেতে থাকে কান
মন্দের জয় কাম্য সকল সময়ে
বড় অনুগত মাথা করে নত
থাকে দেবদূত সম বিনয়ে।
নিদানের কালে করে প্রতারিত
নীলাকাশ ফেটে নামে অশনি
কালি সাঁজ এল, ভারি হাওয়া বয়
কুয়াশার জাল জড়িয়েছে ধরণী।
ঘরে ফিরে চলি বারবার বলি
ভবন ধুয়ারে, আঁধার পড়িছে আছাড়ি
রাতের কপাটে গোধূলি ললাটে
কি দেখিছ সব পাশরি।

ফাউস্ট : জনারের ক্ষেতে ঐ করে ছুটোছুটি
দেখেছ কি কালোমত লোমশ কুকুর।

ভাগনার : আগেই দেখেছি তবে
ভালভাবে দৃষ্টি করি নাই।

ফাউস্ট : ভাল করে চেয়ে দেখ তারপর বল
কি রকম চতুষ্পদ হতে পারে ওটা।

ভাগনার : ওটা এক গৃহপোষা বেচারি কুকুর
পথে পথে শুঁকে করে প্রভুর সন্ধান।

ফাউস্ট : চেয়ে দেখ
অতিদূর থেকে ঘুরে ঘুরে আসে
ক্রমশ নিকটবর্তী
দৃষ্টিহারা নয় যদি নয়ন আমার
তাহলে প্রাঞ্জল দেখি
জিভের ডগায় জ্বলে লাল অগ্নিশিখা
সে আলোকে পথ করে চরণ বাড়ায়।

ভাগনার : দৃষ্টির বিভ্রম বটে
সাদা চোখে দেখি আমি
ওটা এক পোষিত কুকুর।

ফাউস্ট : আমার হৃদয়ে জানি কেন জাগে ভয়
চতুষ্পদ বেটা যেন যাদুভরা উর্ণাজাল চৌদিকে ছড়ায়।
আমাদের ভবিষ্যৎ পথে
বিছাইছে ইন্দ্রজাল মায়ার ছলনা।

ভাগনার : আমি তো নিশ্চিত, ওটা এক পোষিত কুকুর
প্রভুর তালাশে ফিরে
অচেনা মানুষ দেখে ভয় পেয়ে করে ঘোরাঘুরি।

ফাউস্ট : তাহলে এদিকে এস, সঙ্গে চল কুকুর-নন্দন

ভাগনার : জানে বেটা নানান চাতুরি
আপনি থামুন পথে সেও যাবে থেমে
ডাক দিন ছুটে এসে বিস্ময়ে তাকাবে।
আরো নানা খেলা জানে
লাঠিগাছি ছুঁড়ে দিন জলে
তুলে এনে রেখে দেবে চরণের তলে।

ফাউস্ট : সঠিক বলেছ বন্ধু
ভূতপ্রেত কিছু নয়
প্রভুভক্ত বেচারি কুকুর।

ভাগনার : যে কুকুর শিক্ষকেরে মান্য করে থাকে অনুগত
উপযুক্ত শিক্ষাগুণে এত সুচতুর।
অনায়াসে সেও কাড়ে জ্ঞানীর মমতা
দেখুন কেমন চোখে চেয়ে আছে
যেন গুরু পদতলে বসে শিষ্য একজন।
(তারা নগর ফটকের অভ্যন্তরে প্রবেশ করল)

তৃতীয় দৃশ্য

ফাউস্টের পাঠকক্ষ [দুই]

[ফাউস্টের প্রবেশ : পেছনে কুকুর]

ফাউস্ট : আমার পেছনে ব্যাপ্ত কানন প্রান্তর
নক্ষত্রখচিত ঐ আকাশের তলে
ঘনিয়েছে পুঞ্জ পুঞ্জ ঘন অন্ধকার।
পবিত্র আতঙ্ক নামে শিরায় শিরায়
স্বর্গমুখী বাসনার শুদ্ধ আকর্ষণে
নানামুখী আকাঙ্ক্ষার রশারশি ছিঁড়ে
জীবনের দুঃখশোক যন্ত্রণার নিষ্ঠুর পীড়ন
দ্বিগ্বিদিকে ধাবমান শোণিতে রঞ্জিত লাল
কামনা প্রবাহ মনে হল বড় মধুময়।
অন্তর স্বগত করে করুণার বাক্য উচ্চারণ
জিনি মণিমুক্তা হেম হৃদয়ে আলোর মত
নেমে এল ঈশ্বরের প্রেম।
ওহে অশান্ত কুকুর
দরজার পাশে কেন কর ঘুরঘুর
স্থির হয়ে বস বিলক্ষণ
বিচরণযোগ্য নয় এই বাসস্থান।
দিলাম খোলাসা করে গদি-আঁটা নরম আসন
উনানের পাশে কর নিশ্চিন্তে শয়ন
চুপচাপ শব্দহীন
মনে কর সব সংজ্ঞা ডুবে গেছে ঘুমের অতলে।
প্রান্তরে দেখেছি আমি নানা ছলাকলা
পাহাড়ের সানুদেশে তোমার হেকমত
দেখেছি বিস্মিত চোখে, তাই তো অতিথি করে
মনের সন্তোষে এনেছি তোমাকে ডেকে
দাও সেই আতিথ্যের যথার্থ সম্মান
এইবার সুনিদ্রায় কর নিমগন।

এই ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে আমার
জ্বলছে শান্তির দীপ
বিধাতার অবারণ করুণার মত
আমার প্রশান্ত মনে শুচিস্নিগ্ধ আলোক প্লাবন
হৃদয় ফিরিয়া পেল হৃদয়ের ভাষা
অন্তর গাহিল পুনঃ আশার সঙ্গীত।
হৃদি পদ্মদলে আলোকের করুণ ঝঙ্কারে
সাড়া দিয়ে বলে গেল বোধি তার সাবলীল বাণী
দৃষ্টিমুখে মূর্ত হল জীবন ফোয়ারা
যেন দুগ্ধপুষ্ট মাতৃস্তন, যে নির্মল ধারাস্রোতে
অন্তরাত্মা নিত্য যাচে আহার গাহন।
ক্ষান্ত হও কুকুরপ্রবর, ক্রমাগত উচ্চকিত তোমার চিৎকারে
অন্তরের একাগ্রতা বড় ক্ষুণ্ন করে
সত্য বটে এমন মানুষও আছে
অজানা বিষয়ে করে পাক ছোঁড়াছুঁড়ি।
সুন্দরের কল্যাণের শুদ্ধ আবেদন
পশে না যাদের মর্মে তারা করে নিষ্ঠুর বিদ্রূপ।
তোমরা কুকুরগণে নিয়ো না স্বভাবখানি
শোভা পায় দ্বেষযুক্ত ভদ্র জনগণে।
বেদনা বিদীর্ণ প্রাণে ব্যাকুল মিনতি ভরে
করেছি প্রার্থনা, অন্তরের অন্তঃস্থলে
নামো তুমি শান্তি মনোরমা।
মধুর সন্তোষ এল না আমার প্রাণে
বৃষ্টিধারা সম।
তাহলে কি জীবনের ঝরনা শুকাল
বুকভরা তৃষ্ণা নিয়ে ধুকে ধুকে মরা
এই তবে মানুষের অন্তিম নিয়তি।
এই তো চূড়ান্ত সত্য সুদীর্ঘ দিবসের দিব্য অভিজ্ঞান
তবুও অপার দুঃখ লাঘব প্রয়াসে
আমরা কামনা করি মৃত্যুহীন বস্তুর প্রসাদ।
প্রত্যাদেশ প্রতীক্ষায় থাকি সর্বক্ষণ
বিশ্বাসে স্পন্দিত প্রাণ মেলে রাখি
এই বুঝি স্বর্গবার্তা করে কানাকানি।
প্রেরণার দীপ্তি ভরা আশ্চর্য সম্ভবা বাণী
ঝরনা প্রবাহসম নিটোল ভাষায়, যেরকম
প্রাণ পেয়ে জেগেছিল ধর্মের পুস্তকে।
উতলা উদ্দাম চিত্ত ধায় প্রাণমন
প্রতিজ্ঞার কাছে করি পূর্ণ সমর্পণ।

পবিত্র লিপির বাণী ধ্যান বলে টেনে আনি
অনুরাগে অখণ্ড প্রয়াসে অর্থ তার ব্যক্ত করি
জননীর স্তন্যসহ পান করা আপন ভাষায়।
(একটি গ্রন্থের পৃষ্ঠা খুলে কর্মে নিরত হল)

লেখা আছে আদিতে ছিলেন বাক্য
ভেবে দেখি মনে— কি আছে নিহিত ওতে
বাক্যে তো বিধৃত নয় সত্য সনাতন।
অতএব খুঁজে নেব নবীন ব্যঞ্জনা ভরা সাক্ষাৎ প্রকাশ।
অন্তরাত্মা যদি করে এমন নির্দেশ
তাহলে কেমন হয়, আদিতে ছিলেন ভাব।
সূচনায় ভিড় করে জল্পনা-কল্পনা
গূঢ় অর্থ মারা যাবে অসঙ্গতি দোষে।
আদ্যোপান্ত ভেবে দেখি
ভাব কি সৃজন করে, কর্মের ঘর্ঘর চক্রে নিয়োজিত হয়,
নির্দেশে তটস্থ রাখে সমস্ত প্রহর?
সর্বোৎকৃষ্ট যদি বলি আদিতে ছিলেন শক্তি
সপ্রতিভ অঙ্গুলি হেলনে দেখি লেখনী চলে না
সংশয় জড়িমা এসে করে গতিরোধ।
অবশেষে আত্মা হল সহায় আমার
আদিতে ছিলেন কর্ম লিখলাম দ্বিধাহীন চিত্তে।
সারমেয় পুত্র ওহে, এই গৃহে যদি তুমি কর অবস্থান
শোন তবে বন্ধ কর পদ ছোড়াছুড়ি
থামাও থামাও বলি বিকট গর্জন।
নিঝুম যামিনী বেলা অনাবিল শান্তিনাশা
এরকম বন্ধুজনে সন্নিকটে নেই প্রয়োজন
অবশ্যই মেনে নেবে সাক্ষাৎ প্রস্থান।
যেহেতু আমি হই গৃহস্বামী
তাই নগদ বিদায় বন্ধু আমারে সাজে না
তুমি মুক্তি পেতে পার কুকুরশাবক।
কি আশ্চর্য, কি আশ্চর্য, এ কি আমি দেখি
প্রকৃতি করেছে মূর্ত বিদঘুটে প্রহেলী
কুকুর ধরেছে দেখি মূর্তি ভয়ঙ্কর
একি স্বপ্ন নাকি সত্য?
দৃঢ় বলে দাঁড়ায় সে— জন্ম জন্ম ভর
দেখিনি কুকুর কোন এত উঁচু এমন আকার।
আমন্ত্রণ করে আমি সযত্নে এনেছি

ভয়ঙ্কর জীব এক ছায়ার শরীর
জলজ হস্তীর মত ক্রমে ক্রমে সন্নিকটে আসে
অগ্নিতে গঠিত থাবা অতি সুবিশাল
ধকধকে দীপ্তিমান প্রখর নখর
নয়নে নয়নে জ্বলে অগ্নি খরতর।
নরক নিবাসী জীব তাহলে এবার
পেয়েছি মুঠোয় তোরে
সুলেমানী ইন্দ্রজালে ঘটাব প্রমাদ।

ছায়া শরীরী প্রেতবৃন্দ : (নির্জন গৃহকোণে)
ভেতরে ধরা পড়েছে একজন
বাইরে রহ তাই সকলে
শেয়াল যেমন ফাঁদে জড়ায়
তেমনি করে, তেমনি করে
জড়িয়ে গেছে নরক শেয়াল
সাবধানে যাও সদলবলে।
নরক দেশের খাটাস রাজা
এখন আছে বন্দিখানায়
পশুর রাজা পশুর মত
ভয়ে ডরে কেমন গোঙায়।
ভাই সকলে এই কর পণ
নেব তারে মুক্ত করে
ওপর নিচ চারদিকেতে
উড়ে বেড়াও ঘুরে ঘুরে।
ছায়ার শরীর ছায়ার মত
হাত প্রসারো ভাই সকলে
পশুরাজে মুক্তি দেব
দক্ষ হাতের ছলে কলে।
দয়ার সাগর নরক-নায়ক
আমরা তাকে গুরু মানি
বিপদে তার মদদ দেব
গয়ংগচ্ছ তুচ্ছ মানি।

ফাউস্ট : এই যে কীট নরকলোকের
শাস্তি দেব সমুচিত
চতুর্বাণ মন্ত্র পড়ে
অগ্নি গড়ন সরীসৃপ
মারব ছুঁড়ে মারব ছুঁড়ে

জাগবে তখন দৃষ্টি অতীত
হাজার লক্ষ প্রেতযোনি।
চলবে মনে প্রাণ তরঙ্গে
যেন সাগর লহরি,
ধরবে চেকে এঁকেবেঁকে
প্রেতলোকের প্রহরী।
অনিমতর ক্ষুকণা
দেখেনি যে চোখ মেলে
শক্তি ঘুমায় বীজের মত
পরমাণুর অন্তরে,
জানেনি সে কেমনে ঠেকায়
কুটিল গতি ছায়ারে
দৃষ্টির অতীত ছায়ার মত
নারকী প্রেত-প্রেতিনি
অগ্নি গন্ধর্ব সরীসৃপ
জ্বালিয়ে তোলে লাল আগুন
আকাশ লোকে বিহার করা
দলে দলে আকাশ প্রেত
রাতের তারে কলসে ওঠে
পড়ুক ঝরে তারার ফুল।
ঘুরে বেড়াস স্রোতের জলে
কাঁকন চুড়ির ঢেউ তুলে
ডাক দিয়েছি মৎস্যকন্যা
দ্বার খুলে দে অতলে।
শস্ত্র যায় না ছেদন করা
অগ্নি তারে দহে না
মৃতের দল তর্ক করে
আসল কথা কহে না।
চতুর্বাণ মন্ত্র পড়ে করেছি জখম
তবুও নরক পশু দুরন্ত বজ্রের বেগে
প্রবল বিক্রমে জাগে
যেন অন্ধকার কালো কালো ছায়ারে প্রসারে।
দুরন্ত যোদ্ধার মত হানা দিয়ে
গৃহের লালিত শান্তি খণ্ড খণ্ড করে
ছাদেতে ঠেকায় মাথা
কৃষ্ণকান্তি মেঘমালা অতি ভয়ঙ্কর।
শোনচিবার করছি তোরে

নরকলোকের ঘৃণ্যজীব
পদতলে শির ঠেকাবি
নইলে মরণ উপস্থিত।
পুড়ে যাবি মরে যাবি
তীব্র ভীষণ সেই দহন
পবিত্র সে অগ্নিশিখা
ত্রিত্ব নামই তার কারণ।
যেদিকে যায় ভস্ম করে
অমোঘ সেই তীক্ষ্ণ তূণ
অহঙ্কারের আড়াল ঠেলে
পায়ের তলে লুটিয়ে পড়
হাতে আমার বজ্র নাচে
টঙ্কারে তার ক্রুদ্ধ স্বর।

মেফিস্টোফেলিস : (কুয়াশার প্রহেলিকা অন্তর্হিত হওয়ার পরে
ভ্রাম্যমাণ পণ্ডিতের বেশে বেরিয়ে এল।)
কেন এত শোরগোল, কই গেল সাধনার আনন্দ অপার।

ফাউস্ট : এতক্ষণে জানা গেল কুকুরের মূল পরিচয়
স্বভাবে ভ্রমণকারী সর্ব অঙ্গে পণ্ডিতের বসন ভূষণ
অধিক আশ্চর্য আর কিসে হব?

মেফিস্টো : সুধী মহাত্মন,
রাখলাম শ্রীচরণে বিনত প্রণতি
আপনার রূঢ় ব্যবহারে
ঘর্ম ছুটে দরদর সর্ব কলেবরে।

ফাউস্ট : কি নাম তোমার?

মেফিস্টো : নিতান্ত মামুলি প্রশ্ন
মহাত্মন, তবু করি আপনার সন্তোষ বিধান
শব্দকে দেয় না যে কানাকড়ি মূল্য
স্বপ্ন আর সাদৃশ্য ভাবে ধুলাবালি তুল্য
প্রাণের গভীর অর্থ খেলে যার ধ্যানে
এই হল পরিচয় দেই অনুমানে।

ফাউস্ট : সন্দেহ সংশয় ভরা যত ভদ্রজনে
যথার্থ পরিচয়ে চিনে নেয়া ভাল
মক্ষীরাজ, ধ্বংসকারী, মিথ্যা মহারাজ
কি নামে ডাকলে হবে বাক্যের সদ্‌গতি।

মেফিস্টো : আমি হই সে শক্তির অংশ অপহারী
মন্দ কর্মে সর্বক্ষণ খেলে যে চাতুরি
কিন্তু তার পরিণাম অতিশয় ভাল।

ফাউস্ট : আবরণে কি সত্য বিরাজে?

মেফিস্টো : আমি হই সেই শক্তি
কুণ্ঠাহীন কণ্ঠে করে দীপ্ত অঙ্গীকার।
একথা তো মিথ্যা নয়, যা কিছু জন্মায় অর্থহীন
কাল সব কুটিল করাতে কাটে
তার চেয়ে ভাল—যদি হত জন্মহীন উষর ধরণী
অবনতি ধ্বংস পাপে লাভ মনে গণি
এসকল কর্মে পাই প্রাণের সন্তোষ।

ফাউস্ট : দিব্য অমঙ্গল বলে সদর্পে ঘোষণা করে
কি করে দাঁড়িয়ে আছ আমার সমুখে?

মেফিস্টো : নিতান্ত সরল সত্য করেছি প্রকাশ
মানুষের সংশয়ী চেতনা, মনে মনে করুক কল্পনা
এই বিশ্ব চিরন্তন আনন্দ বাসর, কে ঠেকায়
একদা ব্রহ্মাণ্ডে ছিল অখণ্ড প্রতাপ
আমি সেই তমসার শরীরী সন্তান।
চরাচরে প্রভুত্ব বিলাসী সেই গর্বিত আলোক
রাত্রির তামসগর্ভ দীর্ণ করে
বিফল প্রয়াসে ধায় সে সমুখ পথে
নবীন কান্তিতে গড়ে নব পরিচয়
আঁধারের গ্রাসে ঘটে পুনর্বার অস্তিত্ব সংশয়।
বস্তুর অঙ্গজ শিশু বস্তুকে সে করে গরীয়ান
তবুও নির্মম বস্তু নিত্য করে তার গতিরোধ
এইভাবে নিরবধি সৃজনের স্রোতে
বস্তুসহ সেও ধায় বিনষ্টির পথে
অবশেষে একদিন অতি ভয়ঙ্কর
বস্তুসহ সেও নিজে হবে ছারখার।

ফাউস্ট : বুঝলাম তোমার প্রকাণ্ড ইচ্ছা অতি অনায়াসে
সুবিশাল ধ্বংসযজ্ঞ ব্যর্থ হল,
তাই কর খুচরা কাজে শক্তি ব্যবহার।

মেফিস্টো : তাতেও সুযোগ অল্প
বৈনাশিক শক্তি ছুটে বটে, তীব্র বেগে গতির লীলায়
তবু কোথা হতে জেগে ওঠে সুকঠিন বাধার প্রাচীর।
ব্যস্ত থাকি সর্বক্ষণ, যত্নে করি জল্পনা-কল্পনা
অন্তরালে পশে না আমার দন্ত, প্রাচীরের টুটে না সীমানা।
জাগিয়েছি ভূমিকম্প দাবানল সংখ্যাহীন জলের প্লাবন
তবুও বিশাল সিন্ধু তরঙ্গের শিহরে দোলায়
স্থলভূমি হেসে ওঠে ফলফুল মাটির মায়ায়।

কত কতবার মানুষ ও পশুদের দিয়েছি
আক্রোশে ছুঁড়ে অভিশপ্ত কবরখানায়
জীবের প্রজাতিবৃন্দে করেছি সংহার।
পণ্ডশ্রম, বৃথা সব তাদের শোণিতধারা
স্ফুটমান প্রতিটি উষায়
সৃজন সঙ্গীতে পায় পুনঃ নব প্রাণ।
অবিশ্রান্ত জল মাটি হাওয়ার কণায়
আর্দ্র উষ্ণ হিমানীর গুণ্ঠনের তলে
ফুটে থাকে ঝাঁকে ঝাঁকে জীবনের ফুল।
এখনো আমার শিখা তীব্র দীপ্তিমান, অগ্নিশক্তি
সর্বক্ষণ সহায় আমার
অগ্নিতে গঠিত তনু
প্রখর জ্বলন্ত অগ্নি বান্ধব আমার।

ফাউস্ট : চিরঞ্জীব সৃজন ক্ষমতা
আমাদের দান করে নিত্য নিরাময়
সস্নেহ কোমল হস্তে, বেদনার অগ্নিদাহ করে নিবারণ
বৃথারোষে, মুষ্ঠিবদ্ধ করে
কল্যাণদায়িনী সেই ফুল্ল প্রাণধারা
কি সাধ্য তোমার, রুদ্ধ কর কালো মুখ জ্বলন্ত হিংসায়।
ভেবে দেখ পুনর্বার অকল্যাণ আঁধারের
গর্ভশ্রাব নিষ্ঠুর সন্তান
শ্রেয়ঃ কোন কর্মে দাও মন।

মেফিস্টো : মহাত্মন, আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ
আমাদের বাক্যালাপে পাবে পূর্ণ স্থান
যদি দেন অনুমতি, এইক্ষণে হই তবে সাক্ষাৎ বিদায়।

ফাউস্ট : কেন চাও অনুমতি, তোমাকে চিনেছি আমি
ইচ্ছা হলে এস, এখন নিক্রান্ত হও
দরজা খোলাই আছে, বাতায়ন হতে পারে গমন সহায়
অথবা চুল্লির নলে ধাও তাড়াতাড়ি।

মেফিস্টো : স্বীকারে আপত্তি নাই
আটকে গেছি সামান্য কারণে
আপনার দরজা শিয়রে
শয়তানের বিতাড়ন মন্ত্রলিপি রাজে।

ফাউস্ট : মন্ত্রলিপি তোমাকে ঠেকাতে পারে
কঠিন জঞ্জালে
নরকের পুত্র বল, কি করে ভেতরে এলে,
বন্দি হলে কি প্রকারে এমন খেদায়?

মেফিস্টো : মহাত্মন, অপরাধ করুন মার্জনা
আল্পনা মন্ত্রলিপি রেখায়-রেখায়
লিখেছে নিপুণ হাতে দ্বারের ললাটে
বহির্দেশে ফাঁক আছে একটুকু কোণ
আপনি নিজের চোখে তাকিয়ে দেখুন।
ফাউস্ট : কোন কোন ক্ষণে সৌভাগ্য আপনি এসে খিলখিল হাসে
বন্দিরূপে এইখানে কর অবস্থান
পেতে পারি কোন কিছু যা আখেরেতে করে ভাগ্যবান।
মেফিস্টো : অন্ধ হয়ে খেলাচ্ছলে নির্বোধ কুকুর
ভয়ঙ্কর কারাগারে ঠেকেছ মুশকিলে
এখন শয়তান জব্দ, পালাবার পথ নাই কোন।
ফাউস্ট : কেন, খোলা খড়খড়ির পথ কর ব্যবহার।
মেফিস্টো : মহাত্মন, তাহলে শুনুন
দৈত্য দানো অশরীরী নরকের জীব
সকলে অমোঘ এক আইনের অধীন
যে-পথে প্রবেশ করে, সেই পথ ধরে
পুনরায় যেতে হয় নিবাসে ফেরত
যদি বা লঙ্ঘন করি কঠিন কানুন
কপালে ভোগান্তি আছে আপনি জানুন।
ফাউস্ট : নরকেও আছে তবে নিজস্ব কানুন
এই দুনিয়ায় মানুষে মানুষে হয় নানা চুক্তিনামা
নরকের ভদ্রলোক তুমিও বা বাদ যাবে কেন
এস তবে চুক্তি করি।
মেফিস্টো : পুষ্টিকর প্রতিশ্রুতি নরক বিলায়।
যে ক্রীড়ার পরিণামে তাসগুলো ভিন্ন হাতে যায়
কাজ নেই তেমন ক্রীড়ায়।
এরকম চুক্তিপত্র সহজে যাবে না মেলা
তবু আমি করি অঙ্গীকার
সময়-সুযোগ মত হবে আলাপন।
মহাত্মন, শ্রীচরণে ব্যাকুল মিনতি
এখন বিদায় হই দিন অনুমতি।
ফাউস্ট : গুণ্ঠনে আবৃত কিছু আগাম সংবাদ
জেনে নেই অবসরে প্রবল বাসনা।
মেফিস্টো : দয়া করে যেতে দিন
পুনর্বার ফিরে তাড়াতাড়ি
আপনার কৌতূহল সানন্দে মেটাব।
ফাউস্ট : অতল নরক থেকে তোমাকে ডাকিনি আমি
স্বেচ্ছাবিহঙ্গের মত আপনি এসেছ উড়ে,

যার জালে বন্দি হয়ে শয়তান গোঙায়
সে যেন উচিত মত শয়তানে আটকায়
যায় যদি একবার
দেবে কি কখনো ধরা জীবনে আবার।

মেফিস্টো : তাতে যদি প্রীত হোন, অঙ্গীকার করি
আপনাকে সঙ্গ দেব
শ্রীচরণে বিনীত প্রার্থনা
যাতে করে অনায়াসে সময় পোহায়
শিল্প সৃজনকর্মে দিতে চাই মন।

ফাউস্ট : দেখব তোমার শিল্প কোন্ রূপ ধরে
সানন্দ সম্মতি দেই
সঘন আনন্দময় কিছু যদি দাও উপহার।

মেফিস্টো : এ প্রহরে নির্জীব শরীরবৃন্তে
অনুভূতি জন্ম দেবে নতুন মুকুল;
যে আনন্দ এ জীবনে স্বপ্নেরও অতীত
চঞ্চল হাওয়ার ঘায়ে জড়তা ভোলাবে।
বর্ষেরও অধিক কাল কৃচ্ছ্রতায় কেটেছে জীবন
বেদনা দিয়েছে দাহ
দুঃখ কানে ফেলেছে নিঃশ্বাস
প্রেত দলে দলে বিলাবে সঙ্গীত সুরা
নানারঙ্গ দৃশ্যপট দৃষ্টির সমুখে
এনে দেবে সুদর্শন চিত্তহারী অতি মনোরম
অর্থহীন ইন্দ্রজাল তার চেয়ে লক্ষগুণে ভাল।
দূরে যাবে অন্তরের আকুলিবিকুলি
সৌগন্ধ বাহিত হাওয়া হৃদয় ভরাবে
চিত্তের গহন তলে জন্ম দেবে মধুর ভাবনা
সময় আসন্ন হল, চমৎকার শুরু হোক গান।

প্রেত দলের গান : খসাও তাহলে
আঁধারে জড়ানো
শোকজর্জর গুণ্ঠনখানি
উজ্জ্বল ভরা নম্র সুনীল
দৃষ্টিতে দিক মৃদু হাতছানি।
স্ফুলিঙ্গ ঠিকরে
জীবন শিহরে।
ছায়ার মতন উধাও নীলিমা
মেঘমালাগণে
শিথিল চরণে—
যেতে যেতে জ্বালে তারার শোণিমা।

সৌরকর রাশি
মেলে ধরে হাসি
সুন্দর বড় সোনার বরণ
মেঘবালা দলে
নেচে নেচে চলে
তনুলতা ঘিরে পুষ্প বসন।
রামধনু যেন
হাসির লহরি
জলের কমলে স্বপ্ন লুকায়
আকুল কামনা
ব্যাকুল বাসনা
হৃদয়ে হৃদয়ে পরশ বুলায়।
অঙ্গে ধরেছে
নিকুঞ্জতল
মূর্চ্ছানো ছায়া শীতল নিবিড়
স্বর্গ বেনারসি
ক্ষণে ক্ষণে পড়ে খসি
পিছল শরীরে রহে না থির।
পুলকে কাননে
পুষ্প চয়নে
শরমে রাঙ্গা প্রেমিক-প্রেমিকা
ব্যাকুল পরাণে
গেঁথেছে যেখানে
মধুবসন্ত গন্ধ মালিকা।
দ্রাক্ষা লতিকা
শাখারে জড়িয়ে
গুচ্ছগুচ্ছ ফলভারে নত
যাঁতা ঘূর্ণনে
প্রেষণ প্রবাহ
তরল তরুণ খুনের মত।
ছুটেছে ধারায়
অরুণ রেখায়
পাহাড় পেরিয়ে ফেনিল সদ্য
নদী বেঁকে চলে
বনরাজি ঠেলে
ঝলমল করে রঙিন মদ্য।
পাখা মেলে তারা

মনের হরষে
অঞ্জলি পেতে পান করে সুরা
সূর্য সকাশে
উড়ে উড়ে চলে
খুশিতে ব্যাকুল আলোক শিশুরা।
শান্তি দোলনা
ঝলমল করে
মন্থরতর আয়েশী দোলায়
ঘুমেতে মগন
ছোট দ্বীপমালা
আলোক বসনে নয়ন ভোলায়।
পেয়েছি শুনিতে
মধুর ধ্বনিতে
জাগে সঙ্গীত ঘন আনন্দমাখা
ঘাসের চাতালে
বাজে তালে তালে
ব্যাকুল পরাণ, দায় ঘরে রাখা।
ছুটে আসে সবে
ললিত নায়ক
উদ্দাম গতি বন্ধনহারা
আকাশের ডাকে
আসে ঝাঁকে ঝাঁকে
হৃদয়ে হৃদয়ে পড়ে গেছে সাড়া।
কেউ কেউ আসে
প্রাণের বিলাসে
দুলবে মধুর নীলিম নিখিলে।
আসে আসে সবে
মহাউৎসবে
সুন্দর বটে জাগে চরাচরে
আকাশে আকাশ
মাতামাতি করে
পুলকপ্রবাহ নাচে থরে থরে।
নক্ষত্র নয়নে
ঝরে ক্ষণে ক্ষণে
উজ্জ্বল বড় কমনীয় শিখা
ঝরছে অঝোরে
মরণ মাধুরী।
ত্রিভুবনে নাচে লাবণ্য লিখা।

মেফিস্টো : সে ঘুমায়, সাবাশ সাবাশ বলি
নিপুণ হেকমতে সিদ্ধ দক্ষ কারিগর।
তন্দ্রা চোখে ঢুলু ঢুলু নিদ্রা নামে স্বপ্নরস ভরা
চমৎকার গীতবাদ্য
সমস্ত বাস্তব সংজ্ঞা করেছে হরণ।
এই নাও যথাযোগ্য তার পুরস্কার।
ক্ষুদ্র অতি সামান্য মানুষ
আস্পর্ধায় চায় গৃহবন্দি করে রাখে নরক-নায়ক।
স্বপ্নে তারে বন্দি করে রঙ্গে রসে কর আকর্ষণ
গীতবাদ্যে নিয়ে চল প্রমোদনগরে।
নিষেধের চিত্রলেখা দ্বারের ললাট লিপি দীর্ণ হবে
ভ্রাতঃ মূষিক এসে তীক্ষ্ণদন্তে দেয় যদি কয়েকটি টান
কিবা ফল মিথ্যা অনুনয়ে
আপনি মূষিক রাজ দ্রুত আসে চপল চরণে
নিজ কর্ণে দিব্যি আমি শুনি
কুট-কুট কুট-কুট ধ্বনি প্রতিধ্বনি।
মাছির রাজা ব্যাঙের রাজা
উকুন ও ছারপোকার রাজা
জলদি এস শঙ্কাহরণ দন্তপাটি বাগিয়ে
মন্ত্রঃপুত প্রতীকচিহ্নে করাতি দাও চালিয়ে।
দোরের মাথায় মন্ত্র পড়ে তেল ঢেলেছে যেখানে
কাটুস-কুটুস দাঁত বসান ইঁদুরসেনা একজনো।
জলদি হে ভাই জলদি কর
বন্দি ঘরের একটি টেরে
প্রভু আছেন পেরেশানে।
হেইয়ো হো ভাই সকলে
একটুখানি সামনে যাও
জোড়ের যেথা ফাঁক রয়েছে
জোরে জোরে দাঁত বসাও।
ফাউস্ট থাক স্বপ্নে লীন
পুনঃ দেখা হলে পাবে সবিশেষ চিন।

চতুর্থ দৃশ্য

ফাউস্টের পাঠকক্ষ [তিন]

ফাউস্ট : কে দাও কপাটে টোকা
আমার বিশ্রাম ক্ষণে—
জ্বালাতন কর কোন্‌জন
ভেতরে প্রবিষ্ট হও।

মেফিস্টো : এই আমি।

ফাউস্ট : চলে এস।

মেফিস্টো : অনুরোধ করি
এইরূপে তিনবার কর নিমন্ত্রণ।

ফাউস্ট : এস তবে ডাকি আরবার।

মেফিস্টো : চমৎকার, চমৎকার
এরকম সম্ভাষণ কাঙ্ক্ষিত আমার।
এখন ভরসা করি
আমাদের উভয়ের প্রাণের পিরীতি
যথার্থ গভীর হল।
এই দেখ, এসেছি সম্ভ্রান্ত বেশে
অঙ্গে দোলে অঙ্গরাখা বর্ণ অনুপম
চাপকানে অঙ্কিত সূক্ষ্ম চীনাংশুক রেখা
শিরে শোভে পালকের চারু শিরস্ত্রাণ।
কাঁকালে দুলছে সরু শাণিত কৃপাণ।
অচিরে মনের মত বস্ত্র আভরণে
তোমাকেও সখা আমি সাজাব সুন্দর।
দেবতারও স্বপ্নের অতীত
চলনে বলনে পাবে হেন স্বাধীনতা—
বেঁচে থাকা কারে বলে
আপনি অন্তর তলে শোণিতে শিরায়
শিহরি শিহরি সখা করবে অনুভব।

ফাউস্ট : সঙ্কীর্ণ জীবনবৃন্তে যে বেদনা দেয় হানা
জেল্লাদার বস্ত্রে তাকে তাড়াতে পারি না।

বৃদ্ধ আমি যৌবনক্রীড়ায় মন অনুগত নহে
যুবা আমি বাসনার তীব্র শিখা অনুক্ষণ দহে
জগত প্রপঞ্চ দেবে কোন্ বস্তু সুখ উপহার
পরম ত্যাগের বাণী হে মানুষ
এঁকে রাখ হৃদয়-ফলকে
ছেড়ে যেতে বল সব মায়ার বন্ধন।
জেনে রেখ এই তো সত্যের সার
স্বপ্নের আবেশে জাগে যেই মুগ্ধ সুর
প্রহরে প্রহরে কর্ণে করে গুঞ্জরণ
সেই অবিনাশী শক্তি উজ্জ্বল আভায়
মূর্ত হবে একদিন জানি আমি জানি।
প্রতিটি উষায় আমি বেদনা বিদীর্ণ প্রাণে
দৃষ্টি মেলে দেখি। জেগেছে উদয়াচলে
কনক শিরস্ক পরে রাঙা দিবাকর
ছুটে চলে দৃপ্তগতি অগ্নিকাণ্ড রথে।
অশ্রুরাশি দু নয়নে ঝর ঝর ঝরে...
আকাঙ্ক্ষা তরুর বৃন্তে। সৌরস্নেহ
ফোটাবে না একটিও মানসমুকুল।
হৃদয়ের হিল্লোলিত আনন্দবল্লরী,
মরমি হাওয়ার ডাকে গ্রীবা তুলে
জাগাবে না এই বক্ষে পুলক নাচন।
জটিল সংশয় ভরা পরাণ কারায়
বন্দি হয়ে সারা দিনমান
প্রাণের গভীর সাধ করে উঠে নিস্ফল রোদন।
পেলব যামিনী নাচে ধরার পালঙ্কে
নীরবে বিছিয়ে দেয় কোমল আসন
আমার উদগ্রীব চিত্ত স্বর্গদ্বারে
করুণ মিনতি ভরে শান্তিবারি চায়
তবু আমি পড়ে থাকি ধরার ধূলায়।
বিশ্রাম নিলয়ে দেয় বুনোস্বপ্ন হানা
অন্তরের অন্তঃস্থলে বিরাজেন যেই ভগবান
তাঁর শুভাশীষ ধারা ছিন্ন করে নাস্তির বন্ধন।
আমার ইচ্ছার পথে কে দিয়েছে বাঁধ
বস্তুপুঞ্জ নির্বিকার মানে না শাসন।
জীবনের ক্লান্তিকর বেদনার ভার
প্রতি পলে পলে দিয়েছে এমন দীক্ষা
যেন আমি মৃত্যুবর চাই
যেন আমি ঘৃণা করি প্রিয়তম বিশুদ্ধ আলোক।

মেফিস্টো : তথাপি মরণ নয় দুয়ারে অতিথি।

ফাউস্ট : সুখী বটে সেই জন, রক্তে ভেজা জয়মাল্যখানি
বীরকণ্ঠে মহানন্দে করেছে ধারণ;
কিংবা সেই উর্ধ্ববাহু নৃত্যরত প্রেমিক সুন্দর
বাঞ্ছিতার যুগ্মভুজে করেছে প্রয়াণ;
যদি সেই বৈজয়ন্তী শক্তির লহরী
আপন স্বরূপে আহা উঠত শিহরি
তাই অতল রাত্রির তলে অনন্ত প্রয়াসে
চেতনা তন্মাত্র রাখি নীরব ধেয়ানে।

মেফিস্টো : রজনীর মধ্যযামে
যখন করনি পান কাঙ্ক্ষিত গরল
বয়ে গেছে সে সুযোগ।

ফাউস্ট : সবকিছু জানার তিয়াস
গুপ্তচর বৃত্তি করে মিটেছে তোমার?

মেফিস্টো : সবজান্তা নই আমি
যদিও সতত রাখি অনেক সংবাদ।

ফাউস্ট : যন্ত্রণাবিদীর্ণ এই দীর্ণ মর্মতলে
জাগে যদি মধুমাখা হার্দ্য প্রতিধ্বনি
কান্তি ধরে ভাসে যদি শৈশব আমার
সঘন আনন্দভরা জীবনের প্রথম প্রত্যুষ,
তবে, সেইসব দেবতাকে দেব আমি তীব্র অভিশাপ
যাঁরা প্রাণের কাণ্ডারি সেজে
চেতনা আবৃত রাখে কুহক বসনে
সংকীর্ণ গুহার মধ্যে প্রাণস্পন্দহীন
অহর্নিশ মিথ্যাময় স্তুতির অধীন।
স্বর্গমুখী আকাঙ্ক্ষাকে অভিশপ্ত করি
সমস্ত প্রাণের অগ্নি এক লক্ষ্যে রাখে উজ্জীবিত।
অভিশপ্ত হোক
কল্পনা রঙিন নেত্রে ভাসমান দোদুল মূরতি
ইন্দ্রিয় বিকল করে ঘন সম্মোহনে।
কাল দংষ্ট্রারেখা নিঃশেষে বিনাশ করে
কীর্তির গরিমা, অভিশাপ নামুক সে
প্রতারক দীপ্তিভরা সম্মানের 'পর।
জায়া পুত্র বন্ধু কিংবা স্থাবর সম্পদ
যা কিছু নিশ্চিন্ত করে অভিশপ্ত হোক,
অভিশাপ বজ্রসম মুহূর্তে নামুক
গর্বান্ধ মস্তকে তার

আলস্য পর্যঙ্কে কাল যে কাটায়
ধন-দেবতারে বাঁধে আপন ভাঁড়ারে।
অভিশপ্ত হোক মদির আঘ্রাণ ভরা দ্রাক্ষারিষ্ট সুরা
প্রেমের মধুর লগ্ন অভিশপ্ত হোক
অভিশপ্ত হোক আশা, চিত্ততলে গুঞ্জরিত সোনার ভ্রমর
অভিশাপ নামুক সে বিশ্বাসের পর
আর তার সহযোগী ধৈর্যের ওপর।

অদৃশ্য
প্রেতাত্মাদের গীতি : হতাশা বিষাদ ঝরিয়ে দিয়েছ
সুন্দরতর রম্য ভুবন
রাঙা কুয়াশা জেগেছে আকাশে
হাওয়ার নেকাব খুলেছে যখন।
করদ্বয়ে তুমি করেছ ধারণ
থরথর কাঁপা শক্তি লহরি
প্রেতকুলে কেউ জাগেনি এমন
তোমার মতন শিহরি শিহরি।
গরজে গরজে অপদেবতারা
সুন্দরে হানে বিনাশ বাণ
শূন্যলোকে বহি কাটা গোধূলিরে
অন্তরে কাঁদে বিরস গান।
ধরণীর শিশু বিক্রমে বীর
জন্ম প্রসাদে পাওনি যারে
সঞ্জীবনী ধারা নেচে নেচে সারা
তোমার তরল শোণিত ধারে।
উত্থিত হও আপনার বলে
বানাও এমন আনন্দ নিলয়
পাখির মতোন আত্মা যেখানে
সুখের আবেশে বাসা বেঁধে রয়।
এমন বাসর সাজাও যতনে
প্রাণের মাধুরী ঝলমল করে
উত্থিত হও নতুন জীবনে
নব গান গাও নব জন্ম বরে।

মেফিস্টো : এইসব রাজ্যপাট
আর এই পূর্ত ক্ষুদে চতুরঙ্গ সেনা
সমস্ত আমার।
শোন তারা দুলকি চালে
হাওয়ার তালে

কথা বলে
কিসের কথা
আনন্দ ও কর্মধারার
ছুরির মত তীক্ষ্ণ ধারাল
অন্বেষণ ও অন্বেষার।
এখন বেরিয়ে এস নির্জনতা থেকে
নতুন পৃথিবী পথে যাত্রা কর শুরু
যেই স্থানে ইন্দ্রিয়চেতনা, অপূর্ব আভায়
ফুটেছে পুষ্পের মত স্নিগ্ধ কান্তিমান,
তোমাকে ডেকেছে সবে উল্লোল উল্লাসে।
দুরন্ত গৃধিনী সম যেই দুঃখ চিত্ততলে করে সংক্রমণ
হেঁচকা টানে ছুঁড়ে দাও পচা নর্দমায়।
এরকম নোংরা সাথী যে গোপনে রাখে
তার কোথা স্বস্তি বল
তারে কি মানুষ বলে মনুষ্য সমাজে?
তবে, একথাও মিথ্যা নয়
এমন আনাড়ি জনে
জনারণ্যে ছেড়ে দিতে রাজি নই আমি।
যদ্যপি আমিও নই সর্বোত্তম জন
তথাপি তোমার কাছে কথা দিতে পারি
যদি কর কথায় প্রত্যয়।
সঙ্গে যাব, সাথী হব, নির্দ্বিধায় সাধব সন্তোষ।
বাক্যে আর কাজ নেই
তোমার আকাঙ্ক্ষা আমি করব পূরণ
অবশ্য প্রমাণ পাবে
যুগপৎ হব আমি বন্ধু ক্রীতদাস।

ফাউস্ট : বিনিময়ে কি আমাকে দিতে হবে।

মেফিস্টো : সময় জানিয়ে দেবে, কেন তাড়াহুড়া।

ফাউস্ট : না না সে কখনো নয়
চতুর শয়তান বড় আত্মপরায়ণ
সহায় যে হয় তার স্বর্গেরে হারায়
এখন চুক্তির শর্ত ব্যক্ত কর সুস্পষ্ট ভাষায়
গৃহে রাখা ঠিক নয়
ভয়ঙ্কর এমন কিঙ্কর।

মেফিস্টো : আজ্ঞাবাহী ভৃত্য হব প্রথমে তোমার
প্রাণপণে করে যাব সন্তোষ বিধান
তারপর দিন এলে তুমিও তখন
আমার নির্দেশ বাক্য করবে পালন।

ফাউস্ট : জানতে উৎসুক নই পরের সংবাদ
পহেলা জাগাও তুমি ধ্বংসের গাজন
পুরাতন এ পৃথিবী খণ্ড খণ্ড লণ্ডভণ্ড হোক
যাক রসাতলে।
দ্রুত হস্তে টেনে দাও কৃষ্ণ যবনিকা
তরল আনন্দ স্রোতে চরের মতোন
মূর্ত হোক সুকুমার সুন্দর ধরণী
আমার আনন্দ সুখ আকাঙ্ক্ষা কূজন
পৃথিবীর ধূলিতলে করে গুঞ্জরণ
প্রতিদিন সূর্য দেখে প্রাণের রোদন।
যখন গমিত হব সেই একদিন
সমস্ত হারায় যদি নিঃশেষে হারাবে
কাজ নেই ভাবনায়, যা হবার হবে।
পরকালে পরস্পর আমরা দুজন
বন্ধু হই শত্রু হই সে তর্কে দেব না কান
কোন্ ভবিষ্যতে
বস্তুপুঞ্জ আমাদের যুগল নয়নে
ধরা দেবে ঠিক কিংবা উল্টানো আকারে
আগাম সেসব ভেবে কি হবে এখন।

মেফিস্টো : জীবন পিয়াস ঠিক দিয়েছে উত্তর
এরকমই চাই, আমি তো রয়েছি খাড়া
তোমাকে তালিম দেব, নিয়ে যাব
সুকুমার শিল্পলোকে আনন্দ নগরে
বিস্মিত দৃষ্টির মুখে খুলে দেব এমন জানালা
দেখবে অপূর্ব দৃশ্য নয়ন লোভন
চর্মচক্ষে কোন নর দেখেনি এমন।

ফাউস্ট : আমাকে কি দেবে তুমি পাপিষ্ঠ শয়তান
আমি সেই মানবাত্মা
ঊর্ধ্বমুখী মহীয়ান আকাঙ্ক্ষার টানে
ছুটে যেতে স্বর্গলোকে বিহ্বল পরাণে
তোমার চাতুরি জালে পড়ে গেছি ধরা
কি আমারে দিতে পার?
তোমার প্রদত্ত অন্ন দংশাবে উদর
দিতে পার রক্তস্বর্ণ যত ইচ্ছা কর
সঞ্চয়ীর শ্রমে করে তীব্র তিরস্কার
চঞ্চল পারদ প্রায় লুকাবে নিমেষে।
দেবে তুমি যে ষোড়শী বক্ষ লগ্না করে

দৃষ্টিবাণে ভোলাবে সে ষোড়শী হৃদয়
মত্ত তুমি যে ক্রীড়ায়
তাতে জুটে ভাগ্যহীন ডুবন্ত মানুষ।
তুমি যা ধরেছ হাতে
উজ্জ্বলিত অনুপম যশের তারকা
নয়নে ধাঁধিয়ে যায় তীব্র রশ্মিরেখা
দেবতা সদৃশ স্বপ্নে পূর্ণ করে মনুষ্য-হৃদয়
কিন্তু সে কুহক মাত্র পলকে মিলায়।
শক্তি থাকে, আমাকে দেখাও তুমি সেই তরুবর
না ফলতে পুষ্প ফল অকালে শুকায়
কিংবা সেই শ্যামায়িত দোদুল বনানী
নিত্যদিনে নব নব পল্লব ফোটায়।

মেফিস্টো : শুধু এই! নিতান্ত সহজ কর্ম
অনায়াসে সে সম্পদ এনে দিতে পারি
কিন্তু আমি মনে করি সমাগত সঠিক সময়
চল হই বর্হিগত;
প্রশান্ত আনন্দ কুঞ্জে প্রেমরস করবে সেবন।

ফাউস্ট : বিলাস পালঙ্কে যদি চোখ বুঁজে ঢলে পড়ি
প্রাণের প্রার্থনা— যেন আমি সেইক্ষণে মরি
অনর্গল চাটুবাক্যে প্রাণ যদি ফিরে পায় শান্তি মনোরমা
আমার আমাকে কর প্রমোদের দাস
এবার খসাও তবে আত্মাকে আমার
মরে যেতে ইচ্ছা করি সে অনেক ভাল।

মেফিস্টো : আকাঙ্ক্ষা পূরণ হবে।

ফাউস্ট : হবে ঠিক।
উড়ন্ত প্রহরে যদি অনুরাগে বলি
ক্ষণেক নিশ্চল হয়ে দাঁড়াও সুন্দর
বিনাশ শৃঙ্খলে কর আমায় বন্ধন
সুন্দরের আলিঙ্গনে
মেনে নেব সুন্দর মরণ।
অবিরাম ঘণ্টারোল আমার স্মরণে আনে
শান্ত স্নিগ্ধ ধ্বনি
বলে যায় সর্বক্ষণ ব্যথিত নিনাদে
তোমার দায়িত্ব শেষ মুক্ত তুমি সম্পূর্ণ স্বাধীন।
সময় গড়িয়ে যাবে
যুগ বেয়ে যুগান্তরে কালের শকটে
শুধু আমার অস্তিত্ব ঘিরে
তুঙ্গ হবে গাঢ় অন্ধকার।

মেফিস্টো : সাবধান হয়ে কও কথা
মনে রেখ, সমস্ত স্মরণে রবে
ফাউস্ট : মর্মগত অভিপ্রায় সঠিক ধরেছ
আমার প্রস্তাব সত্য
যা বলি পালন করি অক্ষরে অক্ষরে
যখন দাসত্ব নেব কি ফল বিচারে।
যে হও, সে হও
তুমি কিংবা অন্য কোন জন
থোড়াই পরোয়া করি কিবা আসে যায়।
মেফিস্টো : অদ্য যামিনী বেলা অপেক্ষায় রব
তাবত পণ্ডিতকুল বাৎসরিক ভোজে
যখন মিলিত হবে বিদ্যানিকেতনে।
জীবন অথবা প্রাঞ্জল বলি
মরণ ঠেকেছে ঘোর জটিল সংকটে
সঙ্গে নেব শুধু এই দুই ছত্র লেখা
একটানে দেবে তুমি আপন স্বাক্ষর।
ফাউস্ট : চাও তুমি সুলিখিত গাঢ় অঙ্গীকার?
কখনো কি শোন নাই বিদ্যাবন্ত জন
যত্নে রাখে সর্বক্ষণ বাক্যের সম্মান।
নিজমুখে বলেছি যখন প্রাণে গেছে গেঁথে
আজীবন মর্মতলে রাখব স্মরণ।
প্রবল বন্যার বেগ যদি রোধে,
ধরণী আপনি ভেঙ্গে খণ্ড খণ্ড হয়
আমাকে বাঁধবে তুমি চুক্তির শৃঙ্খলে।
সম্মানের সিংহাসন যে হৃদয়ে রাজে
স্বপ্ন ও নিয়ম রাখে আপন গরজে
না থাকুক মোহর স্বাক্ষর
তথাপি দলিল ধরে অতিশয় জোর।
অতীব সাহসী জনে কাবু করে রাখে
সূচাগ্র লেখনী মুখে জন্ম নিয়ে শব্দ মরে যায়
মেষচর্ম আর মোম দাপট চালায়।
অভিপ্রায় বল কালোমুখো লাঞ্ছিত শয়তান
মেষচর্ম, পিতলে নির্মিত পাত, পাথুরে ফলক
নিয়ে এস খুশিমত,
যদি চাও লিখে দেব খাগের কলমে
কিংবা নেব সুতীক্ষ্ণ শলাকা;
মনে যদি ধরে, নেব আমি ভাস্করের নিপুণ বাটালি
বেছে নাও মনমতো লেখনী তোমার

মেফিস্টো : দীর্ঘ বাক্যে নেই প্রয়োজন
বৃথা গর্বে অকারণে বক্ষস্ফীত কর
একবিন্দু রক্তে লেখা যে কোন কাগজ হলে চলে।

ফাউস্ট : প্রীত যদি হও
আনন্দ অন্তরে দেব রক্তের স্বাক্ষর
অংশ নেব সে ক্রীড়ায়
আসল স্বরূপ যার গুণ্ঠনে ঢেকেছ।

মেফিস্টো : রক্ত হল সেরা গুণে গুণান্বিত
অতীব দুর্লভ রস।

ফাউস্ট : আশঙ্কার নেই হেতু
অঙ্গীকার বদ্ধ র'ব আমি।
যেহেতু সমস্ত শক্তি কেন্দ্রীভূত করেছি শপথে
প্রযত্ন প্রয়াস ঢেলে তার শর্ত করব পালন।
সন্তুষ্টির আত্মমগ্ন গহন কোটরে বসে
বাসনা করেছি মহৎ লক্ষ্যের পথে হব ধাবমান;
বস্তুত বুঝেছি আমারও পঙ্কের জন্ম তোমার সমান।
বলবন্ত আত্মা ঢেলেছে বিদ্রুপ রাশি হতাশার
নিসর্গ করেছে রুদ্ধ পবিত্র দুয়ার।
আমার চিন্তার সূত্র ছিন্ন হল,
দীর্ঘদিন হতাশা জর্জর চিত্তে করেছি কামনা
জলাঞ্জলি দেব সব আহরিত জ্ঞান;
পেলব ইন্দ্রিয় সুখে মহানন্দে মুক্তি দেব আমি
দাউ দাউ বহ্নিমান পরাণ পিয়াস।
মূর্ত কর রহস্যের আশ্চর্য নগর
উন্মুক্ত দৃষ্টির মুখে জন্ম নিক ইন্দ্রজাল কান্তি মনোহর
চল সজোরে নিক্ষেপ করি যুগল শরীর
সময় তরঙ্গ শিরে নেচে নেচে ছুটে
ঘটনা সংঘাতে যুঝি মর্মান্তিক সুখে।
বেদনার দাহ আন কিংবা আন আনন্দ প্লাবন
বিজয়ীর সুধা দাও;
অথবা জ্বালাও রোষে ব্যর্থতার তীব্র হুতাশন
চলিষ্ণু মানুষ চায় মর্মরিত অশান্ত আবেগ।

মেফিস্টো : সম্পদ তোমার হবে
শঙ্কা ভয় দূরে ফেলে চঞ্চল পাখায় করে ভর
উড়ে চল তরঙ্গিত আনন্দের লোকে
স্পর্শ কর, শুঁকে দেখ
যা কিছু সকাশে আসে মাংসল সুন্দর।

ছেনে ছুঁয়ে সর্ববস্তু বাঞ্ছিত পুলক রসে কর সন্তরণ।
ঝাঁপ দিয়ে ডুবে যাও
ক্ষিপ্র হাতে ছিঁপে ফেল
সমস্ত দ্বিধার রেখা সন্দেহ কণ্টক।

ফাউস্ট : প্রবিষ্ট কি হয় নাই শ্রবণে তোমার
আনন্দ কাঙ্ক্ষিত নয়, আমি চাই যন্ত্রণার তীক্ষ্ণ হলাহল
চাই প্রেমের প্রখর হিংসা
বেদনার চড়া দামে কেনা
সদ্য স্তান কারামুক্ত হৃদয় আমার
প্রাক্তন দুঃখেতে আজো করে সন্তরণ
মানুষের সব ভ্রান্তি সব বিফলতা
ঘুরে ঘুরে এই প্রাণে শুধু কয় কথা;
কৃষ্ণকান্তি দুঃখ পুষ্প অন্তরে ফুটেছে।
যত উচ্চে উঠেছে মানুষ
আর ডুবেছে সুপ্তির শেষে গভীর অতলে
বুকে আমি তুলে নেব অনুচ্চার স্বরে।
অনুরাগে প্রাণে প্রাণে বেঁধে যাব রাখি
হৃদয়ে বাঁশির মত ভরে নেব মানুষের আনন্দ বিষাদ
যদি গাঙ্গে ডুবে তরী।
আমিও সবার সাথে করব রোদন।

মেফিস্টো : আমার উচিত বাক্য কর অবধান
নভঃলোক যাত্রীদল বছরে বছরে
উপভোগ্য এই বস্তু চিবিয়ে দেখেছে
উদরে যায়নি কারো জীবিত কি মৃত
ভীষণ কঠিন রুক্ষ দন্ত গেছে ঝরে।
একমাত্র ঈশ্বরে সম্ভবে যে চিরন্তন একত্বের দিব্য অনুভূতি
নয়ন সম্পাতে যার ভেসে ওঠে বিশ্বচরাচর
ঘন অন্ধকারে আমাদের পরিক্রমা বঙ্কিম শঙ্কিল।
ভাঙা ভাঙা দিনগুলো
মধ্যে বয় তামস রজনী।

ফাউস্ট : তথাপি সংকল্পবদ্ধ হৃদয় আমার।

মেফিস্টো : বলেছ সঠিক বটে,
আমার সংশয় কোথা ব্যক্ত করি
সময় সংক্ষিপ্ত অতি দীর্ঘকাল প্রলম্বিত শিল্প পরমায়ু।
তোমাকে জানিয়ে রাখি
পাছে ভাব আমি অতি খারাপ চালক।
কোন এক কবিবরে সঙ্গীরূপে কর নির্বাচন

প্রদীপ্ত কল্পনা যার চিন্তাকে উদার লোকে মুক্তি দেবে
নানা শৃঙ্খলার জ্ঞান তুলে এনে
মহত্তর গুণরাশি মন্থনের শেষে
পরাবে তোমার শিরে গৌরব মুকুট;
সিংহের দরজা বক্ষ, হরিণ চপল গতি
ঢেলে দেবে সহ্যগুণ বিভূষিত উত্তর দেশীয় প্রাণে
ইটালির আগুনের সংবেদন শিখা।
সর্বাগ্রে তোমাকে যে দেবে গুপ্ত পাঠ—
কি করে মিশাতে হয় একপাত্রে মহত্ত্ব ছলনা
প্রেমোন্মাদ যুবাসম, কি করে প্রণয়ে মজে সুকল্পিতভাবে
সেরকম একজন গুণী যদি পাই
এক্ষুণি নিযুক্ত করি তোমার সেবায়
নাম দেব ক্ষুদ্রাকার সূক্ষ্মবিশ্বলোক।

ফাউস্ট : কি হবে আমার তবে
মনে কর আমি সেই লোক
গ্রহদোষে যার হাতের নাগাল থেকে
মানবীয় মহিমার মুকুট পালায়।
শরীরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে পরমা শান্তির নামে
যে আর্তি ঘনায়
তাকে আমি অহর্নিশ ব্যঙ্গ করে যাই।

মেফিস্টো : যা কিছু কর না মনে তুমি শুধু তুমি রবে
ইচ্ছা হলে বাঁধো শিরে কৃত্রিম কেশের চূড়া কুঞ্চিত সুন্দর
বিদ্যার সোপান বেয়ে যত উর্ধ্বে ওঠ
মনে ভাব মরি! মরি! হয়েছি ডাঙর
তুমি কিন্তু তুমি রবে আদি অকৃত্রিম।

ফাউস্ট : মানুষের অন্তর সম্পদ
আপন অন্তরে নিতে যে প্রখর প্রয়াস করেছি
পণ্ডশ্রম বৃথা সবই অনুভব করি।
জেনে গেছি কত ক্ষুদ্র ক্ষমতা আমার
সঞ্জীবনী শক্তিধারা শিহরে শিহরে
নবীন আবেগ ভরে জন্মে না অন্তরে।
অন্তরে বিশাল মরু ধু ধু করে অগ্নিবালু রাশি
এতটুকু সমুন্নত করেনি আমাকে
কি করে দাঁড়াব বল
করুণা সঘন ঐ শাশ্বতের ডাকে।

মেফিস্টো : প্রাজ্ঞ সখা,
তোমার নজর খাটো নিতান্ত মামুলি
কানাকড়ি মূল্যহীন বিষয় বিচার

সমস্ত মানুষ ভাবে তোমার মতন
আমি কিন্তু সাধ্য মত থাকি সচেতন।
যৌবনবৃন্তের মধু ফুরাবার আগে
আনন্দে চয়ন সব করি অনুরাগে।
দুই হাত শির দাঁড়া এবং মস্তক
একযোগে সবকিছু জাগাও ইস্তক।
পদযুগ পৃষ্ঠদেশ বেবাক ইন্দ্রিয়গ্রাম দখলে তোমার
তারা ছন্দে ছন্দে জন্ম দেয় আনন্দ অপার
তুমি ছাড়া সে অমৃতে কার অধিকার?
আমার আয়ত্বে আছে তেজীয়ান ছয় তুরঙ্গম
গতির ঐশ্বর্যে আমি ধনবান নই?
চব্বিশ পায়ের বেগে দ্রুত ধাবমান
ছুটে চলি তীব্র গতি যেন মনোরথ।
ধ্যানের জীর্ণতা ছেড়ে প্রখর আলোকে
দাঁড়াও হে বন্ধুবর প্রফুল্লিত চোখে।
ঐ শোন কান্তিময়ী পৃথিবী ডাকিছে
এমন সুন্দর দিনে ঘরে থাকা মিছে
তোমরা পণ্ডিতজন স্বভাবে বলদ
ঘুরে ঘুরে কর সেই পুরনো গলদ।
উষর ভূমিতে কর তৃণের সন্ধান
অথচ দেখ না চোখে
সম্মুখে বিরাজ করে ফুলভরা ফলভরা সবুজ প্রান্তর।

ফাউস্ট : শুভ সূচনা তার কি প্রকারে করি!

মেফিস্টো : চলে এস, মৃতবৎসা গাভীসম জ্ঞানের
কঙ্কাল, কি ফল আঁকড়ে থেকে,
দিনমান গুরুগিরি নীরস বিরস
তার চেয়ে উত্তেজক কর্ম আছে ঢের।
শব্দশাস্ত্র ব্যাকরণে দক্ষতা অপার
পড়শি পাঞ্চের হাতে দাও সেই ভার।
প্রতিদিন যেই সন্তাপের বাণী
যা কিছু শেখাও তুমি প্রাণান্ত প্রয়াসে
বিচালির মত নয় কর্কশ বিস্বাদ?
বিদ্যালয়ে ছাত্রদলে সেরা লব্ধজ্ঞান
পেরেছ কখনো দিতে খুলে পঞ্চপ্রাণে?
গৃহদ্বারে দ্রুতবাজে চরণের ধ্বনি
বুঝিবা বিদ্যার্থী এক কণ্ঠস্বর শুনি।

ফাউস্ট : বন্ধ রবে দ্বার
তাকে আজ ফিরে যেতে হবে।

মেফিস্টো : অনেকক্ষণ প্রতীক্ষায় করেছে যাপন
এভাবে ফেরানো তারে সমীচীন নয়।
দাও দেখি টুপি আর গায়ের চাপকান
পত্রপাঠ করে আসি সহসা বিদায়,
সানন্দে কবুল বল— নেই কোনো দায়।
বড়জোর প্রয়োজন দু'দণ্ড সময়।
এরই মধ্যে তড়িঘড়ি কর সমাপন
ভ্রমণের নানাবিধ সুষ্ঠু আয়োজন।

মেফিস্টো : [ফাউস্টের দীর্ঘ চাপকান পরিহিত]
জ্ঞান আর যুক্তির শৃঙ্খলা,
উর্ধ্বতর শক্তিরাশি যা কিছু মানুষে করে নির্মল সুন্দর
হোক তব নিত্যদিন ঘৃণার বিষয়।
মিথ্যার সম্রাট নিজে নানারঙ্গ যাদুর চমকে
তোমার দৃষ্টির মুখে মূর্ত করে মায়ার জগৎ;
নিয়তি আপনি যার হৃদে অগ্নিকণা
জ্বালিয়েছে মহাসুখে, সে এখন আজ্ঞাধীন সেবক আমার।
মদমত্ত ক্ষিপ্রগতি তীব্র সংবেদন
ভয় ডর তুচ্ছ করে ঘূর্ণির মতোন
ছুটেছে দুর্বার বেগে
খসে পড়ে সমস্ত পথের বাধা বিপদ আপদ।
সমগ্র পৃথিবী আর নিসর্গ নিয়ম
ছেনেছুঁয়ে তুলে আনে আনন্দ সপ্রাণ।
ধারণ করব তাকে, তরঙ্গিত পথে, নাচিয়ে নাচিয়ে
শত শত তুচ্ছ কর্মে বাঁশরি বাজিয়ে
প্রাকৃত জীবন স্রোতে মুক্তি দেব তাকে।
যার ঘাড়ে কৃপাভরে করবে আরোহণ
টুঁটি চেপে বাক্‌শক্তি করবে হরণ
তথাপি পাবে না মুক্তি কণ্ঠলগ্ন হয়ে রবে তীব্র আকর্ষণে
দৃষ্টিতে ভাসবে তার যেই খাদ্যরাশি
অতৃপ্ত ক্ষুধার অগ্নি জ্বালবে দ্বিগুণ।
স্থান থেকে স্থানান্তরে করবে সে শান্তির সন্ধান
জ্বলন্ত হতাশা তার দগ্ধাবে পরাণ
শয়তানের আজ্ঞাবাহী হোক বা না হোক
অচিরে ধ্বংসের দেশে করবে গমন।
[একজন বিদ্যার্থীর প্রবেশ]

বিদার্থী : মহাত্মন, একটু বিলম্ব হল,
সোজাসুজি তাই এসে গেছি।
তরুণ বিদ্যার্থী আমি মানস করেছি
দেশে দেশে গেছে যাঁর শুভ্র যশোরাশি;
তারি পদতলে বসে করব চয়ন
তরুণ প্রাণের বাঞ্ছা বিদ্যা মহাধন।

মেফিস্টো : তোমার সৌজন্যবাক্য ততধিক শোভন প্রকাশে
প্রীত বড়, আমিও সবার মত হই একজন;
অধিক বৈশিষ্ট্য কিছু রাখি না তেমন
আমার মতন আরো আছে বহুজন
হয়ত তাদেরও দ্বারে করেছ গমন।

বিদ্যার্থী : আমি চাই সৎযুক্তি, তত্ত্ব, উপদেশ
শ্রীচরণে সনির্বন্ধ অনুরোধ রাখি
অন্তরে সঞ্চিত নিষ্ঠা আর আছে প্রশান্ত সাহস
গুরুর দক্ষিণা দিতে কার্পণ্য না মানি।
জননী অনেক করে করল বারণ
আমি যেন দূর দেশে না করি গমন।
এখন হৃদয় তলে জন্ম নিল আশা
জ্ঞানালোকে ধন্য হব জেগেছে ভরসা।

ফেফিস্টো : যথার্থ বলেছ বটে
জ্ঞানের সোপান প্রান্তে উপনীত তুমি।

বিদ্যার্থী : চৌদিকে প্রাচীরঢাকা বিদ্যানিকেতনে
পুঁথিগন্ধি শ্রেণীকক্ষ দিবসে আঁধার
কিছুতে মজে না মন, রুচি প্রপীড়িত
জনাকীর্ণ ক্ষুদ্র কক্ষ, সর্বক্ষণ লেগে ঠেলাঠেলি
গাছ নেই, লতা নেই, কোন শ্যামল প্রান্তর
গম্ভীর কক্ষের রূপে
শ্রুতি যায় অন্তর্ধানে
পলকে হারিয়ে ফেলি দৃষ্টির বিভূতি।

মেফিস্টো : অভ্যাসের প্রশ্ন সেটা
সদ্যোজাত শিশুও প্রথম
মাতৃস্তনে মুখ নিতে বিমুখ ভীষণ
কিন্তু অচিরে পুলক ভরে করে বটে সানন্দ চোষণ
অবাধে শৈশব তৃষ্ণা করে নিবারণ।
তোমারও এমন হবে দিনে দিনে অবাধ অগাধ
জ্ঞানের কল্যাণ-স্তনে মুখ রেখে খুঁজে পাবে স্বাদ।

বিদ্যার্থী : কি আনন্দ, আমার মস্তক তার বুকেতে ঠেকাব
তার দেখা পাব কই

মহাত্মন, সেই পথে অতি দ্রুত গতি
আমাকে চালিয়ে নিন করি এ মিনতি।

মেফিস্টো : তার পূর্বে জেনে নিতে চাই!
কোন শাস্ত্র শিক্ষা হেতু করেছ মানস?

বিদ্যার্থী : আমার মনের বাঞ্ছা শিক্ষা করি
নিসর্গ নিয়মরাজি কি প্রকারে ক্রীড়া করে বিশ্বচরাচরে
মনে সাধ, সন্তোষ মিটিয়ে করি
প্রতি বস্তু বিজ্ঞানের উৎসের সন্ধান।

মেফিস্টো : সাধু বাঞ্ছা সংকল্প সুন্দর
সর্বদা সজাগ থাক পাছে মন অন্যদিকে যায়।

বিদ্যার্থী : ঢেলে দেব মনপ্রাণ সমস্ত শরীর
তবু বলি সুন্দর নিদাঘ দিনে, স্বর্ণরৌদ্র করে
ভ্রমণে আনন্দ পাই বর্ণনা অতীত
সুতরাং চেয়ে নেব সেই অনুমতি।

মেফিস্টো : সময়ের অপচয় নয়
সময় চপল গতি হরিণীর মত বেগে ধায়
পদ্ধতি শেখায় তবু কি করে সময়
আনন্দ বন্ধনে আসে স্থির সাধনায়।
প্রথমে তোমাকে এই উপদেশ করি
ডুবে যাবে পুরোপুরি পাঠ্য তালিকায়।
কঠিন নিয়ম আনবে শাসনে ধীরে
বাতাসের মত সব চঞ্চল আবেগ,
মনোলোকে গিঠে গিঠে পড়বে বন্ধনী
নগ্ন পায়ে আঁটোসাটো পাদুকা যেমন
খানাখন্দ তুচ্ছ করে হাঁটতে শেখায়।
তেমনি নিয়মরাজি চিন্তার শরীরে
বুলিয়ে কল্যাণ হস্ত শেখাবে নিবিড়
আলেয়ার মত দিশাহারা
লক্ষ্যহীন চিন্তা পাবে ঋজু তীব্র গতি।
সাধনায় জেনে যাবে পানাহার
কিংবা আরো কর্ম নানাবিধ
নিত্যঘটে প্রতিদিন স্বতঃস্ফূর্ততায়
সেগুলো সঠিক নয় স্বয়ম্ভু স্বাধীন
বরং সকলে একই নিয়ম অধীন।
যাকে বলে চিন্তাসূত্র তোমাকে শেখাই
সে এক তাঁতের যন্ত্র, অহরহ সামনে পিছে
দুর্নিবার গতিস্রোতে চলিছে চলিছে

অপূর্ব ঘূর্ণন যন্ত্র
অদৃশ্য সুতায় বাঁধা মাকুর জীবন
এক ঘায়ে লক্ষ ফোঁড় চলছে জীবন।
গূঢ় প্রশ্ন উত্থাপন করে দার্শনিক
যুক্তি আদি কূটতর্কে দেখান প্রমাণ
সূচনা ও সমাপ্তিতে মিল বিদ্যমান।
প্রথম দ্বিতীয় যদি আয়ত্তে তোমার
তৃতীয় চতুর্থ এসে আপনি হাজির
প্রথম দ্বিতীয় যদি অবগত নও
তৃতীয় চতুর্থ সূত্র খুঁজে নাহি পাও।
বিদ্যার্থীর বিনন্দিত এই সে পদ্ধতি
সকলে নিবিষ্ট মনে করেন ধারণ
যেমন মাকুতে তাঁতি ঢেলে দেয় প্রাণ
যদ্যপি নিষ্ঠায় নহে তাঁতির সমান।
জীবন্ত বস্তুতে যদি জন্মে যায় কঠিন সংশয়
আত্মার ধারণা তবে কর পরিহার।
পেয়ে যাবে অন্তর্ভুক্ত নানা উপাদান
তারপর একমাত্র বাকি থাকে প্রাণ
শুরুতে স্বেচ্ছায় তুমি করেছ বর্জন।
আত্মউৎপীড়ক এই মধুময় জ্ঞান
পণ্ডিতজনের ভাষ্যে নাম ধরে শাস্ত্র রসায়ন।

বিদ্যার্থী : মার্জনা করুন, কিছুই বুঝিনি আমি।

মেফিস্টো : প্রয়াসে ব্যাপৃত থাক উৎকর্ষ সাধনে
অতি শীঘ্র দেব পাঠ
অর্থীর বিনয়সহ করবে মনন
গুছিয়ে সাজানো আর আলাদা করণ

বিদ্যার্থী আপনার বাক্য শুনে
মস্তকে প্রবল বেগে চলছে চূর্ণন।
ঘটাঘট ঝটাঝট যাঁতার ঘূর্ণন।

মেফিস্টো : তারপরে বলি আমি কর অবধান
অধিবিদ্যা অপরূপ বিদঘুটে বিজ্ঞান
নেড়েচেড়ে মনে হবে ধারণা উদয়
মানুষের মগজের যোগ্য ওটা নয়।
যোগ্যাযোগ্য সেই তর্কে যায় কবে কেটা
ফুটালে গম্ভীর শব্দ চুকে যায় ল্যাঠা।
অর্ধবর্ষ যাবে বৎস পদ্ধতি শেখায়
প্রতিদিনে পঞ্চবার বক্তৃতা শোনায়

ব্যস্ত রবে নিয়মিত
শিক্ষকের মুখের কথন
টুকে নেবে অনুরাগে শ্রদ্ধা নিবন্ধন।
সময় হলেই তুমি নিজে টের পাবে
শিক্ষক-গ্রন্থের ভেদ লুপ্ত হয়ে যাবে
তাঁর বাক্য লিখে নেবে দাড়ি কমাসহ
প্রতিছত্র বেদবাক্য অন্তরে জানহ।

বিদ্যার্থী : মহাত্মন, বুঝেছি সঠিক মর্ম, বিদগ্ধ ভাষণ
অধিকন্তু উচ্চারণ নেই প্রয়োজন
শোনামাত্র যদি বাঁধি কাগজে-কলমে
রাত্রে পড়তে পারি প্রাণের আরামে।

মেফিস্টো : শাস্ত্র নির্বাচন তবে কর এইবার।

বিদ্যার্থী : আইনশাস্ত্র অধ্যয়নে দ্বিধান্বিত মন।

মেফিস্টো : তোমাকে দেই না দোষ,
এই শাস্ত্রে ভয়ানক অরুচি আমারো
বিধি ও বিধানগুলো যা কিছু পেয়েছি
যেন পূর্বপুরুষের শরীরে শোণিতে
বাহিত জীবাণুকণা
বংশ বংশ ধরে বাড়ে চক্রবৃদ্ধি হারে
দেশ থেকে দেশান্তরে অখণ্ড প্রতাপ।
অবস্তুও পেয়ে যায় বস্তুর আকার
করুণা ভাঁড়ামি হয় আইনের পীড়নে।
আইনবেত্তা করে যেই বাক্য উচ্চারণ
তারপরে উত্তর পুরুষ ঢালে প্রাণের সন্তাপ।
জন্মসূত্রে নিসর্গ দিয়েছে লিখে যেই অধিকার
স্বভাবে বিকাশ পায় যেই সূক্ষ্ম বিধি
চিন্তাতে দেয় না স্থান ভদ্র জনগণে।

বিদ্যার্থী : আপনার বাক্য শুনে
দ্বিগুণ ঘৃণার বেগ জেগেছে অন্তরে।
ধন্য ধন্য সেই বিদ্যার্থীজন
চরণ কমল তলে যে পেয়েছে স্থান।
দেই যদি অনুরাগে ধর্মতত্ত্বে মন
বলুন কেমন হবে সাধনভজন?

মেফিস্টো : বৎস, আমার কাঙ্ক্ষিত নয় ভ্রান্ত পথে যাও
এই শাস্ত্রে পাঠ নিয়ে কেউ
রসাতলে ডুবে যাওয়া ঠেকাতে পারেনি।
উন্মত্ত আগ্রহ তলে মিশে থাকে

সঙ্গোপন মারাত্মক বিষের আরক।
এ জীবনে যার কোন নেই নিরাময়।
দিনভর লেগে থাক গুরুর পেছনে
উচ্চারিত প্রতি শব্দে বিনত বচনে
গম্ভীর শপথবাক্য বল অহরহ
মোদ্দাকথা শব্দে রাখ অটল বিশ্বাস
আপনারে বেঁধে রাখা শব্দের শাসনে
পরিণামে একদিন
নিশ্চিত্তে মন্দির শীর্ষে হবে উড্ডীন।

বিদ্যার্থী : প্রতিটি শব্দের থাকে সঙ্গোপন মানে।

মেফিস্টো : সত্য বটে, কিন্তু তাতে
ঘাপলা কোথায়?
শব্দ যদি স্তব্ধ হয় অর্থহীনতায়
নতুন শব্দেরা এসে শব্দকে তাড়ায়।
যদি রাখ নিয়োজিত, তারা করে তোমার লড়াই
কিংবা পূর্ণাঙ্গ পদ্ধতি এক ধরা দেবে লাস্য ও লীলায়
যদি হয় সুনিশ্চিত প্রতি শব্দক্রম
দেখা দেবে অলৌকিক সুঠাম বিশ্বাস।

বিদ্যার্থী : মহাত্মন, অনেক প্রশ্নের ভারে বিব্রত করেছি
ক্ষমা চাই, আর এক প্রশ্ন শুধু
যদি শিখি চিকিৎসা বিজ্ঞান
তাহলে কেমন হবে সবিনয়ে জ্ঞানদীপ্ত উপদেশ চাই।
বিধাতা জানেন সবই
আমার ধারণা, বড়ই জটিল শাস্ত্র
হাতে আছে অতি শীর্ণ তিনটি বছর
আলোকিত উপদেশ হতে পারে পথের সহায়।

মেফিস্টো : [একপাশে মুখ ফিরিয়ে]
পণ্ডিতের জবানিতে বিস্তর বকেছি বটে
এবার আপন কর্মে দেব তবে মন।
(প্রকাশ্যে) অতীব প্রাঞ্জল শাস্ত্র চিকিৎসা বিজ্ঞান
পৃথিবীর মানুষকে জানতে পাবে অতি অনায়াসে
সূক্ষ্মবিশ্ব স্থূলবিশ্ব জানা হলে পরে
আর সব জানা যাবে বিধির কৃপায়।
সমূহশাস্ত্রের পিছে ঘুরে মরা বৃথা
মানুষের যত সাধ্য ততটুকু জানে,
সেই তো আসল লোক
যেজন সময় বাঁধে নিজ প্রয়োজনে।

তোমার গড়নখানি অতি সুদর্শন
তার সঙ্গে প্রয়োজন কিঞ্চিৎ সাহস।
আপন বুকের তলে আস্থা যদি রাখ
লোকসমষ্টির আস্থা পাবে অনায়াসে।
শিখে নাও, কোন্ ব্যবহারে
মহিলাকে আপনার বশে আনা যায়।
ব্যথা আর দীর্ঘশ্বাস যা কিছু উতলা করে ললনা হৃদয়
চিকিৎসক জানে তার গূঢ় নিরাময়।
নারী করে উন্মোচন শয্যাপাশে আপন হৃদয়
তখন ব্যবস্থা কর মন যাহা চায়।
অজস্র প্রশংসা ভরা পত্রে যদি দেখাও প্রমাণ
তোমাকে নিশ্চিত করে সব সেরা জ্ঞান;
যে আস্থা অন্যের নিতে লেগে যাবে অনেক বছর
ধরা দেবে অবিলম্বে হাতের মুঠায়।
নাড়ীতে মধুর স্পর্শ দিতে শেখ আগে
ধীর স্থির অনল নয়নে দেখ
বঙ্কিম কোমরে রাখ ক্ষিপ্র দুই হাত
দৃঢ় কি শিথিল দেখ বসন বন্ধনী।

বিদ্যার্থী : পেয়ে গেলাম সুন্দর আভাস।

মেফিস্টো : বৎস অর্থহীন তত্ত্বের কচকচি
সোনালি জীবনবৃক্ষ শুধুই হরিৎ।

বিদ্যার্থী : মহাত্মন, স্বপ্নসম চমৎকার আপনার বাণী
দয়া করে এই দীনে দিন অনুমতি
আবার প্রণত হব চরণ কমলে

মেফিস্টো : যা কিছু আমার আছে সব গুণপনা
সমস্ত তোমার, যত খুশি নাও।

বিদ্যার্থী : চায় না ফেরত যেতে মন
সবিনয়ে নিবেদন করি
এই অনুগ্রহ করুন
আমার খাতার পৃষ্ঠে স্বাক্ষর রাখুন।

মেফিস্টো : সানন্দে লিখব আমি আপন স্বাক্ষর।
[খাতাটা গ্রহণ করল, লিখল এবং ফেরত দিল]

বিদ্যার্থী : [পাঠ করল] ঈশ্বরের মত হও, ভালমন্দ ঠিক ঠিক জান।
[তারপর ভক্তিভরে বন্ধ করে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করার পর নিষ্ক্রান্ত হল]

মেফিস্টো : [একাকী] জ্ঞাতিভ্রাতা সর্প হবে তোমার চালক
দেবতাসদৃশ জ্ঞান স্বপ্নময় হবে অন্তর্হিত।

সর্বক্ষণ আতঙ্কেতে শিহরি শিহরি
চৌচির বিদীর্ণ হবে শুদ্ধ অন্তর্লোক।

ফাউস্ট : [প্রবেশোদ্যত অবস্থায়] আমাদের যাত্রা কোন্ পথে?

মেফিস্টো : যে পথে বাসনা কর
উর্ধ্বলোকে কিংবা নিম্নে গভীর পাতালে
স্থলভূমে কিংবা সিন্ধু তরঙ্গ চূড়ায়
অনাঘ্রাত থরথর আনন্দ মেলায়
ভোগ সুখ পরিপূর্ণ চঞ্চল বিমানে
সুন্দর মুরতি ধরে যথা ইচ্ছা যেতে পার।

ফাউস্ট : পক্ককেশ বৃদ্ধ আমি ভয়ে কম্পমান
কই পাব যৌবনের প্রখর আগুন।
শঙ্কা করি ব্যর্থ হবে সমস্ত প্রয়াস
যেহেতু আলাপে আমি অপটু ভীষণ
লোকের সমক্ষে এলে বুকে জাগে ডর
কম্প দিয়ে অকারণে গায়ে আসে জ্বর।

মেফিস্টো : সখা হে, অচিরে উন্নতি হবে
ভুলে যাবে সব অনুযোগ।
হও যদি সুনিশ্চিত শুধু একবার
জীবনের কেলিকলা বিস্ময় অপার
সমস্ত তোমার মধ্যে পাবে দীপ্র প্রাণ।

ফাউস্ট : কোন্খানে ভ্রমণের করেছ মানস
অশ্বযান কোচোয়ান, নফর কোথায়?

মেফিস্টো : অঙ্গ ঢাকা উত্তরীয় যদি মেলে ধরি
আকাশ গঙ্গার পথে উড়ে যেতে পারি।
বোচকাবুচকি মালামালে কিবা প্রয়োজন
সাহসী যাত্রার পথে বিঘ্ন বলে মানি।
রয়েছে আমার হাতে অগ্নিময় সামান্য বাতাস
মাটির বাঁধন কেটে উর্ধ্বলোকে দিতে পারে গতি
উড়ে যাব দ্রুতগতি ভারহীন মুক্ত বিহঙ্গম।
বন্ধু হে, নতুন জীবনে করি ফুল্ল সম্ভাষণ।

পঞ্চম দৃশ্য

[লাইপসিকস্থ আওয়ারবাকের পানশালা]

ইয়ার দলের গানের আসর

ফ্রশ : সুরা পানে কি কারণে বিমুখ সবাই
হাস্যহীন নিরানন্দ নর্দমার মত এই পুরী
কেউ কেউ ভাব বুঝি
গোমরামুখো থাকা খুব ভাল
জাগ সবে, আবেগেতে একযোগে লাগাও আগুন।
সিক্ত তৃণসম সব নীরস বিরস।

ব্রান্ডার : তুমি এক আস্ত জানোয়ার।
ছিমছাম সাধের ইয়ার
না ফোটে মুখের বুলি না দেখি শয়তানি।

ফ্রশ : (ব্রান্ডারের মস্তকে এক পাত্র সুরা ঢেলে দিয়ে)
এক সঙ্গে দুই চিজ নাও উপহার।

ব্রান্ডার : তুমি এক আস্ত জানোয়ার।

ফ্রশ : অন্তত চেয়েছ তুমি
আমি যেন তাই হয়ে উঠি

সিবেল : ঝগাড়াঝাটি দূরে রাখ
গাও গান গলা ছেড়ে দিয়ে
হল্লা কর, কর শোরগোল,
চিৎকারে চিৎকারে কর নরক গুলজার।

আল্টামায়ার : খোদাতালা যাব কই
কানেতে লেগেছে তালা বর্বর চিৎকারে।

সিবেল : যখন ফাটায় ছাদ আমাদের গীত
টের পাই কণ্ঠে আছে সত্যিকার জোর।

ফ্রশ : বলেছ সঠিক বাত
যে বলে খারাপ তারে দু'ধাক্কা লাগাও
তাইরে নাইরে নাইরে না।

আল্টামায়ার	:	তাইরে নাইরে নাইরে না।
ফ্রম	:	বাঁশিতে উঠেছে সুর
		চল তবে গান দেই জুড়ে
		(বেঁচে আছে ভাইরে রোমের সালতানাতের লাশ)।
ব্রান্ডার	:	নোংরা গান রাজনীতি দেয় উঁকিঝুঁকি
		অতিশয় বর্বর বিষয়
		প্রার্থনায় বিধাতাকে ধন্যবাদ করি
		রোম সালতানাত নয় তোমার বিষয়।
		মনে করি সুপ্রসন্ন কপাল আমার
		যেহেতু বলে না কেউ রাষ্ট্রপতি বাদশাহ কাইজার।
		যেমন প্রতিটি দালানে আছে মৌল ভিত্তিমূল
		আমরাও পূজ্যপাদ করি নির্বাচন।
		প্রকৃত সম্মানে তাঁকে করি সম্মানিত
		প্রশংসায় তাঁর মূর্তি করি গরীয়ান
		সকলে সঠিক জান
		কোন্ গুণে বিভূষিত হবে সে পুরুষ।
ফ্রশ	:	(গান গাইতে গাইতে)
		হাওয়ার বুকে উড়াল মার
		গানের বুলবুলি
		প্রিয়ার ঝরা দীর্ঘশ্বাসে
		হৃদয় ওঠে দুলি।
সিবেল	:	প্রেমের সঙ্গীত মানা কে শোনে সে গান?
ফ্রশ	:	তথাপি পেমের গানে প্রেয়সীর ওষ্ঠ করি পান।
		(গান জুড়ে দিল)
		প্রেয়সী কপাট খোল মধু নিশি যায়
		একাকী ফটকপাশে আছি প্রতীক্ষায়।
		কাকে করে কলরব কোকিল করে ধ্বনি
		রজনি প্রভাত হল দোর দাও রমণী।
সিবেল	:	গান কর উচ্চ কণ্ঠে, প্রেমিকার কর গুণগান
		আমি একা বসে তুলি বড় বড় হাই।
		যার নামে কলজে কেটে কর খান খান
		সে রমণী শয়তানের হোক অর্ধাঙ্গিনী।
		রামছাগলের বেশে বড় চৌরাস্তায়
		যেন তারে ক্রমাগত শিঙেতে গুতায়।
		রমণী যখন বলে হে প্রিয় বিদায়

ম্যা-ম্যা আওয়াজ তুলে পলকে পালায়।
রক্ত-মাংস পরিপূর্ণ যুবকের পথে
ছুঁড়ে দাও এ রকম স্বৈরিণী রমণী।
আমি শুধু দেখে দেখে দেব অট্টহাসি
না বলব মিষ্টি বাত না করব তারিফ
ঘুষি দিয়ে জানালার কাঁচ করব চুর।

ব্রান্ডার : (টেবিলে মুষ্টাঘাত করে)
শোন সব বন্ধুগণ পেতে রাখ কান
আমি জানি কত চালে হয় কত ধান।
এইখানে আছে বহু রসের নাগর
তাদের সম্মানে করি রাত্রি উজাগর।
আনকোরা নতুন এই ধীরোদাত্ত সুর
যুগলের রাত্রিবাস করে সুমধুর
সমস্বরে সবে মিলে কণ্ঠে দাও শান
প্রেমরস পরিপূর্ণ কোরাসের গান।
(সে গাইতে লাগল)
একদা এক নেংটি ইঁদুর
ভাঁড়ার ঘরে করত সুখে বাস।
পরিপাটি দন্তে ছিল তীক্ষ্ণ হীরার ধার
উদর ছিল ঢোলের পারা
দেখতে বটে হেকিম সুফিয়ান।
রাঁধুনিটা বুদ্ধি করে
বিষ মাখাল থরেথরে
ইঁদুর জগৎ ভেঙে হল চুর।
ধুঁকে ধুঁকে ভাবল ইঁদুর
প্রেমের বিষে জীবন হল ক্ষয়।

কোরাস : আ-হা প্রেমের বিষে জীবন হল ক্ষয়।

ব্রান্ডার : বিষের জ্বালায় ধুঁকে ধুঁকে
কানাখন্দে মুখ ডুবিয়ে করল জল পান
দিকে দিকে করল ধাওয়া দুঃখিত ইঁদুর
তথাপিহ বিষের জ্বালা নাহি হল দূর।
ত্বরিত লম্ফে উর্ধ্বে উঠে ভূমিতে পতন
বেঁকিয়ে লেজ শরীর দিল টান।
ঢুকল যখন রসুই ঘরে
অবশ হয়ে শানের ওপর
রাখল গতর খান।

রাঁধুনিটা বলল হেসে
তোমরা সবাই দেখ এসে
শানের ওপর ধড়ফড়াচ্ছে
ইঁদুর সোনার চান।
প্রেমের বিষে জীবন হল ক্ষয়।

সিবেল : এ খেলায় যারা মজা পায়
পাজির পা ঝাড়া তারা
ইঁদুরকে হত্যা করা প্রাণঘাতী বিষে
মনে করি অতিশয় শরমের বাত।

ব্রান্ডার : ইঁদুরকে কর তুমি সম্মানিত জ্ঞান?

আল্টামায়ার : মোটাসোটা টাকমাথা পঙ্গুও তেমন
সেরকম ক্ষীণপ্রাণ জীব একজন
ধারে কাছে মরে যদি নেংটি ইঁদুর
পঙ্গুভাবে নিজ মৃত্যু আর কত দূর।
(ফাউস্ট এবং মেফিস্টোর প্রবেশ)

মেফিস্টো : পহেলা তোমাকে আমি এনেছি যেখানে
সে এক আনন্দচক্র
দেখ কেমন মসৃণধারা চলছে জীবন;
সারা হপ্তা যেন লোক ছুটিতে কাটায়
বুদ্ধিহীন বলতে পার তবু সুখে আছে।
ভূস্বামীর দেনা নিয়ে করে না জল্পনা।

ব্রান্ডার : দূরদেশি মুসাফির এসেছে দুজন
গায়ের পোষাক করে সহজে ঘোষণা
এ শহরে একেবারে সদ্য আগন্তুক।

ফ্রশ : বলেছ আসল কথা
আমাদের লাইপসিক দ্বিতীয় প্যারিস
মহিমায় পর্যটক করে আকর্ষণ।

সিবেল : কি রকম লোক তুমি মনে কর তারা?

ফ্রশ : সে দায় আমার ঘাড়ে
পেটে গেলে দুই পাত্র
জেনে নেব এন্তার বেত্তান্ত।
শিশুর দন্তের মত টেনে নেব
গোপন সকলই।
মনে হয় তারা অতি উঁচুকুলজাত
চরণে গর্বের ভঙ্গি নয়নে জড়িমা।

ব্রান্ডার : বাজি রেখে বলি
দুজনেই হবে বটে হাতুড়ে ডাক্তার।

মেফিস্টো	:	স্বপ্নেও ভাবেনি তারা শয়তান হাজির
		ঘাড়ে ধরে যদি টানে না হবে প্রত্যয়।
ফাউস্ট	:	শুভ সন্ধ্যা ভদ্র মহোদয়।
সিবেল	:	আমাদেরও একই সম্ভাষণ।
		(মেফিস্টোফেলিসের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে)
		এই লোক এক পায়ে একটু খোঁড়ায়।
মেফিস্টো	:	যদি না থাকে আপত্তি কারো
		এ আসরে অংশ নেই আমরা দুজন,
		বিশেষত যে আসরে সুরা অপ্রচুর
		শরীফ লোকের সঙ্গ ব্যথা করে দূর।
আল্টামায়ার	:	আপনাকে মনে হয় সত্যিই অদ্ভুত।
ফ্রশ	:	আমার বিশ্বাস বিলম্বে রিপ্যাক থেকে যাত্রা শুরু করে
		কেটেছে সায়ংবেলা হ্যানসেন আলয়ে
		সেখানে সমাধা বুঝি হয়েছে আহার।
মেফিস্টো	:	সময় সংক্ষেপ তাই এসেছি ত্বরিত
		এবারে হ্যানসেন সঙ্গে দেখা হয় নাই।
		গেলবারে বহুতর হয়েছে আলাপ
		জানা গেছে কথায় কথায়
		আমাদের পরিচিত তার জ্ঞাতি ভাই—
		নিয়েছি হ্যানসেন বার্তা ভ্রাতার সকাশে।
		(সে ফ্রশকে আলাদা করে আদাব দিল)
আল্টামায়ার	:	(নীচু গলায়) আপনার অনুগ্রহ অপার।
সিবেল	:	মনে হয় ধূর্ত অতিশয়।
ফ্রশ	:	সকলে নিশ্চিত রও জেনে যাব ঠিক পরিচয়।
মেফিস্টো	:	এবার বলুন,
		সঠিক শুনেছি নাকি শ্রবণের ভুল
		অপূর্ব সঙ্গীতরবে ছাদ ফেটে পড়ে
		শুনেছি সুন্দর গান সম্মিলিত স্বরে।
ফ্রশ	:	আপনি কি সঙ্গীত লেখক?
মেফিস্টো	:	যত ইচ্ছা তা তো নই, অতি অল্প জ্ঞান
আল্টামায়ার	:	তাহলে এখন তবে গানে দিন টান।
মেফিস্টো	:	যত সাধ আনন্দে শুনুন।
সিবেল	:	শোনান মধুর কিছু টাটকা নতুন।
মেফিস্টো	:	আলবত নতুন
		সঙ্গীত সুরার দেশ মধুর হিস্পাণ
		আমরা সেখান থেকে সদ্য প্রত্যাগত।

গান : একদা এক মহারাজা
মনের সুখে পুষত একটি মাছি
চপল চরণ কালো বরণ
ছেলের মত বাসত ভাল
থাকত কাছাকাছি।
দরজি ডেকে মহারাজা
হুকুম দিল কষে
মাছিপুত্রের পোষাক বানাও
গায়ের মাপে মাপে
অঙ্গরাখা পায়ের ইজার
বাজুর দেবে কুচি।

ব্রান্ডার : দরজিপুত্র ভাবল বসে
মাপ যদি যায় ভুলে
অঙ্গরাখা একটুখানি
পড়ে যদি ঝুলে
মাথার ওপর বিপদ খাড়া
চড়তে হবে শূলে।

মেফিস্টো : মাছির গায়ে তখন থেকে
চীনাংশুকের চেকন বসন
গলায় দোলে মোতির মালা
আরো নানা রতনভূষণ
জরির ঝালর জড়িয়ে বুকে
ঘুরে বেড়ায় মনের সুখে।
মহারাজা খুশির চোটে
বানিয়ে দিল মন্ত্রী করে।
ইষ্টিকুটুম যত ছিল
দরবারেতে আসন পেল।
মাছির দেখ গুমোর কত
আওয়াজ তুলে বেড়ায় ঘুরে।
দরবারে এক কাণ্ড হল
রানীর চক্ষু ছল ছল
সখী দলের সঙ্গে রানী
সইছে মাছির হুল ফুটানি
ওমরা দলে ওষ্ঠ চেপে
দু'বেলা খায় মাছির কামড়।
মহারাজার কড়া হুকুম

চলবে না ভাই গা চুলকানো
কেননা তা দরবারেতে
ভীষণ একটা রীতির খেলাপ।
আমরা কিন্তু কামড় খেলে
সেই মাছিদের হাতে পিষে
মারতে পারি অনায়াসে।

ফ্রশ : বহুত, বহুত আচ্ছা
বলিষ্ঠ দরাজ কণ্ঠ গানখানি সাচ্চা।

সিবেল : সমস্ত মাছিকে তবে পিষে কর শেষ।

ব্রান্ডার : বন্ধুগণ নখে টিপে মাছিদের গুষ্ঠি শেষ কর।

মেফিস্টো : অপকৃষ্ট নয় যদি দোকানের সুরা
বলুন মুক্তির নামে কিছু পান করি।

সিবেল : রেখে দিন আপনার বড়লোকি চাল।

মেফিস্টো : দোকানি বিরক্ত হয় পাছে
নইলে সেরা সুরা সহযোগে
সুযোগ্য অতিথিবৃন্দে করি আপ্যায়ন।

সিবেল : তাহলে মশায় আমি অনুরোধ করি।

ফ্রশ : পাত্রভরে ঢেলে দিন পিয়ে সুখী হই
সবে মিলে আপনার করি গুণগান।
কিন্তু ভাই বলে রাখি অল্পে তুষ্ট নই
নমুনা স্বরূপ কিছু চেখে সুখ কই

আল্টামায়ার : ওঁকে দেখে মনে হল
রাইন দেশ থেকে আনা অতি খাঁটি চিজ।

মেফিস্টো : কাঠ ছেদা করে সেই কলটা কোথায়?

ব্রান্ডার : তাহলে বাইরে আছে মস্ত এক পিপা।

আল্টামায়ার : কক্ষান্তরে গেলে পাব দোকানির কল।

মেফিস্টো : (কলটা হাতে নিল, ফ্রশের দিকে তাকিয়ে)
বলুন আপনি কি চান
বোধ করি সেই সুরা সরস ফেনিল।

ফ্রশ : কি আশ্চর্য, তাহলে ভাঁড়ারে আছে নানান মদিরা।

মেফিস্টো : যার যাতে রুচি
অকাতরে সবারে বিলাব।

আল্টামায়ার : (ফ্রশের দিকে লক্ষ করে)
শুনেই জিভের মুখে এল বুঝি জল।

ফ্রশ : যদি নিজে বেছে নেই
তবে দিন রাইনের মাধুরী
পিতৃভূমি যে সুরার গর্বে গরীয়ান।

মেফিস্টো : (মেফিস্টো ফ্রশের সামনের টেবিলটিতে একটি
ছেদা করতে প্রবৃত্ত হল)
তাড়াতাড়ি মোম দিন যেন মুখ বন্ধ করা যায়।

আল্টামায়ার : যাদুর চমক ছাড়া কিছুই বলি না একে।

মেফিস্টো : (ব্রান্ডারের প্রতি) কোন সুরা কাম্য আপনার।

ব্রান্ডার : আমাকে স্যাম্পেন দিন।
উজ্জ্বল কনক বর্ণ ফেনোচ্ছল সুরা
(এরই মধ্যে মেফিস্টোফেলিসের ছেদা তৈরি শেষ।
কে একজন মোম এনে লাগিয়ে দিল)
বিদেশি বস্তুর প্রতি সমূহ বিদ্বেষ
কখনো উচিত নয়,
আমাদের নিতে হবে সব কিছু ভাল
ফরাসিরা জার্মানের ঘৃণার বিষয়
তথাপি ফরাসি মদ্য বড় ভালবাসে।

সিবেল : (মেফিস্টোকে তার দিকে আসতে দেখে)
টকরস পানে নাই আসক্তি আমার
আমি চাই মিষ্টিময় সেরা সুরাসার।

মেফিস্টো : (বিরক্ত হয়ে) দেখবেন কথামাত্র সামনে হাজির।

আল্টামায়ার : চোখে চোখ রেখে দেখি ঠিক কথা কন
আমাদের বোকা ভেবে ছলনা করেন?

মেফিস্টো : এরকম ভদ্রমণ্ডলীতে
চালাকি করার লোক ভাবেন আমাকে?
তার চে' বলুন কোন্ সুরা চাই
সাধ্য মত সকলের সাধব সন্তোষ।

আল্টামায়ার : আমার বলার নাই, যা পাই খাব।
(ছিদ্র তৈরি সমাপ্ত এবং তাতে মোমের ছিপি লাগানো হয়েছে)

মেফিস্টো : (উৎকট অঙ্গভঙ্গি সহকারে)
সুরার পিপায় মিষ্টি আঙুর ফলে
পাঁঠার শিঙে ছুরির মত ধার
রসের হৃদয় সুরার জন্মযোনি
লতায় দোলে আঙুর থোকা থোকা
কাষ্ঠখণ্ডে বইবে সুরার ধারা
চরাচরে আজো অনেক গভীর যাদু আছে
পাত্রভরে দলে দলে পান করে যান সুরা।

সকলে : (ছিপি সরিয়ে নিজের নিজের পছন্দসই সুরা
পাত্র ভরে পান করতে লাগল)
অফুরন্ত সুরার ফোয়ারা কণ্ঠভরে পান কর।

মেফিস্টো : পান করুন খুশিমত, কিন্তু বন্ধু অপচয় নয়।
কয়েকজন : (গান গাইতে গাইতে)
মদে পেলে ভাই
আমরা সবাই
একযোগে হই
নরক দেশের ব্রাহ্মণ।
মদের ভাণ্ডে মুখ লাগিয়ে
শূয়র যেমন ঘোঁতঘোঁতিয়ে
পান করে হয় খুন।
তুষার ঝরুক তুফান ছুটুক
কে ধারে সেই ধার
নেশার তোড়ে জগৎ ঘোরে
এমন দ্রব্যগুণ।
মেফিস্টো : দেখ চেতনায় গণতন্ত্র করেছে আশ্রয়।
ফাউস্ট : দেখা তো হয়েছে ঢের, চল যাই।
মেফিস্টো : ব্যস্ততা কিসের
খানিক অপেক্ষা কর
মনোমুগ্ধ মহত্ত্বের দেখাবে প্রকাশ।
(সিবেল বিরামহীনভাবে পান করেছিল এবং
অসতর্ক মুহূর্তে মেঝে কিছু সুরা ছলকে পড়ল,
দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠল)
সকলে : নরকের তীব্র শিখা আগুন, আগুন
আমাদের সাহায্যার্থে সকলে জাগুন।
মেফিস্টো : শান্ত থাক উপাদানরাজি
বাধ্য হও, হও অনুগত।
(পানকারীদের প্রতি) কিছু নয় একখণ্ড বিশুদ্ধ আগুন
যেন বা জ্ঞানের দীপ্তি ঝলমলে রোশনাই।
সিবেল : তার জন্য শাস্তি পেতে হবে
কি পেয়েছ আমাদের
চাতুরির কিবা মানে হয়!
ফ্রশ : তামাশা থামাব তার, যা হবার হোক।
আল্টামায়ার : নীরবে খেদিয়ে দাও সে অনেক ভাল।
সিবেল : মানে মানে কেটে পড়
কেমন সাহস, আমাদের পানশালে
বেলেহাজ করে ভেল্কিবাজী।
মেফিস্টো : চুপ থাক, অর্ধভগ্ন মদ্য পিপা।

সিবেল : আরে বেটা ঝাড় পায়খানার গাড়
আমার মুখের পরে এত অপমান।

ব্রান্ডার : একটু সবুর কর ঘুষি মেরে নাক ভেঙে দেব।

আল্টামায়ার : (বোতলের ছিপি খুলে নিতেই, তার দিকে অগ্নিশিখা ধাবিত হল)
উঁহু উঁহু পুড়ে হলাম ছাই।

সিবেল : নির্ঘাত যাদুর কাণ্ড
এই বেটা পাতকী আমাকে
এমন আঘাত দিল!
(তারা ছুরি খুলে মেফিস্টোফেলিসের দিকে ধাওয়া করল)

মেফিস্টো : (গম্ভীর ভঙ্গিতে)
উঠে আস শব্দে দৃশ্যে মরীচির মায়া
বোধশক্তি দৃষ্টি আর স্থানে পেল ছায়া
নিয়ে যাও মনগুলো দূর তেপান্তরে।
(তারা অবাক হয়ে একে অপরকে দেখতে লাগল)

আল্টামায়ার : কোথায় তাহলে আমি
মনোরম দৃষ্টিহারী ওটা কোন্ দেশ?

ফ্রশ : এবং যে দ্রাক্ষাকুঞ্জ হৃদয় ভোলায়!

ব্রান্ডার : সবুজ পাতার জালে
ঝুলে আছে থোকা থোকা ফল
(সে সিবেলের নাক আঁকড়ে ধরল, অন্যান্যরা তার
অনুকরণ করল এবং ছুরি বের করল)

মেফিস্টো : (পূর্বের মত গম্ভীরভাবে)
মরীচি দৃষ্টির থেকে অন্তর্হিত হও
শয়তানের লীলালাস্য বোধগম্য হোক।
(সে ফাউস্টসহ অদৃশ্য হয়ে গেল। মদ্যপেরা
পরস্পরকে ছেড়ে দিয়ে নিবৃত্ত হল)

সিবেল : কি হল তাহলে?

আল্টামায়ার : কি?

ফ্রশ : আমি যেন তোমার নাক ধরে টেনেছি।

ব্রান্ডার : আমিও তো সিবেলের নাসিকা ছুঁয়েছি।

আল্টামায়ার : প্রচণ্ড আঘাতে সর্ব অঙ্গ জরজর
ব্যথায় কাতর, কিছুই দেখি না চোখে
মাথা ঘোরে।

ফ্রশ : বল দেখি, এসবের কি অর্থ দাঁড়ায়?

সিবেল : সেই হারামি কোথায়
একবার যদি পাই হাতের নাগালে
জানে মেরে ফেলে দেব ঐ নর্দমায়।

আন্টামায়ার : মনে পড়ে স্ফটিক পিপায় চড়ে
কক্ষ থেকে উড়ে যেতে স্বচক্ষে দেখেছি
পা দুটি মাটিতে স্থির
শৃঙ্খলে আবদ্ধ আছি সারা দিনমান।
(টেবিলের দিকে দৃষ্টিপাত করে)
এখনো বইছে বুঝি সুরার ফোয়ারা।

সিবেল : সমস্ত অলীক মায়া মিথ্যা প্রতারণা।

ফ্রশ : তবু মনে হয়েছিল সুরা মিষ্টি সুরভিত।

ব্রান্ডার : মনে কি পড়ে শিরোপরি
গুচ্ছ গুচ্ছ দুলছে আঙুর।

আন্টামায়ার : এরকম প্রাণবান যাদুর লীলায়
বল দেখি কার মনে না হয় প্রত্যয়।

ষষ্ঠ দৃশ্য

ডাইনির রসুইঘর

[একটি নিচু চুল্লিতে আগুন জ্বলছে। ওপরে চাপানো একখানা বড় আকারের কড়াই। ভাপ উঠছে এবং দেখা যাচ্ছে কিম্ভূতকিমাকার মূর্তিসমূহ। একটি বানরী ঝাঁঝড়ি হাতে কড়াইয়ের পাশে উপবিষ্টা। সন্তর্পণে উপচারসমূহে নাড়া দিচ্ছে, যেন টগবগে ফুটন্ত রস উপচে না পড়ে। তার স্বামী বানরটি বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে আগুনে শরীর তাতাচ্ছে। ছাদে এবং দেয়ালে নানাবিধ যাদুর উপকরণ।]

ফাউস্ট : ডাইনির তন্ত্রমন্ত্র অন্তরাত্মা দীর্ণ করে, করে উৎপীড়ন
অন্ধকার গর্ভগুহা মধ্যে রাজে নানান কুহক;
তার বলে আমাকে ফিরিয়ে দেবে যৌবন আবার
এ তোমার অঙ্গীকার নয়?
নারকীয় গন্ধময় ফুটন্ত পাচনরস বিকট কুৎসিত
নিয়ে যাবে এ শরীর তিরিশ বসন্ত পূর্ণ যৌবন প্রত্যূষে?
এই বুঝি ক্ষমতার পরাকাষ্ঠা উজ্জ্বল চাতুরি
অন্ধ আশা তুই বড় বিশ্বাস প্রবণ,
নিসর্গ হে উদ্বুদ্ধ প্রাণের জন্য
নেই তোর সঙ্গোপন কোনই সান্ত্বনা?

মেফিস্টো : শান্ত হও বন্ধুবর ধৈর্য ধর সযত্ন প্রয়াসে
জেনে রাখ লেখা আছে দোসরা কেতাবে
পুনঃযৌবনাগমের উত্তম দাওয়াই
সে এক নিগূঢ় সত্য।

ফাউস্ট : বল সে হদিশ।

মেফিস্টো : স্বর্ণ নয়, যাদু নয়, নয় কোন চিকিৎসা বিধান
উন্মুক্ত হাওয়ার তলে জীবনের ঘটাও নির্বাণ
পরিখা খনন কর, মাঠ চষো
সর্বদা সন্তুষ্ট থাক নির্দিষ্ট সীমায়
গৃহজাত খাদ্যে কর দু'বেলা আহার।
যে মাঠে করবে তুমি ফসল কর্তন
দু'হাতে ছড়াবে তাতে গরুর গোবর।

মেফিস্টো : আমার নিজের কিন্তু আছে ভিন্ন মত
মনমত গুণযুক্ত অপূর্ব মর্কট।
(পশুদের প্রতি) অভিশপ্ত মাণিক্য পুত্তলি,
বল বাছা সিদ্ধ কর কিসের পাচন।

পশুরা : ভিখারির পাচন রাঁধি
দিয়ে লম্বা পানি।

মেফিস্টো : তাহলে অর্ধ পৃথিবীর লোক পেয়েছ খদ্দের।

পুরুষ বানর : (আদুরে ভঙ্গিতে মেফিস্টোর দিকে অগ্রসর হয়ে)
ফেল পাশার দান
মিটবে তবে ধনী হওয়ার শখ
জীবন নয় মুখের কথা
সোনা যদি মেলে
শান্তি খুঁজে পাবে।

মেফিস্টো : লোভান্ধ মর্কট, জুয়া পাশা খেলে
নিতান্ত মনের সুখে দিন কাটাতে চায়।
(কচি বানরেরা একটি বৃহদাকার গোলক নিয়ে খেলা করছিল।
তারা সেটিকে গড়িয়ে গড়িয়ে সামনে নিয়ে এল)

পুরুষ বানর : দেখ, দেখ
কি রকম ঘোরে
ওপরে ও নিচে
বিরাম বিহীন
ধরণী গোলক।
স্ফটিক যেমন
ঝলসায় তাতে
অতিশয় ফাঁকা
রাজার মুকুট;
হঠাৎ আঘাতে
ফেটে চৌচির।
কোথাও চমকে
কোথাও ঝলকে
পুত্র হে বলি
জানে বাঁচা ঠিক জেন
প্রাণপণ বলে
পতন ঠেকিয়ো
মরবে তো একদিন।

কাদার জগৎ
ঝরে ঝরে যাবে
চোখের পলকে
হাওয়ায় মিলাবে

মেফিস্টো : এ চালুনি কোন কাজে আসে?

পুরুষ বানর : (তলায় হাত রেখে) যদি হও চোর
জেনে যাব খাঁটি পরিচয়।
(সে স্ত্রী বানরীর কাছে চালুনিটা নিয়ে গিয়ে দেখাল।)
চালুনির ফাঁকে দেখ
শুধাও কে চোর
যদিচ জবাব মিলে
চুপ করে থেক।

মেফিস্টো : (চুল্লির কাছে গিয়ে)
আর ওই হাঁড়ি কেন

পুরুষ ও স্ত্রী বানর : আ-হা বড় সরল গোঁসাই
কিছুই চেনে না ছাই
হাঁড়ি ও কড়াই।

মেফিস্টো : শান্ত হও বেতমিজ পশু।

পুরুষ বানর : ঝাড়খানা টেনে নিয়ে মুড়ার পরে বসে
(মেফিস্টোকে বসার জন্য জেদ করতে লাগল)

ফাউস্ট : (এতক্ষণ আর্শীর সামনে দাঁড়িয়ে কখনো
ঝুঁকে পড়ে দেখছে, কখনো পিছিয়ে আসছে।)
দৃষ্টিকে বিশ্বাস আমি করি কি প্রকারে
দর্পণে বিম্বিত দেখি মোহন মূরতি
নয়নে বুলিয়ে দেয় গাঢ় সম্মোহন।
প্রেমের দেবতা তুমি ধার দাও পাখা
যেন আমি উড়ে যাই প্রিয়া সন্নিধানে।
কি আশ্চর্য,
দৃষ্টি যদি নড়েচড়ে দেখি সেও নাই
সন্নিকটে এলে দেখি, দূরে সরে যায়
আবছা সুন্দর মূর্তি বিদ্যুৎ ঝলকে।
হায় বিধাতা, নারী হয় এত সুকুমারী
তনুদেহে সপ্তস্বর্গ বাঁধা পড়ে আছে
শরীরী সৌগন্ধ তার ভেসে ভেসে আসে
ব্যথাদীর্ণ প্রাণের সন্তোষ;
এমন দুর্লভ রত্ন মূর্তিময়ী উষা
ধরার ধুলির পঙ্কে কি করে সম্ভব!

মেফিস্টো : কেন নয়? ষষ্ঠ দিন শ্রম অন্তে প্রভু
অনুরাগে হঠাৎ বিস্ময়ভরে করে উচ্চারণ
পরবর্তী সৃষ্টি হবে দিব্যি অনুপম
তখনই ডাগর আঁখি মেলেছে নন্দিনী
মরি মরি কান্তি হেরি
আপন অন্তর তলে বিধাতাও উঠেছে শিহরি।
দেখ তবে নয়নের মিটিয়ে তিয়াস
এনে দেব প্রিয়া করে
অনুপম গৌরাঙ্গ ললনা
স্বর্গসুখ সহবাসে কেলিকলা রসে
কাটবে মধুর দিন, মধুর যামিনী।
(ফাউস্ট একদৃষ্টে আর্শীর পানে তাকিয়ে রইল। মেফিস্টো
ঝাড় খান। হাতে নিয়ে ক্রীড়ারত অবস্থায় কথা বলতে লাগল)
এ আসনে বসে আমি যেন মহারাজ
হাতে আছে রাজদণ্ড, কিন্তু বড় মুকুটের ঠেকা।
(পশুরা এতক্ষণ নানারকম উৎকট অঙ্গভঙ্গি করেছিল।
একটা সুতীব্র চিৎকার ধ্বনি সহযোগে মেফিস্টোকে একটা
মুকুট এনে দিল।)
সবিনয় নিবেদন
মুকুট বরেণ্য কর
ঘর্ম আর শোণিত ধারায়
(তারা অসাবধানে মুকুটটা আনতে যেয়ে দু টুকরা করে
ফেলল এবং অর্ধাংশ হাতে নিয়ে লাফাতে লাগল)
খতম সবই
আমরা এখন দৃষ্টি ঘুরাই
চুপটি করে শুনে নিয়ে
কথায় কথায় ছড়া বানাই।

ফাউস্ট : (আর্শীর পানে তাকিয়ে)
অপূর্ব নবীন কান্তি সংজ্ঞাশক্তি করেছে হরণ।

মেফিস্টো : (পশুদের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করে।)
আমারও মাথার চাঁদি তপ্ত হয়ে ওঠে।

পশুরা : বরাত যদি ভাল থাকে
আমাদের এই সরল কাব্য
লোকের যেন ভাল লাগে।

ফাউস্ট : অগ্নিময় চিন্তা করে অন্তর দহন
চল যাই দ্রুতগতি।

মেফিস্টো : সঠিক এসেছে বটে নয়া উপাদান
ভুল নেই, এরাই যুগের কবি দিব্যি মূর্তিমান।
(এরই মধ্যে বানরটার অবহেলার দরুণ কড়াইয়ের ফুটন্ত পাচন রস উপচে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে অগ্নিশিখা জ্বলে উঠল দাউ দাউ করে এবং তা চিমনি পর্যন্ত আবৃত করল। বিকট চিৎকার করে ডাইনি অগ্নিশিখার ভেতরে দিয়ে অবতরণ করল।)

হাউ মাউ হাউ মাউ
আগুনে পাচন ঢেলে পুড়িয়ে মারতে চাস কর্ত্রী ঠাকুরুণ।
(ফাউস্ট এবং মেফিস্টোকে দেখে)
তোমরা কারা
সামনে খাড়া
কীই-বা প্রয়োজন।
ঘাটের মরা
পুড়ে মর
নরক
শিখায় জ্বলো।
(সে ঝাঁঝড়ি ভরে আগুন তুলে ফাউস্ট মেফিস্টো এবং পশুদের দিকে ছুঁড়ে মারতে লাগল। যন্ত্রণায় আতঙ্কে পশুরা চিৎকার দিয়ে উঠল।)

মেফিস্টো : (হাতের ঝাড়ুর সাহায্যে আগুন প্রতিহত করল এবং
বাসনকোসন হাঁড়ি পেয়ালায় আঘাত করতে লাগল)
বাসনকোসন পেয়ালা সোরাই
আঘাতে ফেটে খান খান
যাক ভেঙ্গে যাক।
রসাল সুরুয়া সব ধুলায় গড়াক
এইবার মজা করে প্রহর পেটাই
দাও তুমি ধামারে তাল
উচ্চকিত সুরে।
(পুঞ্জীভূত ঘৃণায় অঙ্গভঙ্গি হুকারে, ডাইনি পেছনে হটে গেল)
কঙ্কালের জীর্ণ থলে না হয় প্রত্যয়
সামনে দাঁড়িয়ে আছে সাক্ষাৎ ঈশ্বর।
মুখে মুখে কথা বল
পথ পায় যদি রুদ্ররোষ
কে তোমারে রক্ষা করে

পোষিত পশুরা কোথা পায় বরাভয়?
খেয়েছ চোখের মাথা
দেখ নাই লালবর্ণ কুক্কুট পালক
রাতারাতি পাল্টে গেছে আমার আদল
পরিচিতি আস্তিনেতে ঝোলাতে কি হবে?

ডাইনি : ক্ষমা চাই, করেছি গোস্তাকি
আপনাকে চিনে নিতে ঘটেছে প্রমাদ
না দেখি নয়নে প্রভু চলমান দৃপ্ত অশ্বক্ষুর
ঘন মসীবর্ণ সেই যুগল বায়স
সঙ্গে নেই অনুগত যুগ্ম অনুচর।

মেফিস্টো : এইবার পেলে ক্ষমা, কিন্তু আর নয়
তোমাতে আমাতে দেখা সুদূর অতীতে
এরই মধ্যে নদীতে গড়িয়ে গেছে অনেক জোয়ার।
সর্বস্থানে সমাজের উৎকর্ষ প্রচুর
সংস্কৃতি সবখানে ছড়াচ্ছে শেকড়
এমনকি শয়তানেরও হয়েছে উন্নতি
উত্তর দেশের শঙ্কা, যার নামে কম্পমান বেবাক মানুষ
কেটে গেছে কত আগে
পৃথিবী পরেছে নব বসনভূষণ।
খসে গেছে শৃঙ্গ থাবা পশ্চাতে লাঙ্গুল
পাছে লোকে মনে নেয় কোন অপরাধ
বিলাসী বাবুর মত পাদুকায় ঢেকে ঢেকে রাখি যুগল চরণ।

ডাইনি : মুখেতে না সরে বাণী
কি আশ্চর্য, মহাপ্রভু শয়তান সমুখে।

মেফিস্টো : ভদ্রে, ওই নাম করবে বর্জন।

ডাইনি : কেন প্রভু এ নামে কি ক্ষতি আছে কোন?

মেফিস্টো : সুলোচনে রূপকথা প্রায়
বহু পূর্বে সেই নাম বাসী হয়ে গেছে
মানুষ হয়েছে ব্যর্থ উৎকর্ষ সাধনে
অসৎকে করে নির্বাসিত অসতের রাজ্যে করে জীবন যাপন।
যাক, সেসব নাহক কথা;
আমাকে ডাকবে তুমি মহান রাজন
আমিও সবার মত সম্মান ভাজন।
ধমনীর নীল রক্তে কর না সংশয়
এই দেখ ধড়াচূড়া সত্য নিদর্শন।
(সে একটা বিশ্রীভঙ্গি করল)

ডাইনি : (অপ্রস্তুতভাবে হেসে)
এবার গিয়েছে চেনা
চিরকেলে পাজি নচ্ছার শয়তান।

মেফিস্টো : (ফাউস্টকে) ভালভাবে জেনে নাও
কি করে ডাইনি তুমি ভোলাবে-মজাবে।

ডাইনি : কীসে করি যোগ্য আপ্যায়ন।

মেফিস্টো : একপাত্র পরিচিত রস
তোমার প্রচুর খ্যাত প্রাচীন পানীয়
যৌবন বাড়ায় তেজে শক্তি সঞ্জীবনী।

ডাইনি : সানন্দে বিলাব রস
এই এক পাত্র দেখ
ইচ্ছা হলে মাঝে মাঝে কণ্ঠ সিক্ত করি
সম্পূর্ণ দুর্গন্ধমুক্ত পরিশ্রুত রস
দিতে পারি অকাতরে।
(নিচুস্বরে)
এ লোক না জেনে বৃত্তান্ত যদি পান করে রস
তুমি জান অতি দ্রুত ঘটবে মরণ।

মেফিস্টো : তিনি হন বন্ধুজন সোমরস ধারণে সক্ষম
যা কিছু প্রস্তুত হয় রন্ধনশালায়, তাকে আমি
দিতে পারি বিনা আশঙ্কায়
বৃত্ত আঁক, চক্র গড়, মন্ত্রধ্বনি কর উচ্চারণ
তারপর খেতে দাও মন্ত্রপূত সুরা
(ডাইনি উৎকট অঙ্গভঙ্গিসহকারে একটা বৃত্ত আঁকল এবং অভ্যন্তরে নানা বিচিত্র বস্তু স্থাপন করল। এই সময়ে পেয়ালার ঠন ঠন শব্দ এবং কড়াইয়ে সঙ্গীত রব শোনা গেল। অবশেষে সে একটা বৃহৎ গ্রন্থ নিয়ে এল ও বানরদের কেন্দ্রস্থলে গিয়ে উপবেশন করল যেন প্রয়োজনে তাদের গ্রন্থ রাখার চৌকি এবং মশালচি হিসেবে ব্যবহার করা যায়। তারপর ফাউস্টকে কাছে যেতে ইঙ্গিত করল)

ফাউস্ট : (মেফিস্টোর প্রতি)
বিচিত্র বস্তুর স্তূপ, বিড়বিড় মন্ত্র পাঠ—উন্মত্ত নর্তন
বল দেখি এসবে কি হবে?
তোমাকে জানিয়ে রাখি
আমার অনীহা বড়
ঘৃণা করি, তীব্র ঘৃণা করি।

মেফিস্টো : কি ফল বিরক্ত হয়ে
ধরে নাও এটা এক মজার ব্যাপার
ঝাড়-ফুঁক মন্ত্রতন্ত্র উপলক্ষ শুধু
আখেরেতে সোমরস দেবে উপকার।
(সে বুঝিয়ে সুজিয়ে বৃত্তের ভেতরে ফাউস্টকে ঢুকতে বাধ্য করল)

ডাইনি : (গম্ভীর আওয়াজ তুলে গ্রন্থ থেকে পাঠ করতে লাগল)
সঠিক বোঝ এবার তবে
এককে কর দশ
হাতের দুই ছেড়ে দিলে
রইবে বাকি তিন।
ডাইনির বাক্যে ধনী হবে
ফিরবে তোমার দিন।
পাঁচ আর ছয়ের থেকে
চারের সংখ্যা বড়
সাত আট সহযোগে
ভাগ্য পূর্ণ কর
নয়ে এক হয়
দশ কিছু নয়
একে একে ডাইনি তবে
মিলিয়ে দিল শেষে।

ফাউস্ট : লোলচর্মা বৃদ্ধা বকে উন্মত্ত প্রলাপ।

মেফিস্টো : সব শোনা হয় নাই শেষ
গ্রন্থের গঠন-রীতি একটু গম্ভীর।
আমিও করেছি পাঠ অতি অনুরাগে
এরকম স্বভাবত ঘটে
যেই কর্মে নেই কোন প্রত্যক্ষ বিধান
তার রহস্যেতে মজে মূর্খ ও বিদ্বান।
নবতর শিল্পকলা প্রাচীন উৎসের থেকে হয় সম্ভাবিত
কহ শিষ্ট সুমার্জিত অথবা বর্বর
যুগযুগ ধরে এই অশান্ত মানুষ, তিন ভেঙ্গে এক করে
এক ভেঙ্গে তিন।
পণ্ডিতেরা বুকভরা অসীম উৎসাহে
শিক্ষা দেয় তত্ত্বকথা মার্জিত উচ্ছ্বাসে
মূর্খ ছাড়া প্রতিবাদ করে কোন্ জন?
যখন মানুষ শুনে বিজ্ঞ কণ্ঠে শব্দের কামান
ভাবে তার অর্থ এক আছে বিদ্যমান।

ডাইনি : (মন্ত্রের পূর্বানুবৃত্তি)
জ্ঞানের দীপ্তির
অসীম ক্ষমতা
পৃথিবী দেখেনি
লুকানো কোথায়
সত্য বাঁধে বাসা
নির্বিকার মনে
পরোয়া করে না
ডাকা না ডাকায়।

ফাউস্ট : এই বৃদ্ধা তার স্বরে জুড়েছে চিৎকার
অর্থহীন সব শব্দ মগজেতে করে তোলপাড়
ধ্বনি ফোটে যেন লক্ষ পিশাচের হাসি।

মেফিস্টো : ক্ষান্ত দাও সিবিল এবার
চকিতে সরিয়ে নাও সব উপচার।
তোমার দরাজ হাতে
পাত্র ভরে কানায় কানায়
বন্ধুর প্রখর তৃষ্ণা কর নিবারণ।
যেহেতু আমার অতি প্রিয় বন্ধুজন
হবে না পাচন রসে অনিষ্ট সাধন
অত্যন্ত কামেল লোক
উত্তেজক সোমরসে তালিম প্রচুর।
(ডাইনি অতিশয় ভক্তিসহকারে সোমরস একখানা পাত্রে ঢেলে দিল। ফাউস্ট পান করার জন্য মুখ সংযোগ করলে তার মধ্যে থেকে একটা বির্বণ শিখা উত্থিত হল।)

মেফিস্টো : শঙ্কা ভয় দূর কর, দূর কর সকল সংশয়
উত্তাপিত সোমরসে শোণিতে শিরায়
খেলে যাবে অতর্কিতে আনন্দ লহরি
শয়তানের মিতা তুমি
অতি ক্ষুদ্র অগ্নিশিখা কি করে তোমার?
(ডাইনি বৃত্তটা মুছে ফেলল এবং ফাউস্ট বেরিয়ে এল)

মেফিস্টো : চল ছুটি-বিশ্রামের নেই অবকাশ।

ডাইনী : সোমরসে আপনার আশা পূর্ণ হোক।

মেফিস্টো : খুব করেছ, বেশ করেছ, কাজটা চমৎকার
ভাল পূর্গিসের রজনীতে বখশিস্ পাবে তার।

মেফিস্টো : পেছনে চেয়ো না ফিরে, সঙ্গে ছুটে এস
দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাসের তীব্র প্রয়োজন

যেন মিশে শোণিতে শিরায় শরীর মস্তক মনে
তীক্ষ্ণশক্তি তেজস্ক আরক।
তারপরে শিক্ষা দেব কারে বলে বাঁচা
কিভাবে নারীর নামে
রাজোচিত বিলাস ব্যসন
অঙ্গে অঙ্গে অনঙ্গের জাগে পদধ্বনি।

ফাউস্ট : আহা আমাকে দেখতে দাও আরো একবার
আরশিতলে সঙ্গোপন সুন্দরী আমার।

মেফিস্টো : দেরি নেই আর
চর্মচক্ষে সুন্দরীরে দেখবে এবার
(একপাশে মুখ ফিরিয়ে)
যে বস্তু গিয়েছে সখা উদরে তোমার
তার বলে মনে হবে সব বারাঙ্গনা
অপূর্ব সুষমা মাখা ট্রয়ের হেলেন।

সপ্তম দৃশ্য

রাজপথ

[প্রথমে ফাউস্ট, পেছনে মার্গারিটা]

ফাউস্ট : সুন্দরী মহিলা যদি দিন অনুমতি
দু'বাহু বাড়িয়ে দেই
সঙ্গ দিয়ে গৃহদ্বারে পৌঁছে দিতে পারি।

মার্গারিটা : সুন্দরী নহি তো আমি, মহিলাও নই
পথ চিনে গৃহে আমি যেতে পারি নিজে।

ফাউস্ট : হায় খোদা, গেল পথে বালা এক অনিন্দ্য সুন্দরী
জীবনে দেখিনি, রূপ এত সুকুমার।
কর্তব্যে সনিষ্ঠ কন্যা মূর্তিমতী জাগ্রত কল্যাণী
ললিত শালীন কিন্তু অঙ্গে অঙ্গে স্ফূর্তি লহরে
গণ্ডের কোমল আভা ঠোঁটের লালিমা
চিত্তে রবে জাগরুক তুচ্ছ করে কালের শাসন।
নতমুখী দৃষ্টি তার কোমল গভীর
যখন আমার চোখে চোখ রেখে স্থির
সরল সাহসে বালা বলেছে বচন
মনে হল মূর্ত হল মন্ত্রপূত সুন্দর যৌবন।
শোন এই কন্যা তাকে— তুমি নিজে এনে দাও।

মেফিস্টো : কোথা কন্যা, কন্যা কোথা?

ফাউস্ট : রাজপথ আলো করে এই মাত্র গেল।

মেফিস্টো : তাই বল
গিয়েছিল পুরুত কাছে করতে পাপের স্বীকারোক্তি
পাপ নেই তো কোন বালার তাই তো অল্পে পেল মুক্তি।
শুনেছি বটে সকল কিছু ঠায় দাঁড়িয়ে একটি টেরে
এ অমলিন বালিকারে শয়তান আসর করতে নারে।

ফাউস্ট : মনে হয়, চতুর্দশ বর্ষ তার হয়েছে বয়স।

মেফিস্টো : কামাসক্ত লোকের মত
কইলেন কথা বটে

সকল পুষ্পে তার দাবিটি
যেন এমন ঘটে।
কাননেতে আছে কি নেই
সেই কথাটি ভুলে
মান সম্মান লুটিয়ে দিয়ে
ছিঁড়তে সে চায় ফুলে।
শুনুন মশায় ঢের হয়েছে
আমার কথা শুনুন
সবখানেতে কাজ দেয় না
পিরিত করার কানুন।

ফাউস্ট : পণ্ডিত মশায় দোহাই তোমার, থাম এবার দেখি
থামাও তোমার নীতিকথার স্বয়ং চলা ঢেঁকি
সহজ কথা সহজ করে বলেই রাখি শোন
রাত বারোটার মধ্যে তারে বাহুপাশে আন
তা না হলে জেনে রেখ রাত বারোটার পরে
তোমার আমার চুক্তিনামা বাতিল নেবে ধরে।

মেফিস্টো : এমন একটি জটিল কাজে
পনেরো দিন সময়
কমসে কম দিতেই হবে
তার আগে তো নয়।
কখন কোথায় ধরতে হবে
ফ্যাকড়া আছে ম্যালা।

ফাউস্ট : যদি পাই কন্যা কাছে আর সপ্ত ঘটিকা সময়
সমস্ত আপত্তি তার ফুৎকারে উড়িয়ে
জয় করে নিতে পারি
শয়তানের সহায়তা কিসে প্রয়োজন?

মেফিস্টো : প্যারিসবাসী নাগর পারে এমন কথা বলতে
আমি বলি একটুখানি বুঝেসুজে চলতে
আচমকা ফুল ছিঁড়ে নিয়ে নষ্ট করে লাভ কি
ভাল করে ভজান মজান বোঝান প্রেমের ভাব কি
ইতালির ঘোড়া যেমন সওয়ার নেয়ার আগে
শেখায় পড়ায়, তেমন করে মনটি বালার নিয়ে এস বাগে।

ফাউস্ট : অন্তরের প্রেমতৃষ্ণা এত তীব্র এতই প্রবল
তার কাছে সবকিছু মনে হয় মূল্যমানহীন।

মেফিস্টো : ধৈর্য যদি থাকে ঘটে
একটুখানি ধরুন

বলে ফেলি কাজের কথা
মনে আমল করুন।
ঝড়ের বেগে এ বালারে
করতে গেলে জয়
বলছি আমি ঘটে যাবে
তুমুল বিপর্যয়।
তার চাইতে ঠাণ্ডা মাথায়
কাজের ছকটি পেতে
ধীরে চলা অনেক ভাল
কেল্লা হবে ফতে।

ফাউস্ট : এনে দাও অপ্সরীর কোন অভিজ্ঞান
তার বক্ষস্পর্শ ধন্য কোন উত্তরীয়
কিংবা মোজার বন্ধনী যা দেখে প্রেমের অগ্নি থাকে সজীবন
অথবা নিয়েই চল তার নিকেতনে।

মেফিস্টো : তোমার প্রেমের আকুল জ্বর বক্ষ করে দহন।
ঘোর বেগতিক পরিস্থিতি যায় না তারে সহন
আজকে তোমায় নিয়েই যাব বিলম্বে কাজ নেই
হাজির হবে শয়নকক্ষে অদ্য দিবসেই।

ফাউস্ট : আবার দেখব তাকে
পাব তবে বাহুর বন্ধনে?

মেফিস্টো : তড়িঘড়ি ভাল নয়,
এই বেলাতে গেছে বালা প্রতিবেশীর ঘরে
মধুর সময় কাটিয়ে দেবে এটা ওটা করে
ঘেরাণ নেবে যত ইচ্ছা আশ মিটিয়ে মনের
দেখবে স্বপন, শরীরখানি চাটছে যেন কনের।

ফাউস্ট : চল তবে যাত্রা করি।

মেফিস্টো : না না আজো হয়নি সময়।

ফাউস্ট : মহামূল্য উপহার রাখবে প্রস্তুত [প্রস্থান]

মেফিস্টো : এত শীঘ্র উপহার!
বালিকা মজবে প্রেমে কোন সন্দ নাই।
চিনি আমি বহুস্থান, পোঁতা আছে থরে থরে
প্রাচীন সম্পদ, যাই তো আনিগে তুলে
রত্ন আভরণ।

অষ্টম দৃশ্য

সন্ধ্যা

[একটি নিখুঁত পরিপাটি কক্ষ]

মার্গারিটা : (চুলের বিনুনি পাকাতে পাকাতে)
যদি জানতাম পরিচয়, যে বলেছে রাজপথে অযাচিত কথা
সুন্দর স্বচ্ছন্দ ভঙ্গি শোভন বিনয়।
উঁচু কূলে জন্ম তার হবে সুনিশ্চয়
এই সত্য আছে তার ললাটে লিখিত
নইলে কেমনে ধরে এমন সাহস।

[প্রস্থান]

মেফিস্টো : ভেতরে প্রবেশ কর ধীরে, কিন্তু
রবে হুঁশিয়ার।

ফাউস্ট : [মুহূর্তের নীরবতার পর]
হয়েছে, হয়েছে ঢের, নিকালো এখন
পরে দেখা হবে।

মেফিস্টো : [চারদিক ভাল করে দেখে]
সব মেয়ে পরিপাটি থাকে না এমন।

ফাউস্ট : সুস্বাগত হে গোধূলি বুনে যাও মায়াজাল
এই সহজ-সরল কক্ষে কর তুমি শান্ত রশ্মিপাত।
হৃদয়ে ঘনিয়ে আন তিক্ত কিন্তু মধুময় ব্যথা
পুষ্পের শিশিরসম অনাঘ্রাত প্রেম যার
সবকিছু করে আয়ুষ্মান, সমস্ত ইন্দ্রিয়গ্রামে নামে পরিতোষ
তেমনি— এখানে নিটোল শান্তি করে অবস্থান
ঝড়ঝঞ্ঝা হতে দূরে এইখানে সন্তোষ বিরাজে
নির্মলতা অকিঞ্চনে করেছে শোভন,
অপার্থিব স্নিগ্ধ সুখে গরীয়ান সরল কুটির।
[ফাউস্ট শয্যাপাশে চামড়ার আরাম কেদারায় উপবেশন করল]
সুপ্রাচীন হে আসন এখন গ্রহণ কর আমার শরীর।

মুগ্ধ বাহু দিয়ে বংশ বংশ ধরে
কি আনন্দ কি বিষাদে ব্যগ্রবাহু ভরে
যে তুমি নিয়েছ কোলে হৃদয়ের ঈশ্বরীয় পূর্ব পুরুষেরে।
শিশু দলে যার পাশে বসে
খেলাধূলা সব ভুলে করেছে সায়ংবেলা আনন্দকূজন।
বোধ করি প্রেয়সী আমার এইখানে বসে
পিতামহ হস্ত হতে উৎসবের উপহার
নরম তুলতুলে হাতে করেছে গ্রহণ।
জীর্ণশীর্ণ প্রবীণ প্রাচীন হাতে করেছে পরশ
আরক্তিম টেপাটেপা গণ্ড দুটি তার।
হে বালিকা তোমার মাধুরী সর্বসত্তা দিয়ে আমি করি অনুভব
তোমার বৈভব কিন্তু সুশৃঙ্খল অন্তরের নিখুঁত প্রকাশ
গৃহকর্মে সিদ্ধ শিল্পী থরেথরে ফুটে আছে সেই পরিচয়
সর্বগৃহে পরিব্যাপ্ত স্নিগ্ধ মধুরতা
নারীকুলে এ গরব তুলনা রহিত।
পরিচ্ছন্ন পরিপাটি সাজানো গোছানো সব বসন ভূষণ
ভূমিতলে থরথরে বালুকা ছড়ানো
তোমার হাতের স্পর্শে স্বর্গ এসে এইখানে পেতেছে নিবাস
স্বর্গের এক চ্যুত অংশে তোমাদের নির্জন কুটির।
[শয্যাবরণ সরিয়ে]
আনন্দে কম্পন জাগে বহে দীর্ঘশ্বাস
সুখ স্বপ্নে মগ্ন হয়ে পার করে দিতে পারি সমস্ত প্রহর।
চূর্ণ চূর্ণ স্বপ্নরেণু দিয়ে নিসর্গ গড়েছে এক দেববালা
এইখানে শৈশবে করেছে খেলা, পেতেছে শয়ন
ক্ষুদ্রবক্ষে প্রাণের স্পন্দন
বেজেছে জীবনতরু বিকাশের ছন্দে।
কোন্ সে রহস্য গড়েছে অদৃশ্য হাতে
অনিন্দ্য সুন্দর কান্তি মূরতি উজ্জ্বল
কর তুমি কিসের সন্ধান
কি কারণে আলোড়িত বিলোড়িত প্রাণ
কিসের এমন দুঃখ পোড়ায় অন্তর?
হায়রে ফাউস্ট তোমাকে আমি তো আর চিনতে পারি না।
কিরকম মন্ত্রমুগ্ধ পরিবেশ
খেয়ালে এসেছি আমি ক্ষণিকের প্রমোদের মোহে
কিন্তু প্রকৃত প্রেমের শান্তি প্রাণ ছুঁয়ে গেল
তাহলে আমরা সবে হাওয়ার অধীন।

এইক্ষণে যদি করে কন্যা তার কুটিরে প্রবেশ
অনুতাপ শিখা ঝলকে কি জন্মাবে না অন্তরে তোমার?
পণ্ডিত মশায় কলঙ্কিত পাপমুখ লুকাবে কোথায়
শরমে মরমে মরে তার পায়ে হবে অবনত?

মেফিস্টো : [ভেতরে প্রবেশ করে]
জলদি চল, গলিমুখে এসে গেছে।

ফাউস্ট : তুমি যাও, আমি থেকে যাব।

মেফিস্টো : এই যে দেখ নতুন বাক্স গয়না ভরা ভারি
সুযোগ মত হরণ করে আনলাম তাড়াতাড়ি।
দেরাজ খুলে রাখবে এটা চোখে যেন পড়ে
এমন জিনিস ভর্তি কৌটা মস্তক যাবে ঘুরে।
আরেক মেয়ের মন ভুলাতে হাত করেছি এসব অলঙ্কার
মেয়েরা সব একই রকম দুঃখ কিসের আর।

ফাউস্ট : এখন আমি কি করি?

মেফিস্টো : গোল গোল চোখ পাকিয়ে দেখছ তুমি কি
অলঙ্কার সব হজম করার নতুন চালাকি?
তাই যদি হয় মনের বাঞ্ছা লোভটি করুন দমন
কষ্ট আমার বৃথাই যাবে হয় না যেন এমন।
মাথা চুলকে ভাবতে হচ্ছে কেমন ধারা কাণ্ড
আমার শ্রমে ভরবে তোমার লোভ লালসার ভাণ্ড।
[ফাউস্ট তালা খুলে অলঙ্কারের বাক্সটি রেখে পুনরায় তালা দিল]
জলদি চল
জানি মশায় মনের ভেতর খাবি খাচ্ছে ভাবনাখানা কি
পেতেই চাহেন ডাগর ডোগর ফর্সা সুঠাম আস্ত লাড়কি।
কিন্তু গুরুমশায় সেজে যদি রসায়ন আর পদার্থ বিজ্ঞান
শ্রেণীকক্ষে ঠায় দাঁড়িয়ে পড়িয়ে যেতে চান
ভাববে লোকে বিজ্ঞান দুটি দাঁড়িয়ে পায়ের কাছে
মন ভোলাবার জন্য শুধু চোখ মারিতে আছে।
চল, চল, চল তাড়াতাড়ি।

[প্রস্থান]

মার্গারিটা : এখানে গুমোট বড় ভ্যাপসা গরম
[জানালা খুলে দিল]
বাইরে তো হাওয়া করে দিব্যি চলাচল
আচ্ছন্ন থমথমে ভাব বড় বেশি ভয় ভয় করে।
যদি ফিরে মা জননী বড় ভাল হয়
অতি অল্পে শঙ্কা জাগে, প্রাণে বাগ নাহি মানে

বুদ্ধিহীন হই বটে বুঝি সে কারণে।
[কাপড় ছাড়তে ছাড়তে গান গাইতে লাগল]
থুল দেশে এক ছিলেন রাজা
বড্ড চমৎকার
মৃত্যুকালে প্রেয়সী তার
স্বর্ণপাত্র দিলেন উপহার
পাত্রটিকে রাজা এমন
রাখতেন যতন করে
ঠোঁট লাগালে দুই নয়নে
অশ্রু যেত ভরে।
মরণকাল যখন এল
থুলের দেশের রাজার
বিলিয়ে দিলেন বিত্তবিভব
হীরা মানিক হাজার
সেই সে সোনার পাত্রটিকে
দু'হাত দিয়ে ধরে
ঝড়ের দিনের বাতির মত
রাখলেন আড়াল করে।
তারপরেতে ভোজের সভা
ডাকলেন রাজা শেষে
উজির নাজির সামন্ত আর
পাইক পেয়াদা এসে
মনের সুখে খেয়ে দেয়ে
করল পথে মেলা
কেল্লার ভেতর বসে রাজা
অস্ত সায়ংবেলা
সোনার পাত্রে মুখ ঠেকালেন
প্রিয়ার উপহার
দু'চোখ বুজে পান করল
সরস উপচার।
তারপরে হায় উদাস চোখে
সুনীল সাগর জলে
হাত বাড়িয়ে সোনার পাত্র
দিলেন জোরে ফেলে।
ঝিলমিলিয়ে সাগর জলে
পাত্র দিল ডুব

সাঙ্গ হল জীবনলীলা
রাজা হলেন চুপ।

মার্গারিটা : কোথা হতে এল এই মনোরম কৌটা দেরাজে আমার
মনে আছে ঠিক ঠিক চাবি দিয়ে বন্ধ করে গেছি।
হতে পারে মা জননী কারো কাছ থেকে
রেখেছেন এই কৌটা ঋণের জামিন।
ওমা একি সুতায় ঝুলন্ত দেখি অতি ছোট্ট চাবি
নিজ হাতে খুলে করি রহস্যের শেষ।
হায় খোদা, এ যে দেখি বহুমূল্য রত্ন আভরণ
এত দামি অলঙ্কার জীবনে দেখিনি।
কোন শ্রেষ্ঠীপত্নী কোন উৎসব আসরে
এই মণিরত্ন যদি করে পরিধান
তাহলে মানাবে বটে।
এই গজমোতি হার যদি গলায় দুলাই
তাহলে আমাকে তবে দেখাবে সুন্দর?
কিন্তু কার হতে পারে এত সব মহামূল্য রত্ন অলঙ্কার?
[সে কিছু অলঙ্কার পরিধান করে আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়াল]
যদি হত এই দুটি কানপাশা আমার
তাহলে দেখাত কিন্তু ভারি চমৎকার।
কি লাভ সুন্দরী হয়ে
দরিদ্রকে পোছে কোন্‌জন?
জগৎ সোনার বশ, সোনা করে মানুষের হৃদয় শাসন;
আত্মনিগ্রহ ভরা পরিচিত এই প্রবচন
দরিদ্রকে বড় দুঃখে মেনে নিতে হয়।

নবম দৃশ্য

ভ্রমণপথ

[গভীর চিন্তামগ্ন ফাউস্ট একা একা পায়চারি করছে,
মেফিস্টোফেলিস এসে তার সাথে যোগ দিল]

মেফিস্টো	:	অপচিত প্রেমের নামে শপথ আমার, নরকে যে অগ্নি জ্বলে তার নামে আমার শপথ আরো যদি ভয়ঙ্কর সর্বনাশা কোন কিছু থাকে তার নামে কিরে কেটে দেব অভিশাপ।
ফাউস্ট	:	কিসের এত হম্বিতম্বি কেন মুখ ব্যাজার কখনো তো তোমার এমন রূপ দেখিনি ক্ষ্যাপার।
মেফিস্টো	:	বলতাম শয়তান আমাকে নিক কিন্তু উপায় কি বল স্বয়ং শয়তান আমি।
ফাউস্ট	:	করছ নাকি নাটক কোন নাকি তুমি হত কাণ্ডজ্ঞান ক্ষ্যাপার মত বলে যাচ্ছ বেফাঁস উপাখ্যান।
মেফিস্টো	:	যেসব গয়নাগাটি মার্গারেটকে দিলাম উপহার এক পাদ্রী এসে বচন ঝেড়ে করলে সব সাবাড়। জিনিসগুলো পড়ে গেল মায়ের নেক নজরে বিবেকে তার ভয় জন্মাল বুকটি ধড়ফড় করে। ঘেরাণ শোঁকার স্বভাবটি তার ক্ষুরের চেয়ে ধারাল বাইবেল ধরে বলতে পারে কোন্ জিনিসটি হালাল। চেয়ার টেবিল খাট বিছানা শুঁকে ভালমতন বাক্স খুলে দেখল চেয়ে সাধের মাণিক রতন। সারা অঙ্গে বুড়ির কেমন জন্ম নিল তাপ এক নিমেষে বুঝে গেল এর ভেতরেই পাপ। বলল ডেকে কন্যাটি শোন্ পাপের সোনাদানা শরীর স্বাস্থ্য নষ্ট করে বিবেক করে কাণা। এসব দেব মা মেরীকে স্বর্গ হতে মা সুধা আশীষ পাঠিয়ে দেব মিথ্যা হবে না।

গ্রেচেন শুনে মায়ের কথা হাসল বিরস মতন
ভাবল উপহারের কর্তাটির পাপ কি আছে এমন।
সয়ে গেল মায়ের ভীষণ পাপ শুঁকবার বাতিক
যে দেয় এমন উজার করে সে কি হবে নাস্তিক?
তড়িঘড়ি পুরোত ডেকে বলল একে একে
পাদ্রী বেটা এক নিমেষে ব্যাপার গেল বুঝে।
ভেবে নিল পাউরুটির কোন দিকেতে মাখন মাখানো
তারপরেতে শুরু করল লম্বা লম্বা বচন হাঁকানো।
বলল ওগো মেয়ে তুমি সত্য সঠিক প্রভুর পথে আছ
লোভ-লালসা বলি দিয়ে নতুন করে বাঁচ।
গির্জা মাগো বইতে পারে সকল রকম ভার
জমি জিরাত সোনা দানা লম্বা উদর তার।
জেনে রেখ মা জননী পাপের সম্পদ যত
গির্জার পেট হজম করে অমন কত শত।

ফাউস্ট : একথা অধিক সত্য
রাজা আর ইহুদির বেলায়।

মেফিস্টো : হার নিল বালা নিল নিল কানের পাশা
বাজার করে নারী যেন ফিরে গেল বাসা
যাবার বেলা ঠাণ্ডা গলায় দিল ধন্যবাদ
থালা ভর্তি বাদাম যেন জুটল পরসাদ।
বলে গেল পরলোকে ঝুলছে পুরস্কার
সেই আশাতে পুণ্যবতীর সুখ ধরে না আর।

ফাউস্ট : আর কি হল মার্গারিটার?

মেফিস্টো : বিরস মুখে বসে আছে অবসন্ন মন
সোনার শোকে বক্ষে তার জাগছে আলোড়ন
তারো চেয়ে ভাবছে—এসব কে করেছে দান।

ফাউস্ট : তুচ্ছ অলঙ্কার তার ঘটাবে বিষাদ
এই দুঃখ সইতে পারিনে
যাও, তুমি দ্রুতগতি নিয়ে এস অন্য অলঙ্কার
পূর্বের প্রদত্ত বস্তু তার কাছে মানে যেন হার।

মেফিস্টো : কর্তার চোখে সকল কিছু
ছেলের হাতের মোয়া।

ফাউস্ট : নির্দেশ মত কর্ম কর
যাও না তার প্রতিবেশীর বাড়ি
শয়তানি নয়, ভুজুং ভাজুং নয়, কর্ম কর ভদ্রলোকের মত
আরেকটা কৌটার জন্য চেষ্টায় হও রত।

মেফিস্টো : জ্বী হুজুর, আদেশ নিলাম শিরোধার্য করে
[ফাউস্টের প্রস্থান]
প্রেমে পড়া বোকারাতো হাওয়ায় উড়াল দিয়ে
তারাখচা আকাশে দেয় আনন্দে ফুৎকার
যেন প্রিয়া মনের সুখে করে দিন গুজার।

দশম দৃশ্য

প্রতিবেশীর বাড়ি

[মার্থা একাকী]

মার্থা : [একাকী] আল্লা মেহেরবান তুমি স্বামী রাখ সহি সালামতে
দেশান্তরে গেলেন তিনি একেলা ফেলি পথে।
মনের সুখে মারতেন তিনি নালিশ করি নাই
এখন খড়ের গাদায় বসে একা দুঃখের গান গাই
সাধ্যমত তার সুখেতে করেছি আত্মদান
পরাণপতির বিচ্ছেদে হায় পোড়াচ্ছে পরাণ।

[কাঁদতে থাকল]

মনে হয় মরেই গেছে দূরান্তরের পথে
প্রমাণ পত্রখানা যদি পেতাম কোনমতে।

মার্গারিটা : মার্থা খালা, মার্থা খালা!

মার্থা : কি হয়েছে কন্যা আমার?

মার্গারিটা : খালা আমি ভয়ে মরি মাথা ঘুরে আসে
আরেকটা গয়নার কৌটা দেখি ঘরে এসে;
আবলুস কাঠের দেরাজ পরে দেখতে পেলাম আমি
পান্না চুনি মুক্তা ভরা আগের চেয়ে দামি।

মার্থা : মায়ের কাছে বলবি নে লো, তাহলেই গেছে
পাদ্রী বেটা কেড়ে নিতে আগ বাড়িয়ে আছে।

মার্গারিটা : দেখ দেখি নজর করে কেমন সুন্দর।

মার্থা : ভাগ্যবতী মেয়ে বটে তুমি।

মার্গারিটা : এসব পরে শহরে আর গির্জাতে রোববারে
পারবনাকো যেতে আহা লোকচক্ষুর ধারে।

মার্থা : মাঝে মাঝে আমার ঘরে এসে
গয়নাগুলো পরে দেখ
দেখবে না কেউ মোটে।
আয়নাতে মুখ দেখবে যখন সুখে আত্মহারা
তোমার সুখে খালার সুখ জাগবে পাগলপারা।

ছুটির দিনে কিংবা কোন পূজাপার্বণ এলে
একেক পদ বের করে ঝুলিয়ে দিয়ো গলে
প্রথমে মুক্তার দুল তার পরেতে গজমোতির হার
মা যদি চায় জানতে, একটা কিছু জবাব দেবে তার।

মার্গারিটা : কিন্তু দুটি এমন কৌটা এল আমার ঘরে
তার ভেতরে নিশ্চয়ই কোন গলদ বিরাজ করে।
[দরজায় টোকা পড়ল]
মনে হয় মা এসেছে দ্বারে টোকা মারে।

মার্থা : [দরজার ফাঁক দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখে]
ইতিপূর্বে দেখি নাই এমন এক লোক,
ঘরে প্রবেশ করুন।

মেফিস্টো : ধন্যবাদ, বহু মেহেরবাণী—
কষ্ট দিলাম, তাই নিতান্ত দুঃখিত আমি
[মার্গারিটাকে দেখে নকল সম্ভ্রম দেখানোর ভান করে]
মার্থা স্বের্ডলাইনের সাথে কথা বলতে চাই।

মার্থা : আমার নাম মার্থা, বলুন কি চাই।

মেফিস্টো : আপনাকে পেয়ে গেছি ভাগ্য বলে মানি।
উঁচুকুলজাতা এই মহিলার বিরক্তিভাজন
যেহেতু হয়েছি অমি, তাই ক্ষমা চাই
বরং বিকালে এসে করব আলাপ।

মার্থা : [উচ্চস্বরে] ওমা হেসে মরি, তোমাকে নিয়েছে ধরে
উঁচুকুলজাতা কোন সম্ভ্রান্ত মহিলা।

মার্গারিটা : নিতান্তই দরিদ্র বালিকা আমি
ভদ্রলোক অতি সদাশয়
এই অলংকার-রত্ন কিছুই আমার নয়।

মেফিস্টো : রত্ন নয়, মণি নয়, নয় অলংকার
বালিকার মধ্যে সুপ্ত আশ্চর্য ঝঙ্কার।
উজ্জ্বল হৃদয়হরা অপূর্ব উদ্ভাস
যেজন নিকটে আসে বাড়ায় সন্তোষ।

মার্থা : বলুন, কোন্ কাজে এ মোকামে আপনি এলেন।

মেফিস্টো : যদি দিতে পারতাম আপনাকে কুশল সংবাদ
কিন্তু সে দোষ আমার নয়, অগ্রে চাই ক্ষমা।
আপনর স্বামী নেই, গেছে পরলোকে,
দিতে হল কু-বারতা—

মার্থা : মারা গেছে স্বামীধন, কোথায় কখন?
কি নিয়ে বাঁচব তবে, মাথা ঘোরে
ওলো আমায় ধর।

মার্গারিটা : পড়শীখালা দুঃখে এমন হয়ো না উতলা।
মেফিস্টো : শুনুন তবে মর্মান্তিক বিষয়টির
সঠিক বিবরণ।
মার্থা : আ-হা যদি জানতাম আগে ভাঙবে এমন হৃদয়
প্রাণের ভেতর রেখেই দিতাম প্রেম পিরিতি প্রণয়।
মেফিস্টো : আনন্দের অপর পৃষ্ঠে দুঃখ থাকে যথারীতি
এই হল জীবনের সনাতন রীতি।
মার্থা : দয়া করে বলুন তার অন্তিম সংবাদ।
মেফিস্টো : সেন্ট এন্টনির গির্জার চত্বরে
পাদুয়া শহরে হয়েছে তার কবর
দোয়া দরুদ শাস্ত্র পাঠে পবিত্রিত কবরগাহের মাটি
তার ভেতরে শান্তিশয্যায় ঘুমায় পরিপাটি।
মার্থা : আমাকে বলার মত কোন বার্তা নাই বুঝি তার।
মেফিস্টো : বটে, একটা আছে সনির্বন্ধ অনুরোধ তার
সদা প্রভুর নাম জপাবেন মোট তিন শ' বার
এই তো শেষ আর কিছু তো বলার আমার নেই।
মার্থা : আর কিছু নাই যেমন ধরুন মুদ্রা কিংবা আংটি
দিনমজুরও ঝুলির ভেতর লুকিয়ে রাখে যত্নে
খোয়ায় না, যেইখানে যায় চোখে চোখে রাখে
নিদানকালে উপাস দেয়, ভিক্ষা করে থাকে।
মেফিস্টো : ভদ্রে, আফশোসের অন্ত তো নেই বটে
সত্য বলি খরুচে হাতও ছিল না তার মোটে।
পাপের জন্য কতই না সে করল পরিতাপ
তারই সঙ্গে যুক্ত হল ভাগ্যের অভিশাপ।
মার্গারিটা : হায় রে মানুষ কত শত দুঃখ পেয়ে মরে
স্মরণ করব নামটি তার প্রার্থনার কালে।
মেফিস্টো : সুদর্শনে সুন্দরী লো বিয়ের কথা ভাবুন।
মার্গারিটা : আমার বিয়ে!
সে তো হবে অনেক বছর পর।
মেফিস্টো : না হয় স্বামী নাইবা হল প্রেমিকে কী দোষ
স্বর্গ লোকের অপার দয়ার মধুরতম দান
বাসবে ভাল, শেখাবে প্রেম, এমন তো চায় প্রাণ।
মার্গারিটা : মহাশয় এটা নয় আমাদের রীতি।
মেফিস্টো : হোক বা না হোক এরকম তো ঘটে।
মার্থা : বাদ বাকি সব কথা কন
যেন শান্ত হয় বড় সন্তাপিত মন।

মেফিস্টো : জীর্ণ পচা নোংরা সেই তৃণশয্যা পাশে ছিলাম আমি
সৎ খ্রিস্টানের মত তার হয়েছে মরণ।
বিবেক ব্যথার ভারে করেছে চিৎকার
বলত আমাকে আমার বড় ঘেন্না হয়
পত্নী, পেশা, গৃহস্থালি সব ছেড়ে দিয়ে
যে পাপ করেছি আমি দহিছে অন্তর
যদি পাই তার ক্ষমা তবে হবে শান্তিতে মরণ।

মার্থা : হায় স্বামী, ক্ষমা সে তো কবে করে দিছি।

মেফিস্টো : বলে গেছে দোষ আমার
কিন্তু তার দোষ পরিমাণে বেশি।

মার্থা : মরণকালে মিন্‌সে এমন মিছা কথা কইল?

মেফিস্টো : আমি যদি বুঝি কিছু কিছু লোকের ধরন ধারণ
মৃত্যুকালে উল্টাসিধা ভাবত অকারণ
বলত আনন্দ বা ফূর্তির সময় পাইনি কোনকালে
স্ত্রীর গর্ভে জন্ম নিল একপাল ছেলেপুলে
তাদের মুখে অন্ন দিতে হত জান কাবার
এমন করে হত আমার দুঃখের দিন গুজার।

মার্থা পোড়ামুখো, মিনসে এসব বলল কেমন করে
এত সেবা, এত যত্ন, উদয়াস্ত এত খাটাখাটি
এখন দেখছি ষোলআনা মাটি।

মেফিস্টো : সত্য নয় আপনাকে সে ভাবত ভাল রকম।
স্ত্রীপুত্রের কথা ভেবে করত মোনাজাত
প্রার্থনা তার কবুল হল খুলে গেল বরাত।
মাল্টা ছেড়ে যাওয়ার পরে লাগল পালে বাতাস।
তুর্কি রাজার ধন দওলত ভরা আস্ত জাহাজ
তাড়িয়ে নিয়ে করল সবে ভালমত আটক;
তারপরেতে উঠল জমে লুণ্ঠন করার নাটক।
সাহসের যা পুরস্কার পড়ল সবার ভাগে
সেও পেল অনেক কিছু একটি মোটা দাগে।

মার্থা : কোথায়? মাটির তলে লুক্কায়িত
নাকি অন্য কোথা?

মেফিস্টো : সব কি জানি তবে ইতিউতি লোকের মুখে শোনা
নেপলের এক নর্তকী তার মন করেছে কাণা।
বন্ধু সবাই যখন তারে ফেলেই গেল চলে
সুন্দরীটির ঘাঘরা ধরে রইল পড়ে ঝুলে।
সে নিষ্ঠার সাথে সেবাযত্ন করল এমন করে
মৃত্যুর দিনেও সেসব কথা বলত বারে বারে।

মার্থা : বেঈমান, দারাপুত্রের সম্পদের তস্কর,
এত দুঃখ তবু গেল না তার স্বভাবের নষ্টামি।

মেফিস্টো : বুঝলেন এখন কি কারণে মৃত্যু হল তার
আমি যদি হতাম পত্নী-স্থানে আপনার
বৈধব্যের প্রথম সাল না হতেই শেষ
মনের মত প্রেমিকপুরুষ খুঁজে নিতাম বেশ।

মার্থা : কি বললেন?
দিবানিশি যদি আমি খুঁজি দুনিয়ায়
পূর্ব স্বামীর মত এমন মানুষ পাওয়া দায়।
কোন নারী পায়নি এমন সরল মিষ্টি বোকা
দেশ বিদেশে ঘোরার স্বভাবটি তার ছিল একঝোঁকা।
ভিন্ন দেশের নারী আর ভিন্ন দেশের মদ
হতভাগার তামাম জীবন করেছে বরবাদ।

মেফিস্টো : বেশ তো হয় যদি, পদে পদে খোঁজে কেউ সীমা ভাঙ্গার দোষ
সমান নিয়ম দু'জনেরই তাতে কিসের রোষ।
ইচ্ছা হচ্ছে এই মুহূর্তে আংটি কিনে এনে
আপনাকে নিকে করি আনন্দিত মনে।

মার্থা : হাঁ মহাশয় ঠাট্টা করেন বুঝি?

মেফিস্টো : [একপাশে ফিরে]
পালানো উত্তম, যদি অধিক এগুই
শয়তান পড়বে ধরা আপন কথায়।
[কোমলভাবে, মার্গারিটার প্রতি]
আকাঙ্ক্ষার ঝড়, সুন্দরী কাঁপায়নি
আপনার গভীর অন্তর?

মার্গারিটা : মহাশয়, বাক্যটির কীবা অর্থ হয়?

মেফিস্টো : [একপাশে ফিরে] নিষ্পাপ কলুষহীন মাধুরী মাখানো মেয়ে
তাহলে বিদায় হই ভদ্র মহিলারা।

মার্থা : দাঁড়ান ক্ষণিক, আমার প্রমাণ কই।
কখন মরেছে সে, কবর কোথায়
বিধিমত প্রমাণপত্রে সাক্ষ্য থাকা চাই।

মেফিস্টো : উপযুক্ত সাক্ষী দুজন হলে
সাপ্তাহিকে ছাপা হলে তবে তো রেহাই।
আদালতে দাখিল করা হলফনামার বলে
এক নিমেষে প্যাঁচালো এই মামলা হত খতম
আমার এক বন্ধু আছে বোঝে রকমসকম
যদি বলেন আনি তাকে...।

মার্থা : আপনার বহু মেহেরবাণী।

মেফিস্টো : এই তন্বী তরুণী যদি থাকে উপস্থিত বড় চমৎকার
সাহসী তরুণ সে বহুদেশ দেশান্তরে করেছে ভ্রমণ
এবং বিশদ জানে কি দিলে সন্তুষ্ট হয় রমণীর মন।

মার্গারিটা : না না মহাশয়
আমি লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশে যাব।

মেফিস্টো : সে যদি মুকুটধারী মহারাজও হয়
আপনার লজ্জা পাওয়া উচিত না হয়।

মার্থা : তাহলে অদ্যরাতে ঘরের পেছনে আছে যেই কুঞ্জবন
সেইখানে অপেক্ষায় রব বিলক্ষণ।

একাদশ দৃশ্য

একটি রাজপথ

[ফাউস্ট এবং মেফিস্টোফেলিসের পরস্পর সাক্ষাৎ]

ফাউস্ট : কি সংবাদ, কাজকাম কদ্দুর এগুলো?
মেফিস্টো : সাবাশ, তা নইলে প্রেমিক কেমন
এই নাও সুসংবাদ, সপ্তাহ কিংবা তারো আগে
এই কন্যা ধরে নাও অবশ্য তোমার।
আজ রাতে পড়শি মার্থার ঘরে হবে মোলাকাত
মার্থা কুটুনীর কাজ করবে নিশ্চয়।
ফাউস্ট : চমৎকার।
মেফিস্টো : পরিবর্তে জেনে রেখ তার
কিছু কাজ করতে হবে তোমার আমার।
ফাউস্ট : কিছুর বদলে কিছু এ তো নিয়ম।
মেফিস্টো : হলফ করে বলতে হবে আদালতের ধারে
স্বামী তার মারা গেছে পাদুয়া শহরে
সুপবিত্রিত মৃত্তিকায় হয়েছে কবর।
ফাউস্ট : বাঃ বেশ করেছ, চল এখন
দূরের দেশে যাত্রা শুরু করি।
মেফিস্টো : কেন পণ্ডশ্রম করি
শুধুমাত্র সাক্ষ্য দিলে শেষ হয় কাজ।
ফাউস্ট : এই যদি হয়, তোমার মনের একমাত্র আশ
তবে মহামূল্য সঙ্কল্পের করব সর্বনাশ।
মেফিস্টো : হায়রে আমার ঋষি প্রবর
যেন এই জীবনে মিথ্যা সাক্ষ্য দিচ্ছ প্রথমবার।
খোদা এবং চিরন্তন বিষয়াদির নামে কতবার
বুক ফুলিয়ে পণ্ডিতি বোল ঝেড়েছ বিস্তর।
মানুষ আর মানুষের অন্তর্গূঢ় স্বপ্ন চিন্তার নামে
ঝলমলে সব সংজ্ঞারাজি ছড়িয়ে ডানে বামে;

ঝঙ্কারিত বাক্যস্রোতে করেছ প্রচার
যেন ঋষি মশায় মিথ্যা সাক্ষ্য দিচ্ছ প্রথমবার!
সত্য যদি স্বীকার কর তবে নিজ গহনে তাকাও
শ্বের্ডলাইনের মৃত্যুসংবাদ আদালতে জানাও।
তোমার কেতাবি বোল পণ্ডিতি বাত সত্য যদি হয়,
শ্বের্ডলাইনের মৃত্যুসংবাদ সত্য অবশ্যই।

ফাউস্ট : শুনছি আমি সনাতন কূতার্কিকের
মিথ্যাময় স্বর।

মেফিস্টো : আমার পরামর্শ হল মাথাটা ঠিক রাখ
আগামীদিন যথাসাধ্য করবে তুমি বটে
গ্রেচেনের হৃদয় যদি জয় করতে চাও
প্রেমের নামে আদালতে একটুখানি মিথ্যা কথা কও।

ফাউস্ট : একাগ্র নিষ্ঠায় আমি চালাব প্রয়াস।

মেফিস্টো : মৃত্যুহীন প্রেমের নামে
প্রেমের একমাত্র নির্ধারক অনন্য আকাঙ্ক্ষার নামে করবে শপথ
দেখবে অন্তর থেকে বিচিত্র আভায়
থরেথরে কি আশ্চর্য উদ্ভাসন ঘটে।

ফাউস্ট শোন আমার ফুসফুস ক্লান্ত, জিহ্বাটি কাতর
আমার অন্তরে যে ঝটিকা বিরাজে, তার দ্রুত গতিবেগ
যে আগুন যে উত্তাপ সহকারে আমি খুঁজি
কিন্তু জানতে পারিনে তার রহস্য আবৃত নাম।
একাগ্র অন্তর মনে অবনীমণ্ডল ঘুরে
যদি খুঁজি তার প্রতিকল্প যথাযোগ্য উচ্চতম ধ্বনি।
ঘুরে ঘুরে আসে প্রত্যুত্তর
আমি জ্বলি, আমি জ্বলি অনন্ত দহনে;
তাকে কি বলবে তুমি শূন্যগর্ভ মিথ্যা তর্কজাল
কিংবা শয়তানের নিরেট চাতুরী।

মেফিস্টো : এই তো এসেছ পথে।

ফাউস্ট : অধিক নয়, থাম এবার
বকতে পারিনে আর দাও অবসর।
যার জিভে একসুর ওঠে নানা গ্রামে
আখেরে সেজন জিতে সব কাজ কামে
অর্থহীন বাক্য শুনে বড়ই বিতৃষ্ণ আমি
আপাতত ক্ষান্ত হই, মশায় সালাম।

দ্বাদশ দৃশ্য

মার্থার বাগান

[ফাউস্ট মার্গারিটা]

মার্গারিটা : আপনি উদার চোখে দেখেছেন তাই
যেন আমি অজ্ঞ বলে শরম না পাই
যাঁরা হন পর্যটক জানেন ভালমত
কি করে তুচ্ছকে উচ্চে তোলা যায় মনমত।
অর্থহীন আমার যত গেরস্থালি কথা
কিবা মূল্য তাঁর কাছে যাঁর এমন পূর্ণ অভিজ্ঞতা।

ফাউস্ট একটি মুখের বাক্য নয়নের সরল চাহনি
তার কাছে সমস্ত বিশ্বের জ্ঞান হার মেনে যায়।
[সে মার্গারিটার হাতে চুমু খেল]
এই হাত এত বেশি কদর্য কর্কশ
আপনার চুম্বনযোগ্য নয় কোনমতে
গৃহকর্মে ধুলাবালি কালিঝুলি নিত্য লেগে থাকে
তবুও অনেক কাজ করতে হয় মাকে।
[মার্থা-মেফিস্টোফেলিস]

মার্থা মশায় দেশ-দেশান্তর এমন করে ছুটে চলার নিশা
কখন হবে শেষ।

মেফিস্টো : ছুটে বেড়াই কর্ম আর কর্তব্যের টানে
আরাম-আয়েশ ভরা শহরে যাই যখন
এক আচানক ব্যথার ভারে ব্যথিয়ে ওঠে মন
এত সুখ, এত শান্তি, আর আমাদের এমন মুসাফিরি
ডেরা ভেঙ্গে ছুটতে হয় সয়না মোটে দেরি।

মার্থা : যতদিন যৌবন আছে, দুনিয়াতে
দাপিয়ে চলা মন্দ লাগে না
কিন্তু দিন ফুরালে ওসবে আর তৃপ্তি লাগে না
বৃদ্ধ কুমার থেকে একা কবরপানে চলা
কত দুঃখের সে বিত্তান্ত যায় কি মুখে বলা।

মেফিস্টো : এসব কথা যখন ভাবি শিউরে ওঠে পরাণ।
মার্থা : তাই সময় থাকতে এদিকটাতে নজর দেয়া ভাল।
মার্গারিটা : মনে হয় আপনাকে প্রীতিময় সরল সহজ
দৃষ্টির আড়ালে গেলে আমাকে কি মনে রবে
জ্ঞানেগুণে কতজন আমা হতে বড়
আপনার বন্ধু হবে
তখন কি মনে রবে?
ফাউস্ট : আপাতত যাকে বলে জ্ঞান
অনেক সময়ে তা স্ফীত অহমিকা আর নিছক ছলনা।
মার্গারিটা : কি করে এমন হয়?
ফাউস্ট : নিষ্কলুষ আত্মা কদাচিৎ বোঝে
কি পবিত্র মূল্য ধরে সরলতা তার
সহজ ভালবাসা, নির্মল বিনয় উর্ধ্বমুখী গতি নিয়ে
হয়ে ওঠে আকাশ প্রমাণ
বস্তুত নিসর্গ মাধুরী স্নিগ্ধ অনুপম দান।
মার্গারিটা : আমাকে করবেন মনে অবসরক্ষণে
আমি কিন্তু সর্বক্ষণ আপনাকে মনে করে যাব।
ফাউস্ট : সর্বক্ষণ একা থাক বুঝি?
মার্গারিটা : আমাদের পরিবার ছোট, তবু অন্তহীন কাজ
ধোয়ামোছা ঝাড় দেয়া রন্ধন সেলাই
একা করি নিজ হাতে দাস-দাসী নাই।
সংসারে সকল কাজে জননীর সুতীক্ষ্ণ নজর
আবার হিসাবে কোন নাই নড়চড়।
অতবেশি কড়াকড়ি না হলেও চলে
অনেকের চেয়ে হই আমরা স্বচ্ছল।
বাবা রেখে গেছে কিছু টাকা।
শহরের উপকণ্ঠে বাড়ি ও বাগান।
প্রত্যহ আমার বড় নিরিবিলি শান্ত দিন কাটে।
ভাই আছে বিদেশেতে সৈনিকের কাজে
আমার কনিষ্ঠা ভগ্নি আহা বেঁচে নেই
তার জন্য দুঃখকষ্ট সয়েছি বিস্তর
আনন্দিত মনে শত কষ্ট সইতে আবার
আপত্তি ছিল না মোটে, বড় আদরের বোন
সে ছিল আমার।
ফাউস্ট : সে যদি তোমার মত ছিল
তাহলে তো দেবকন্যা বলব নিশ্চয়।

মার্গারিটা : নিজ হাতে পেলে পুষে সেয়ানা করেছি
ভীষণ ন্যাওটা ছিল বোনটি আমার।
বাবার মৃত্যুর পরে জন্মেছে যখন
ভীষণ শঙ্কায় ছিলাম, এই বুঝি জননীর ঘটবে মরণ।
ক্রমাগত রোগাক্রান্ত শক্তিহীন নীরব নিঃসার
মাসাধিক কাল এইমত কাটিয়েছেন জননী আমার।
প্রাণপণ সেবাযত্ন বলে, ধীরে ধীরে মা-জননী শক্তি পেল ফিরে
এত ভেঙ্গে গেছে দেহ সুতিকার জ্বরে
স্তন্য দেয় সে ক্ষমতা ছিল না একেবারে।
দিনেরাতে চোখে চোখে রেখে সর্বক্ষণ
দুধ জলে বোনটিকে করেছি লালন।
শান্ত শিশুটিকে কোলে নিলে পর
মনে হত নিজ কন্যা একান্ত আমার।
আমার বাহুতে চড়ে হেসেখেলে খেত লুটোপুটি
হস্তপদে খেলে কি যে দুরন্ত হিল্লোলে
বাড়ন্ত দেহটি তার দিয়ে যেত দোল।

ফাউস্ট : দুর্লভ আনন্দ তুমি অবশ্য পেয়েছ।

মার্গারিটা : তবুও কেটেছে বহু কষ্টের সময়,
রাত্রিবেলা ছোটখাটো দোলনাটি তার
রাখতাম শয্যাপাশে
ঘুমে পাশ ফেরার কালে কিংবা জেগে করলে চিৎকার
মুহূর্তেই চক্ষু হতে নিদ্রা হত দূর, যত্ন করে খাওয়াতাম
বুকে তুলে নিয়ে সারারাত কক্ষময় চলত পায়চারি।
আমার জাগতে হত অত্যন্ত সকালে।
ধোয়ামোছা কত কাজ, ঘুমে চোখ মুদে যেত
তারপরে সংসারকর্ম দৈনিক বাজার
করে গেছি একলাগা সমস্ত বছর।
এই খুঁটিনাটি কর্মে মাঝে মাঝে খিচড়ে যেত মন
কিন্তু শ্রমলব্ধ অন্ন মনে হত অমৃতসমান।
মনে হত, আমরা আশিসপুষ্ট
তাই আমাদের অবসর অমন মধুর।

মার্থা : দেশের যত কুমারদের পথে টেনে আনতে
বেচারি সব নারীদের ঝুটঝামেলা ম্যালা।

মেফিস্টো আপনার মত কাউকে আমার অবশ্যই চাই
দেখিয়ে দেবে আঙুল দিয়ে কোথায় সীমা ছাড়াই।

মার্থা : কারো চোখের কোমল দৃষ্টি দেখেননি কি মশায়
কিংবা এই জীবনে বিশেষ কারো হয়নি আবির্ভাব?

মেফিস্টো : কথায় বলে ঘরের সুখ, জরুর ভালবাসা
সোনা মাণিক যশের মূল্যে যায় না কিন্তু কেনা।

মার্থা : মশায়ের নেই নারীর প্রতি বিশেষ আকর্ষণ?

মেফিস্টো : মানুষ মানিয়ে নেয় সবখানে
এরকম তো দেখি।

মার্থা : মনের ভেতর ধাক্কা দেয়া এমন কোন বোধ
করেননি এ জীবনে সত্যি অনুভব।

মেফিস্টো : আমার ছিল না মনে মহিলা সংক্রান্ত কাজে
ঠাট্টাচ্ছলে কোন কিছু বলা ভাল নয়।

মার্থা : মশায় আমায় ভুল বুঝেছেন।

মেফিস্টো : তবে ক্ষমা করুন
আপনার মিষ্টি ভাষণ মনে কিন্তু রবে।
[ফাউস্ট -মার্গারিটা]

ফাউস্ট : তাহলে জানতে তুমি ডাহুকি আমার
এরি পূর্বে তোমাদের বাড়ির ফটকে
আমাদের ঘটেছে সাক্ষাৎ
আমাকে চিনেছ তাই।

মার্গারিটা : আমার আনত দৃষ্ট লজ্জানত চোখে
দেখনি কি খেলে গেছে শীতল বিজুলি।

ফাউস্ট আমার সে নির্লজ্জ কর্ম ক্ষমা করে দেবে
আমার ঔদ্ধত্যে আমি নিজেও অবাক
কী করে গির্জার দোরে করেছি প্রস্তাব।

মার্গারিটা লজ্জা তো পেয়েছি তবু চমকে উঠেছি
কেউ তো আমার নামে মন্দসন্দ কখনো বলেনি,
সাহসিক উচ্চারণে মনে হল নিশ্চয়ই
আমার মধ্যে দেখেছে সে খুঁত
দেখামাত্র ভেবে নিছে নষ্টা মেয়ে হবে
চাওয়া মাত্র তার কাছে সব পাওয়া যাবে।
মিথ্যা বলব না আমি, জেগেছিল অপার্থিব এক অনুভূতি
যেহেতু তোমার প্রতি ক্রুদ্ধ হওয়া ছিল অসম্ভব
তাই আত্মক্রোধে রোষানলে জ্বলেছি বিস্তর।

ফাউস্ট : হায় প্রিয়তমে!

মার্গারিটা : থাম ক্ষণকাল [একটি মার্গারিটা ফুল নিয়ে পাপড়ি ছিড়তে থাকে]

ফাউস্ট : পুষ্পপর্ণ ছিন্ন কর কেন?

মার্গারিটা : এ এক মজার খেলা।
ফাউস্ট : কি রকম?
মার্গারিটা : মনে হবে অর্থহীন, হাসবে বিস্তর।
[ফুলের পাপড়ি ছিঁড়তে ছিঁড়তে মৃদুস্বরে কিছু বলতে থাকে]
ফাউস্ট : বিড়বিড় অনুচ্চ স্বরে কি বকছ তুমি
মার্গারিটা : সে আমাকে ভা-ল-বা-সে-না, -বা-সে-না বা-সে ভাল।
ফাউস্ট : হায় দেববালা।
মার্গারিটা : সে আমাকে ভালবাসে—ভালবাসে না ভালবাসে।
ফাউস্ট : প্রিয়ে কোন স্বর্গীয় শকতি
তোমার কণ্ঠে কথা বলে ফুলের ভাষায়।
তাই বল, সে তোমাকে ভালবাসে
একনিষ্ঠ প্রেম তার তোমার অন্তরে খোঁজে যোগ্য প্রত্যুত্তর।
[সে মার্গারিটার হস্ত চুম্বন করল]
মার্গারিটা : কেন আমি হই কম্পমান?
ফাউস্ট : দীর্ঘশ্বাস নয়, নয় কোন অস্থির কম্পন
আমার চোখের পরে দৃষ্টি রাখ
এই হস্ত স্পর্শ যেন বলে ভাষার অতীত বাণী।
আর প্রেম, সে হল সর্বসত্তা দিয়ে বিসর্জন
পান করা অন্তহীন প্রশান্তির সুধা
যুগ যুগ ধরে যা থাকে আয়ুষ্মান।
অনির্বাণ অফুরান যদি না হতাশা তার আয়ু করে ক্ষয়।
[মার্গারিটা ফাউস্টের হাতে হাত জড়ায়, আবার মুক্ত করে নেয়।
এক মুহূর্তের জন্য কি চিন্তা করে, তারপর মার্গারিটার অনুসরণ]
মার্থা : [প্রবেশ করে] রাত্রি হয় শেষ।
মেফিস্টো : তাহলে আমাদের যেতেই হয়।
মার্থা : সন্তুষ্ট অন্তরে বলতাম আজ রাতে এখানে থাকুন
কিন্তু জায়গাটি ভাল নয়, অতি অল্পে গুজব ছড়ায়।
লোকদের দিনেরাতে কাজকর্ম নাই
পড়শির দোষ খুঁজে হামেশা বেড়ায়
মার্থা : কোথায় এখন, জোড়ের মানিক একটু খুঁজে দেখুন।
মেফিস্টো : সুখমুগ্ধ প্রজাপতি
লঘুপক্ষ মেলেছে প্রান্তরে।
মার্থা : যুবক মজেছে প্রেমে।
মেফিস্টো : যুবতীও তাই, এই হল সংসারের সনাতন রীতি।

ত্রয়োদশ দৃশ্য

একটি গ্রীষ্মনিবাস

[মার্গারিটা দ্রুত ছুটে এসে কক্ষে প্রবেশ করল।
লঘুভাবে ঠোটে চুম্বন দিয়ে বাইরের দিকে তাকাচ্ছে]

মার্গারিটা : সে আসছে।
মেফিস্টো : দুষ্টু কোথাকার এবার পেয়েছি খুঁজে।
মার্গারিটা : [প্রতিচুম্বন করে] আমার প্রাণের প্রাণ হৃদয়বল্লভ।
ফাউস্ট : কে ওখানে?
মেফিস্টো : বন্ধু একজন।
ফাউস্ট : আস্ত জানোয়ার।
মেফিস্টো : এখন সময় বটে যাওয়ার।
মার্থা : [প্রবেশ করে] মশায় দেরি হয়ে গেল।
ফাউস্ট : তোমাকে এগিয়ে দিয়ে আসি।
মার্গারিটা : কিন্তু মা যে ঘরে, তাহলে বিদায়।
ফাউস্ট : তাহলে তোমাকে ছেড়ে যাই, বিদায় বিদায়।
মার্থা : অধিক বিলম্বে ক্ষতি, আসুন বিদায়
[ফাউস্ট মেফিস্টোর প্রস্থান]
মার্গারিটা স্বর্গ জানে কিবা আছে বঁধুয়ার মনে
আমি এক বাকরুদ্ধা, কিশোরী বালিকা
তার কাছে হাঁ ছাড়া বলতে কিছু জানি না যে আমি
কি পেয়েছে আমামধ্যে জানে অন্তর্যামী।

চতুর্দশ দৃশ্য

অরণ্য এবং অধিত্যকা

ফাউস্ট : ওগো শক্তিমন্ত পৃথ্বিআত্মা, যা কিছু
চেয়েছি আমি তোমার সকাশে, সকলই দরাজ হস্তে
করেছ অর্পণ, দৃষ্টিতে উন্মুক্ত করেছ তুমি
নিসর্গের সমস্ত সম্পদ, দেখাওনি শুধু প্রদীপ্ত আনন
দিয়েছ অপার শক্তি যেন পারি ধরে রাখি,
ভোগে সুখে ইচ্ছামত করি সন্তরণ।
নিষ্প্রাণ শীতল দৃষ্টি নয়, দিয়েছ প্রখর শক্তি
যেন করি গভীর একাগ্রচোখে সূক্ষ্ম নিরীক্ষণ,
যেমন আনন্দ অন্তরে দেখি বান্ধবের মন।
জলেস্থলে যেই প্রাণ সতত বিচরে
অনন্ত আকাশলোকে, চলমান ঝরনার মধু গতিচ্ছন্দে
যে প্রশান্ত নীরবতা ঘিরে রাখে অবনীমণ্ডল
তার মাঝে তোমার করুণাদত্ত জ্ঞানদৃষ্টিবলে
চিনে গেছি সতত সঞ্চরমান ভ্রাতৃ পরিচয়।
প্রচণ্ড দুর্বার বেগে ঝঞ্ঝারাশি অরণ্য প্রদেশে
যখন দৈত্যকান্তি পাইন বনে তোলে হাহাকার
শেকড়ে শেকড়ে লাগে মর্মান্তিক টান
শৈলচূড়া কম্পমান গর্জন স্বননে।
অরণ্যকন্দরে তুমি একান্ত সখার মত
আমাকে চালিয়ে নাও দয়াল কাণ্ডারি
মুক্ত কর অন্তর্লোক, যেন মর্মমাঝে মূর্ত হয়
তাবত রহস্যরাশি অপূর্ব সুন্দর।
জাগ্রত অন্তরে দেখি, কি প্রশান্ত কি বিমল
চন্দ্রিমা উদয়, ঝলকিত গিরিচূড়া কুয়াশা আচ্ছন্ন
ঘন অরণ্যানীলোকে, বিম্বিত জগৎ, ভেসে আসে,
প্রতিচ্ছায়া— চিন্তারাশি মুক্তি পায় বস্তুভার হতে।
উপলব্ধি হল, সর্বদোষ মুক্ত নয় কখনো মানুষ।
যে প্রচণ্ড শক্তি তুমি দিয়েছ আমাকে
যার বলে যেতে পারি, উর্ধ্বে দেবলোকে।

কিন্তু কেন যুক্ত করে দিলে হেন সাথী
যার নিত্য সহায়তা আমাকে নিক্ষেপ করে গন্ধময় নর্দমার পাঁকে
সজল নয়নে দেখি চূড়ান্ত নীচতা এসে আমাকে জড়ায়।
কূটাভাস ভরা তার ধ্বনি যদি শুনি
আপনার অবদান তুচ্ছ মনে গনি।
সর্বক্ষণ সে আমার অন্তরে কামনার শিখা জ্বেলে রাখে
সুগঠনা, সুদর্শনা সে রমণী জেগে থাকে সর্ব চেতনায়
অন্ধ কামনার বশে করি যখন সম্ভোগ;
দ্বিগুণ জ্বালিয়ে তোলে তীব্র কামানল

মেফিস্টো : [প্রবেশ করে]
এই নিরামিষ জীবনযাপন করার কি দরকার
এক জায়গাতে অধিক সুখ মেলে না বারবার।
তারচে' চল একটিবার চেষ্টা করে দেখি
নতুন মজার কিছু পেলে তার পেছনে ছুটি।

ফাউস্ট : এ সংকীর্ণ অবসরে বিরক্ত না করে
আপনার কর্ম থাকে, কর সম্পাদন।

মেফিস্টো : আরাম করুন, আশ মিটিয়ে এই কথাটি বলে
যাচ্ছি আমি মনের সুখে চলে
কষ্ট বড় তুষ্ট করা মেজাজখানি চড়া
বদ্ধ পাগল অকৃতজ্ঞ এমন আত্মম্ভরা।
দিনেরাতে খাটছি কত সে হিসাব কি আছে
মর্জিখানি চড়ে থাকে নিত্যি চড়ক গাছে।
কোন জিনিস যে চাই হুজুরের হদিশ মেলা ভার
পত্রপাঠ, বিদায় হই মশায় নমস্কার।

ফাউস্ট : এই হল শয়তানের সনাতন রীতি
ঘ্যানর ঘ্যানর করে প্রথম ধরিয়ে দেবে ভীতি,
তারপরে আবদার করে চাইবে ধন্যবাদ।

মেফিস্টো : ধরার শিশু তোমার এমন কিসের অহঙ্কার
আমায় ছাড়া জীবন তোমার চলত কি প্রকার?
মনে আছে? সকল রকম চিন্তার বিকার থেকে
কে করেছে নিরাময় তোমায় একে একে?
আমার ছাড়া চলতে গেলে খাবি খেয়ে পড়ে
ভূগোলোকের বাঁধন ছেড়ে যেতে পরপারে।
একা একা গুহার ভেতর ঘুরবে ইচ্ছামত
আপন গর্তের চতুর্ধারে নিশি পেঁচার মত;

তা নইলে শ্যাওলা ঢাকা শিলার ওপর বসে
কোলা ব্যাঙের মত মজা পেতে চুষে চুষে।
সুখের কাল কাটাও বটে বসে গুহার কাছে
পণ্ডিত মশায়, তোমার ভেতর ঘাপটি মেরে আছে।

ফাউস্ট : তুমি বুঝবে কেমন করে
ঝর্নাধারা উপচে ওঠে, নীরব ধরার পরে
ছলচ্ছল গতিচ্ছন্দে কি আনন্দ বিলায়?
ভেল্কিবাজির কর্তা শয়তান তোমার বোঝা দায়।

মেফিস্টো : হায়রে এমন পুণ্যমাখা মহত সুখের আশ
শিশির ভেজা পাথর চূড়ায় করবেন রাত্রিবাস।
স্বপ্ন ঘোরে আঁকড়ে ধরে তাবত বিশ্বটাকে
এক লহমায় উতরে যাবে সাধ সন্তের লোকে।
শিরায় শিরায় কাঁপন লাগা উচ্ছ্বাসের বলে
ষষ্ঠ দিনের সৃষ্টির তত্ত্ব ভরবে ঠুলির তলে।
মনে করবে এই তো পেলাম সর্ব প্রেমের দাওয়াই
এখন ঈশ্বরের ভরসা নিয়ে সর্বলোকে খাওয়াই
ধরার মানুষ মনে করে নির্বাণ পেলে পর
মহত ফল এমনি করে ফলবে অনন্তর।
(অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি করল)
কি অমৃত ফলবে সে তো জানা
কিন্তু বলতে আমার মানা।

ফাউস্ট : দূর হও, নির্লজ্জ পামর।

মেফিস্টো : মশায় বুঝি ব্যাজার হলেন আমার কথা শুনে
নীতি টেনে আনলেন আবার পূর্ব স্বভাবগুণে
নতুন কথা তিনি এখন বললেন কিনা তাই
যেন শুদ্ধ শ্রমণ এসব কথা মোটেই শোনে নাই।
ধৈর্য ধরে আর কটা দিন চুপটি করে থাকুন
যত ইচ্ছা নিজের সঙ্গে মিথ্যা কথা বলুন।
খুব বেশি দিন চলবে না যে নিজেই পাবেন টের
ভাবেসাবে দেখতে পাচ্ছি তার আলামত ঢের।
এই ভাবেতে সন্দেহ আর মিথ্যাতে ভর করে
চললে পরে পাগলামোটা আপনি যাবে সেরে।
অনেক হল এবার শুনুন প্রিয়ার কথকতা
সহায়হীন কাতর বড় অন্তরে তার ব্যথা।
মশায়ের মূর্তিখানি সারা হৃদয় ব্যেপে
কালব্যাধির মত তারে ধরছে জোরে চেপে।
বাঁধনহারা প্রেমের বন্যা ছুটল প্রথম চোটে

বরফ ফেটে প্রবল ধারায় ঝরনা যেমন ছোটে।
প্রেমের তোড়ে দু'কূল ভাসা নারীর হৃদয় নদী
এখন দুই পাড়ে তার তপ্ত বালু, শুষ্ক তলাবধি।
বলতে চাই কর্তা হুজুর একটু মাথা ঘামান
জঙ্গল পিরের আসন থেকে গতরখানি নামান।
উঁচু গদীর মায়া ছেড়ে নিচে নামলে পর
বালিকাটি প্রেম-পিপাসার পেত সদুত্তর।
সময় যেন মাথার ওপর ক্লান্ত সামিয়ানা
কালো কালো বাদুর হয়ে ছড়িয়ে আছে ডানা।
একাকিনী মুখখানি তার গবাক্ষেতে রেখে
থরেথরে মেঘ চলে যায় হতাশ হয়ে দেখে।
পাখি যদি হতাম আমি সেই পুরানা গান
গেয়ে গেয়ে ঝরিয়ে যায় প্রাণের অভিমান।
নগর প্রাচীর পরপারে মেঘ-মেঘালির মেলা
তার করুণ মূর্তি দেখে করে অবহেলা।
ওঠার বসার শক্তি নাই দীর্ঘশ্বাস তার গান
কেঁদে কেঁদে করে কন্যা শোকের শরাব পান।
কখনো বা হাসে কন্যা মরার হাসির মত
গভীর শোকে আছে কন্যা প্রার্থনাতে রত।

ফাউস্ট : সাপের বেটা সাপ।

মেফিস্টো : (একপাশে ফিরে) বিষে যদি ক্রিয়া করে তা হলেই হয়।

ফাউস্ট : অভিশপ্ত খল, তুই তোর আপন পথে যা
কখনো ডাকিসনে সেই প্রিয় নাম ধরে।
বড়ই বিষাদক্লিষ্ট অন্তর আমার
জাগাসনে তৃষ্ণা আর তীব্র কামনার।

মেফিস্টো করতে হবে কি, সে তো ভাবে কেটে পড়েছেন
মানতে হবে মোটের উপর কথাটি তো ঠিক।

ফাউস্ট নিকটে সুদূরে থাকি, আমি তারে হারাই না
পাই সন্নিকটে, সীমাহীন ভালবাসা
কোমল অধরে, যখন সে খ্রিস্টে দেয় ভক্তির চুম্বন
কোথা হতে হিংসা এসে ভরে তোলে মন।

মেফিস্টো : ইয়ার তুমি ঠিক বলেছ, ঈর্ষা করি তোমায়
যুগল পুরু মাংস গোলাপ আমারও মন লোভায়।

ফাউস্ট : দূর হও, দুষ্ট দূরাচার।

মেফিস্টো : রাখ বকাঝকা
যেই খোদা আপন হাতে নারী পুরুষ বানায়
জানে ভাল কোন্ কাজটি করলে তাদের মানায়।

অসীম করুণায় তিনি সুযোগ দেন করে
নারী পুরুষ পরস্পরে মিলতে যাতে পারে
পুণ্য প্রেমের ঘণ্টাধ্বনি করছ কেন জোরে
প্রিয়ার ঘরে হাজির হবে একটুখানি পরে।
ভাবটি তুমি করছ যেন প্রিয়ার সমাধিতে
যাচ্ছ বটে শোকাহত পুষ্পাঞ্জলি দিতে।

ফাউস্ট : তার বক্ষে সে সুখের শান্ত উম্মাদনা
যুগল সরল বাহু আত্মার সান্ত্বনা
সত্য অতিশয়, তবু কি করিনি আমি তার সর্বনাশ ?
অনিকেত গৃহহীন নিষ্ঠুর দানব তৃষ্ণা, তীব্র বেগে
গিরিগাত্র হতে অন্ধ স্রোতস্বিনী সম
ধাবমান গতি, আমি কি নামিনি সেই পাতাল প্রদেশে?
হৃদয়ের ভাব বাষ্প করে পরিহার সেই কন্যা
জাগ্রত অন্তর নিয়ে আল্পস পর্বতঘেঁষা
উপত্যকা তলে সেই সরল কুটিরে
সতত ব্যাপৃত ছিল আপনার গৃহকর্মে
সর্বক্ষণ কার্যরত অকলঙ্ক সুন্দর জগৎ।
বিধাতার অভিশাপ ললাটে আমার
তৃপ্ত হতে পারি নাই তাই,
উপাড়ি পর্বতমূল দুই হাতে করেছি চূর্ণন
করেছি নিশ্চিত তাকে নরকের বলি।
নির্লজ্জের মত কলঙ্কহীনতা তার করেছি হরণ
শয়তান সহায় হও যন্ত্রণার কর অবসান
যা কিছু ঘটার আছে শীঘ্র ঘটা ভাল
যদি তার ভাগ্যে থাকে সমূহবিনাশ
তার সঙ্গে আমাকেও কর সর্বনাশ

মেফিস্টো এখন দেখি প্রেমের আগুন হুঙ্কার দিয়ে ওঠে
অল্পমাত্র সময় আছে যাও না ত্বরা ছুটে।
কিন্তু নাকের আগায় কি বিরাজে, যাদের জানার কথা নয়;
তাদের মত বিজ্ঞ হওয়া তোমারে না সাজে
সাহস করে এগিয়ে গেলে জয়ী হবে কাজে।
শয়তানের গুণপনা অনেক আছে ঘটে
কার্য সিদ্ধির যে কোন পথ খারাপ নয় মোটে।
তা না হলে শপথ করে বলতে তোমায় পারি
হতাশ হয়ে শয়তান দেবে পরলোকে পাড়ি।

পঞ্চদশ দৃশ্য

মার্গারিটা

[একাকী চরকার পাশে বসে]

মার্গারিটা : আমার শান্তি হল দূর
তার বিরহে হৃদয় আমার
ব্যথায় হল চুর।
লোণাজলে আঁখি দুটি
ঝাপসা হয়ে আসে
চিন্তা করার শক্তি নাই
উথালপাথাল নানান কথা
মনের মধ্যে ভাসে।
কোথায় গেলে পাব তারে
কোন্ সে অচিনপুর
আমার শান্তি হল দূর।
তার আশায় সারাটি দিন
নয়ন পেতে রাখি
ঘরেতে মন টিকে না আমার
কেমনে ঘরে থাকি।
তার হাসির বাঁশি শুনব বলে
সকল কিছু ত্যাগী
তার চরণের ধ্বনির লাগি
সারাটা দিন জাগি।
তার নয়নের দীপ্তিরেখা
কখন জানি দেবে দেখা
কণ্ঠ ভরে উঠবে বেজে
প্রাণের আকুল সুর
আমার শান্তি হল দূর।
তার হাতের পরশ পাব

চুম্বনেতে বিবশ হব
ঘনীভূত সুখাবেশে
কাঁপব থরথর
আমার শান্তি হল দূর;
তার বিরহে হৃদয় আমার
ব্যথায় হল চুর।
হিয়ায় আমার কাঁপন লাগে
সুখোল্লাসের তুফান জাগে
ধরব তারে বাঁধব তারে
নীরবে এই বুকের পরে
চুমুর পর চুমু এঁকে
আমি কাঁদব ঝরঝর
আমার শান্তি হল দূর
তার বিরহে হৃদয় আমার
ব্যথায় হল চুড়।

ষোড়শ দৃশ্য

মার্থার বাগান

[ফাউস্ট ও মার্গারিটা]

মার্গারিটা : হাইনরিশ কথা দাও।

ফাউস্ট : প্রিয়তমে কথা দিলাম।

মার্গারিটা : বড় ভাল দয়াভরা প্রাণ
তবু জানতে ইচ্ছা হয়,
অন্তরে দাও কি বঁধু ধর্মের সম্মান
প্রার্থনা তোমার মনে পায় কোনস্থান?

ফাউস্ট : প্রিয়তমে প্রেম যদি নিত্যবস্তু হয়
প্রেমের কারণে আমি মরব নিশ্চয়;
গির্জা বা পুরুতে যা ভাবতে না পারে
ভালবেসে যাব আমি অন্তরে অন্তরে।

মার্গারিটা : তা সত্য নয়, বিশ্বাসে মিলায় বস্তু
আমাদের বাঁচতে হবে চূড়ান্ত বিশ্বাসে।

ফাউস্ট : নিশ্চয়ই বিশ্বাস রেখে যেতে হবে।

মার্গারিটা : ক্ষমা কর, অধিকন্তু জানতে চাই
পবিত্র খ্রিস্ট আত্মা কর কি সম্মান?

ফাউস্ট : অবশ্য সম্মান করি।

মার্গারিটা : হয়ত সম্মান কর বিশ্বাস কর না
জীবনের সারসত্য বলে তুমি স্বীকার কর না।
কখনো দেখিনি আমি প্রার্থনাসভায়
কখনো প্রার্থনা মন্ত্র নাহি বল মুখে
তুমি কি বিশ্বাস কর আল্লাহ রহমানে।

ফাউস্ট : প্রিয়তমে এমন কে আছে বল
অকম্পিত কণ্ঠস্বরে বলে যেতে পারে,
নিশ্চিত বিশ্বাস করি
সর্বত্র জিজ্ঞাসা কর সাধু-সন্তজনে

ওগো, তুমি কি বিশ্বাস কর
প্রত্যুত্তরে মনে হবে সকল চাতুরী।

মার্গারিটা : তা হলে তোমর বিশ্বাস নাই?

ফাউস্ট : প্রিয়তমে ভুল বুঝবার নেই প্রয়োজন
যে কোন নির্দিষ্ট ধর্মমতে, কে বলতে পারে তার নাম
কার আছে অনুভূতি তেমন জোরাল
বলবে বিশ্বাস করি না আমি।
তিনি আছেন সর্বঘটে
জলেস্থলে আকাশে-আলোকে
সর্ববস্তু ব্যাপ্ত করে সর্বলোকে স্বয়ং প্রকাশ।
তোমাকে আমাকে ঘিরে বলতে চাও
সতত আবৃত নেই সেই চিরন্তন!
মাথার ওপরে দেখ নীলিমামণ্ডল
মিনার খিলান তার কার হস্ত করেছে ধারণ
সর্বংসহা এ ধরণী সরল সাহসে
কোন্ শক্তিবলে তার জীব সন্তানেরে করছে লালন।
কল্প-কল্পান্তের ঐ নক্ষত্র মণ্ডল, কেমন বন্ধুর মত
জ্বালে আলো ঝিকিমিকি, নয়নে নয়নে দীপ্তি করে বরিষণ,
যখন নয়ন মেলে দেখি পরস্পর
অনন্ত রহস্য ঘেরা নির্বাক জীবন
গহনে গহনে বয় নিত্য নিরজনে।
দেখে বল দেখি তারে—
জাগে নাকি সেই সত্য মনে ও মননে।
যখন তোমার প্রাণ শান্তি সুধা রসে, পূর্ণ হয়ে
দিগ্বিদিক করে আলিঙ্গন
যে নামে ডাক না তুমি সেই সত্য সর্বনাম সর্বত্র বিরাজে।
প্রেম বল, বল তারে আনন্দ স্বরূপ
কিংবা অনুরাগ ভরে ডাক আল্লা-রহমান
আমি তো জানি না নাম, নামে তার ঘটে সংকোচন
নাম মানে শব্দ মাত্র, নাম মানে ধোঁয়ার কুণ্ডলী
স্বর্গের আলোক জাল করে আবরণ।

মার্গারিটা : সহজ সরল কথা অত্যন্ত সুন্দর
আমাদের যাজকও বলেন এ বচন
বলার পদ্ধতি তার শুধু ভিন্নতর।

ফাউস্ট : দেখ বিশাল গগনতলে
সমস্ত হৃদয় ফুঁড়ে এই ধ্বনি ওঠে

		সবে বলে তার নাম, শুধু ভাষা, শুধু রীতি
		ভিন্ন হয়ে থাকে।
		এখনো আমাকে তুমি ভাব শ্রদ্ধাহীন।
মার্গারিটা	:	যা শুনেছি সত্য মনে হয়, তবু এক
		ঘোরতর শঙ্কা জেগে রয় মনে, মনে হয়
		খ্রিস্ট নাই তোমার অন্তরে।
ফাউস্ট	:	প্রিয়ে, এই শঙ্কা কেন?
মার্গারিটা	:	তোমার এমন সঙ্গী থাকে দেখামাত্র ভয় জাগে কম্প দিয়ে গায়ে আসে জ্বর
ফাউস্ট	:	বলত এমন কেন হয়?
মার্গারিটা	:	যে লোক তোমার সঙ্গে থাকে সর্বক্ষণ।
		দেখামাত্র আতঙ্কেতে কেঁপে ওঠে মন
		অন্তরাত্মা ভেদ করে জেগে ওঠে শীতল প্রবাহ
		দেখি নাই কোন লোক যার অঙ্গে এত শৈত্যদাহ।
ফাউস্ট	:	প্রিয়তমে শঙ্কা কর দূর।
মার্গারিটা	:	সেই ব্যক্তি সন্নিকটে এলে
		আমার শোণিতধারা স্তব্ধ হয়ে যায়
		আমি তো মানুষ ভালবাসি, তবুও এমন হয় কেন
		প্রাণাধিক তোমাকে যত দেখি দেখবার আরো সাধ হয়
		কিন্তু তাকে দখেলেই অন্ধকার নয়নে ঘনায়।
		আরো মনে হয় সে এক কুৎসিত লোক ভণ্ড প্রতারক
		যদি আমি ভুল করি ভগবান করে দেবে মাপ।
ফাউস্ট	:	অনেক বিচিত্র জীবে দুনিয়াটা ভরা।
মার্গারিটা	:	এ লোকের সঙ্গ আমি সইতে পারিনে
		চৌকাঠ পেরিয়ে গৃহে করলে প্রবেশ
		মনে হয়, চতুর্দিক দেখে ভারি অবজ্ঞার চোখে।
		কারো প্রতি নাই তার কোন আকর্ষণ
		অন্তরে দাউ দাউ জ্বলে হিংসার অনল।
		ললাটে খোদিত আছে শিলালিপি যেন
		কাউকেও ভালবাসা সাধ্যের অতীত।
		যখন তোমার বাহুতে করি আত্মসমর্পণ
		কি আনন্দ, কি পুলকঘন অনুভূতি অন্তরে অন্তরে
		ভাবি এত সুখ আমি তবে রাখব কোথায়
		কিন্তু তাকে দেখে অন্তরাত্মা আতঙ্কে শুকায়।
ফাউস্ট	:	প্রিয়তমে এতই সহজে তুমি হও আতঙ্কিত।
মার্গারিটা	:	যখন ভেতরে আসে অথবা দাঁড়িয়ে দেখে
		হৃদয়ে হঠাৎ কেন পেয়ে যাই চোট

যেন একটুকু ভালবাসা অবশিষ্ট নাই।
তা ছাড়া সে এলে প্রার্থনাবাণী মুখেতে সরে না
এই এক মহাতঙ্ক কিছুতেই তাড়াতে পারি না
জানি, জানি, হাইনরিশ তোমারও এমন ঘটে।

ফাউস্ট : বড়ই বিতৃষ্ণ হয়ে আছ তার প্রতি।

মার্গারিটা : আমাকে যেতেই হবে।

ফাউস্ট : ক্ষণিক সময় তুমি দাও অবসর
প্রেমের পরম তীর্থ যুগ্ম বক্ষস্থল বক্ষে ধরি
দূর করি সর্ব ব্যধান
হৃদয়েতে মিশাই হৃদয়।

মার্গারিটা : যদি হতাম একা গৃহে
অবশ্যই অদ্যরাতে খোলা পেতে দ্বার
জানো বটে সঙ্গে থাকে জননী আমার
নরম পলকা ঘুম পত্রপাতে জাগে।
আমাদের গুপ্তপ্রেম জানাজানি হলে
মনে রাখ সেই ক্ষণে মরণ আমার।

ফাউস্ট : ভাবনার নেই প্রয়োজন
এই আরক তিন ফোঁটা, শুধু গুলে দেবে
গভীর নিদ্রার মধ্যে মগ্ন হয়ে পোহাবে রজনী।

মার্গারিটা : তোমার সুখের জন্য সবকিছু করতে পারি
ভয় জাগে অনিষ্ট না হয় পাছে।

ফাউস্ট : ক্ষতিকর কিছু হলে বলা কি সহজ হত
তোমাকে আমার!

মার্গারিটা : প্রিয়তম হাইনরিশ্ তোমার চোখের দৃষ্টি
হাতের পরশ
আমার ইচ্ছার শক্তি করে পরাজিত
তোমার প্রীতির জন্য বহুকিছু দিছি বিসর্জন
বাকি কিছু আছে নাকি?

[প্রস্থান]

মেফিস্টো : তাহলে বিদায় নিল বানরী তোমার?

ফাউস্ট : এখনো তুমি কি তবে আড়ি পেতে আছ?

ফেমিস্টো : যেতে যেতে দেখতে পেলাম
পণ্ডিতজনকে জেরা করার বহর
শেষপর্যন্ত টিকে গেল এটা জবর খবর।
মেয়েরা খুব খুঁতখুঁতে হয়, প্রাচীন কায়দাকানুন
দেখতে চায় ভাল করে প্রেমিক জনে মানুষ।

একবার যদি গ্যাড়াকলে পুরুষ ঢোকায় ঘাড়
মনে করে তুলে দিলাম সাত জনমের ভার।

ফাউস্ট : তোমার কি চোখ নাই দুষ্ট দুরাচার
দেখ নাই প্রেমময় শুদ্ধ আত্মা ব্যথায় কাতর।
সমগ্র সত্তায় তার বিদ্যমান জীবন্ত বিশ্বাস।
যেহেতু বিশ্বাসে তার লেগেছে কাঁপন,
প্রেমিকেরও অনুগত নয় তার মন
দেখেছে সে দিব্যচক্ষে কুরে কুরে খাচ্ছে তাকে সন্দেহ কন্টক।

মেফিস্টো : ইন্দ্রিয় পরায়ণ অতি প্রচণ্ড কামুক
তোমাকে চালাচ্ছে ছুঁড়ি নাকে ধরে টেনে।

ফাউস্ট : দূর হও নরকের গর্ভপাত।

মেফিস্টো : শরীর তত্ত্বে এলেম কন্যার আছে ভালমত
আমায় দেখে মনেতে তার ভাবনা জাগে কত!
কখনো ভাবে জ্বিনের রাজা, কখনো বা খারাপ অন্য কিছু
অতন্ত রূপ শক্তি ধরে নিয়েছি তার পিছু
অদ্য রাতে সকল কিছুর...

ফাউস্ট : তাতে তোমার কি?

মেফিস্টো : সামান্য আনন্দ অংশ পাই বটে তাতে।

সপ্তদশ দৃশ্য

ঝরনাতলায়

[ঝরনাতলায় কলসি কাঁখে মার্গারিটা এবং লিসবেথ]

লিসবেথ : বারবারার জান তো খবর?
মার্গারিটা : জানি না কিছুই।
ঘরের বাইরে আমি কদাচিৎ যাই।
লিসবেথ : আজ আমাকে বলল সিবিল ডেকে
শিকল কেটে পাখিটি তার কানন ছেড়ে গেছে
জাতের গর্ব ধুলায় লুটায়
এখন বেটির পাগল হবার যোগাড়।
মার্গারিটা : কেন?
লিসবেথ : একা খেয়ে আরেকটাকে করছে পেটে লালন।
তাও জান না?
মার্গারিটা : আহা!
লিসবেথ : আখেরেতে এ শাস্তি তার পাওনা ছিল বটে
উঁচু কুলের অহঙ্কার আর প্রসাধনীর জোরে
মেলায় কিংবা নৃত্যাসরে গর্বে যেত ফেটে
মাসের পরে মাস নাগর নিয়ে করছে স্বর্গবাস
মিষ্টিমণ্ডা ভোগ করেছে মদ খেয়েছে বেশ
সম্মানহীন উপহার নিয়েছে অশেষ।
শরম ছাড়া কাণ্ড কত বন বাদাড়ে ঘুরে
দুজনাতে পরম সুখে করছে উড়েউড়ে
জানতে পেল সবে এখন ফুলের ভেতর কীট!
মার্গারিটা : হায়রে অভাগী।
লিসবেথ : তোর খুব যে দেখি দরদ,
আমরা সারাটা দিন চরকা টেনে শক্তি ঢেলেছি।
রাতে মায়ের কড়া শাসন মেনে চলেছি।
ছিনাল বেটি নাগর নিয়ে মনের আনন্দে

ঝোপেঝাড়ে, পথের ধারে সকাল থেকে সন্ধে
প্রহরের পর প্রহর গোপনে রস করছে বেশ
অপরাধীর আসল স্বরূপ ধরা পড়ল শেষে
গির্জায় তার দাঁড়াতে হবে মহাপাপীর বেশে।

মার্গারিটা : বিয়ে করে প্রেমিক যদি ঘরে তোলে তাকে।

লিসবেথ : সে গুড়েও বালি, অন্যজনার প্রেমিক ছিল
চটপট সেই ছেলে, শিকল কেটে উড়ে গেছে
একলা তারে ফেলে।

মার্গারিটা : তাহলে তো আসলে সংকট!

লিসবেথ : লোকটাকে পাওয়া গেলেও কি
আমরা তার কালোমুখে মাখব আরো কালি
ছেলেরা তার মস্তক থেকে করবে টোপর চুরি,
দোড়গোড়াতে ছড়িয়ে দেব কাটা ন্যাড়ার স্তূপ।

মার্গারিটা : (স্বগত) কোনো মেয়ে আলগা পথে গেলে
আশ মিটিয়ে উচ্চস্বরে দিতাম গালাগালি।
পরের পাপের নিন্দা করে সাধ মেটেনি মনের
কালির ওপর চড়িয়ে কালি হুঙ্কার দিতাম কনের।
সতীলক্ষ্মী ভেবে কত করতাম সুখের গর্ব
এখন নিজের পাপে নিজের ভেতর হয়ে আছি খর্ব
বড় সরল অকপট মধুর আকর্ষণে
আত্মা সাক্ষী নিয়ে গেছে পাপের পথে টেনে।

অষ্টাদশ দৃশ্য

একজন সাধুর মাজারের অবরুদ্ধ প্রাকার

[একটি কুলুঙ্গিতে মা মেরির মূর্তি। একটি ফুলদানিতে অঞ্জলি দেয়ার ফুল।]

মার্গারিটা : কি বেদনা বুকে পাষাণ পরাণ
বাছারে আমার ডুবিয়ে মেরেছি
তুমি তো দেখেছ শেষ অবসান
যেমন তোমার আপন সন্তান
হাত পা ছড়িয়ে নীরবে মরেছে।
তুমি জাগবে যখন জাগিয়ো তারে
পিতার আসন সকাশে বাছারে
নিয়ে যেয়ো তুমি হাত দুটি ধরে।
কি বেদনা বিষ অস্থি শিরায়
গুমরে মরেছে সহন না যায়
দয়ময় বাবা জান তো সকলই
প্রার্থনাকালে শিহরি শিহরি
কেঁপে ওঠে প্রাণ ভয়ে যাই মরি।
তাকাই না কেন যেদিক পানে
আঘাতের পর আঘাত হানে
বরশার ফলা করে ফালাফালা
পরাণ আমার ব্যথায় কঁকায়
ভয় পেয়ে বাবা নয়নে আমার
অশ্রুর পরে অশ্রু ঘনায়।
জানালায় রাখা ফুলদলগুলি
প্রসন্ন প্রভাতে তরুশাখা থেকে
তুলেছি পদে দিতে অঞ্জলি।
পাপড়ি পরাগে ঝরছে তরল
নয়নের বারি ফোঁটা ফোঁটা করি।
ঊষার সোনায় রাঙ্গাইছে ঘর

দুঃখশয্যায় আমি জর্জর
দয়া কর বাবা বাঁচাও আমারে
যেন বা মরণ ছোবল না হানে
লজ্জাশরম নাগপাশ হয়ে
আমাকে বাঁধনে জড়াতে না পারে।
বেদনা মুকুট পরে আছ তুমি
দেখ একবার অভাগীর পানে
বড় প্রয়োজন পাঠাও আশীষ
হৃদয় আমার বারণ না মানে।

উনবিংশ দৃশ্য

গভীর রাত

[মার্গারিটার ঘরের দ্বারের সামনের রাস্তা ।]

ভ্যালেন্টিন : ইয়ার দোস্ত সবাই মিলে মহাহট্টগোল
সুরার আসর জাঁকিয়ে তোলে অট্ট অট্টরোল ।
শরাব খায় জনে জনে প্রিয়ার নামটি ধরে
প্রেমিকাদের তারিফ করে যে যার বচন ঝাড়ে ।
শান্ত হয়ে বসে থাকতাম হাতে রেখে মাথা
শুনে যেতাম রঙ বেরঙের নারীর কথকতা
একটু পরে স্মিত হেসে দাড়ি দিয়ে নাড়া
টগবগানো গেলাস হাতে হঠাৎ হয়ে খাড়া;
বলে যেতাম আমি সবার রুচির তারিফ করি
তবে বল কোথায় মেলে আমার বোনের জুড়ি ।
শান্তশিষ্ট মিষ্টিমুখী গ্রেচেন হেন মেয়ে
সুন্দরী, সে স্বভাব খানি খাঁটি তারও চেয়ে ।
তোরা যারা নারীর নামে বলছিস নানা বোল
তার জুতায় ফিতা বাঁধার যোগ্য কেবা বল ।
শোন শোন শোন বলে সভায় জাগত উচ্চধ্বনি
গেলাসেতে গেলাস ঠেকে উঠত ঝনঝনি ।
অনেকেই মুখের কথা করে যেত কবুল
বলত, নারীকুলের অলঙ্কার সে স্বর্গলোকের ফুল ।
বলছে, যেমন ঠিক অবিকল একটুও নয় কম
গর্বকারী লোক সকলের ফুরিয়ে যেত দম ।
এখন লাজে ইচ্ছা করে
চুলগুলো সব ছিঁড়ি
মাথা ঠুকে অপমানে
তৎক্ষণাৎই মরি ।
এখন সকল হারামজাদা চোখের আড়ে চায়
ঠাট্টাচ্ছলে নানান কথা আমায় বলে যায় ।

ইচ্ছা করে বেজন্মাদের পিঠে ভাঙ্গি চ্যালা
কিন্তু তারা বলছে সত্য এইখানেই জ্বালা।
কারা আসে চুপি চুপি এমন গহন রাতে
মনে তো হয় দুজন তারা চলেছে এক সাথে।
ধরতে যদি পারি তবে বেদম দেব মার
আত্মা যেন এক নিমেষে হয় শরীরের বার।
[ফাউস্ট-মেফিস্টোফেলিস]

ফাউস্ট : ঐ যে দূরের গবাক্ষেতে জ্বলছে ম্লান আলো
গির্জা ঘরের বাতি কেমন দেখাচ্ছে আজ কালো
চারদিকেতে নিকষ কালো জমাট বাঁধা নিশা
এমন রাতে আমার মনও হারিয়ে ফেলে দিশা।

মেফিস্টো : খড়খড়ি পথ লম্ফ দিয়ে পেরিয়ে গিয়ে ডরে
কামে অন্ধ হলো যেমন দেয়াল চূড়ায় চড়ে।
পালিয়ে যায় তড়তড়িয়ে ছায়া দুলে ওঠে
তেমনি আমার লাগছে ভাল উত্তেজনার চোটে।
প্রেমের সুখে ভাগ বসাতে দাবি আছে আমার
আড়ি পেতে শুনতে লাগে ভারি চমৎকার।
তারপরেতে চ্যালাপ্যালা শিষ্য সাবুদ নিয়ে
ভালপুর্গিস রজনীতে আমোদ করব গিয়ে।
এই দু'দিনের ঘুমের ক্লান্তি হ্যাঙ্গাম হুজ্জুত যত
হেসে খেলে সেইখানে শোধ নেব মনের মত।

ফাউস্ট : ঐ দেখা যায় আলোর আভা তার পরেতে পেরিয়ে কিছুদূর
দেখা যাবে ঝলক দিয়ে রত্ন গুহার দোর?

মেফিস্টো : মোড়ক খুলে দেখলে পাবে নয়ন মনের সুখ
রতন মাণিক ভরাভাণ্ড জুড়িয়ে যাবে বুক
গতরাতে টাকশালেতে দেখে পাগলপারা
টাটকা কাটা মোহর যেন চাঁদের চোখের বাড়া।

ফাউস্ট : অলঙ্কার কিংবা কোন আঙটি নেই সাথে
প্রিয়ার কাছে কেমনে যাই খালি দু'খান হাতে!

মেফিস্টো : মনে হয় দিব্যি চোখে দেখেছি শেষবার
গজমোতির মালা কণ্ঠে শোভে চমৎকার।

ফাউস্ট : কোন উপহার বিহনে
বল তো কেমনে যাই প্রিয়া দরশনে।

মেফিস্টো : কোন কোন সময় এমন আসে
রসিক সুজন বিনামূল্যে প্রেমের পুলক
আদায় করে থাকে।
আকাশ পারে তারার চেরাগ জ্বলছে সারে সারে

এই সময়ে ভাবের গান গাইতে ইচ্ছে করে।
বস্তুত এই গানে পাবে এমন নীতিকথা
কন্যার মন পাবে তুমি সরিয়ে জটিলতা।
(গীটার বাজিয়ে গান গাইতে শুরু করল)
ওলো সখি ক্যাতে
এমন বিহান বেলা
নাগরের দোর গোড়াতে
কিই-বা কাজে রত।
কিরে কেটে কই
তোরে টেনে নেবে সই
তারপর টেরটি পাবে
কুমারীত্ব গত।
ফেলবে দীর্ঘশ্বাস
হল সর্বনাশ
সাঙ্গ হল সকল কিছু
কাঁদো মনের মত।
প্রেমের জোয়ার এসে যখন
হৃদয় গাঙ ভাসায়
মনচোরাদের কবল থেকে
রইবি হুঁশিয়ার।
বিয়ের আংটি যতক্ষণ না
পরেছ আঙুলে
মনের মানুষ হলেও তারে
খেলাবি লাঙ্গুলে।

ভ্যালেন্টিন : কোন্ মেয়েটির সর্বনাশ করতে তোরা চাস্?
টুকরো করে ভাঙব গীটার
উচিত মত শিক্ষা তুমি পাবে বাজনদার।
(মেফিস্টোফেলিসের গীটার কেড়ে নিয়ে ভেঙে ফেলল)

মেফিস্টো : যন্ত্রখানা ভেঙ্গেচুরে হল একাকার।

ভ্যালেন্টিন : বেশি কথা কইলে পরে ভাঙব মাথার খুলি।

মেফিস্টো : পণ্ডিত মশায় সাহস করুন
পালিয়ে যাবেন না।
মরচে পড়া লোহার ফলা লক্ষ্য করে ছুঁড়ুন।
আমি ওদিক রক্ষা করি।

ভ্যালেন্টিন : রক্ষা কর এবার।
(ভ্যালেন্টিন তলোয়ার ওঠাল)

মেফিস্টো : তা তো বটেই!

ভ্যালেন্টিন : বুঝবে মজা পরে।
মনে হচ্ছে লড়ছি, স্বয়ং শয়তানের সাথে
এখন কি করি, বাহু দুটি অবশ হয়ে গেছে।

মেফিস্টো : আঘাত কর জোরে।
(ফাউস্ট ভ্যালেন্টিনকে তলোয়ার দিয়ে আঘাত করল)

ভ্যালেন্টিন : হায় রে আল্লা!

মেফিস্টো : কুকুরছানা পোষ মেনেছে এবার।
জলদি চল কেটে পড়ি,
পালিয়ে যাবার ফন্দিফিকির জানা আছে ম্যালা।
অচিরেই খুনের নামে উঠবে শোরগোল
দোস্ত ইয়ার পুলিশ সবাই, খুব সহজে পেয়ে যাব পার
ইচ্ছামত লোকের নাম দেব খাতায় টুকে।
(ফাউস্ট মেফিস্টোফেলিস দ্রুতবেগে পালিয়ে গেল)

মার্থা : (উপর থেকে) পড়শি সব জলদি এসে দেখ!
মনে হল ঝগড়া হল, হল হট্টগোল।

মার্গারিটা : (জানালা খুলে) একটুখানি আলো আন দেখি।

স্বর : (আগত লোকদের) কিন্তু ভূমিতলে পড়ে আছে কে?

মার্থা : (বেরিয়ে এসে) খুনীরা সব পালাল কোন্ পথে?

মার্গারিটা : কিন্তু ভূমিতলে পড়ে এটা কে?

ভ্যালেন্টিন : তোমার আপন মায়ের পেটের ছাওয়াল!

মার্গারিটা : হায় আল্লা, কি গজব নসীবে আমার।

ভ্যালেন্টিন : মরণ নিশ্চিত জানি
মরণেরে সহজেই করব বরণ
আতঙ্কিত দৃষ্টি মেলে দেখিসনে আমায়
কান্না রাখ হে রমণী, সন্নিকটে আয়
এ আমার শেষবাক্য কর কর্ণপাত।
(সকলে তাকে ঘিরে দাঁড়াল)
সুন্দরী তরুণী বোন গ্রেচেন আমার
এর পরে তুই আরো হবি হুঁশিয়ার
যেন এরকম তুচ্ছ ভ্রান্তি সামনে না ঘটে।
একান্তে তোকে কই, আস্ত গণিকা তুই
যখন নিয়েছিস পেশা, উন্নতিতে হবি যত্নবান।

মার্গারিটা : ভাই তুমি দিয়ে গেলে হেন অপবাদ,
হায় আল্লা।

ভ্যালেন্টিন : আল্লাকে আনিসনে আর তোর কাণ্ডে টেনে
যা ঘটার ঘটে গেছে, হবে না অন্যথা।
বাড়বে পাপ আপন পথে চক্রবৃদ্ধি হারে

একজনের সঙ্গে গোপন প্রণয় পিরিত হলে
গন্ধ শুঁকে অন্যজনে পথটি নেবে চিনে।
এমন করে জুটিয়ে নিবি ডজন খানেক নাগর
শহর ভরা মানুষ তোকে করবে উপভোগ।
শরীর থেকে জন্ম নেবে কলঙ্কের কীট
মনে হবে বিপদমুক্ত লুকিয়ে গোপন ঘরে
তারপরে এদিক ওদিক কানাঘুষা হলে
চক্ষু কর্ণ ঢেকে তখন অন্ধকারে পালায়।
যখন তুই আপন হাতে করতে যাবি খুন
দিবালোকে প্রকাশ পেয়ে হবে চতুর্গুণ।
যদিও তার চেহারাটি একটুও নয় ভাল
দিনে দিনে কালোর উপর জমবে আরো কালো।
বলে যাচ্ছি দেখে ভবিষ্যৎ
এমন দিন আসবে তোর, যখন সকল লোকে
মহামারীর লাশের মত দেখবে তোকে চোখে।
হায় গণিকা করুণ চোখের দৃষ্টি হেনে করবি অনুভব
মানুষ জনের চোখে হবি জীবন্ত এক শব।
সোনার হার দোলাসনে আর গলায়
প্রার্থনার জন্য আর যাসনে দেবালয়ে।
নকশী কাটা জরির পাড়ের ফিতা দুলিয়ে
যাসনে আর নাচের সভায় চরণ বুলিয়ে।
স্যাঁতস্যাঁতে আঁধার ভরা কোন একটি কোণে
বাস করবি অন্ধ নুলা ভিখারিদের সনে।
আল্লা যদি ইচ্ছা করে করতে পারে ক্ষমা
তোর ভাগ্যে এ জীবনে ঢের লাঞ্ছনা জমা।

মার্থা : মরণকালে আল্লাতালার মাগ মেহেরবাণী
অনর্থক দিচ্ছ কেন খারাপ গালাগালি।

ভ্যালেন্টিন নিলাজ কুটনী যদি নাগাল পেতাম তোর
দুই হাতে ঘাড় মটকে মাথা করতাম চুর।
পাপের বোঝা তাতে একটু ভারি হত জানি
কিন্তু আমি পেয়ে যেতাম সুখের মরণখানি।

মার্গারিটা : ভাইরে আর তো সয় না প্রাণে।

ভ্যালেন্টিন : বলছি তোকে কান্নাকাটি থামা
যেদিন তুই সতীত্বেরে ফেললি খুলে টেনে
সে দিবসেই এই বক্ষে চাকু দিলি হেনে
মরছি আমি সাহস ভরা সৈনিকের মতন
সেই ভাবেতে পরমেশ করবে আমায় গ্রহণ।

বিংশ দৃশ্য

গির্জার অভ্যন্তর

[অর্গানবাদ্যসহকারে সমবেত সঙ্গীত। প্রার্থনার ভঙ্গিতে
মার্গারিটা উপবিষ্টা, পেছনে দুষ্ট আত্মা]

দুষ্ট আত্মা : মনে কি পড়ে যখন তুমি সাহসী চরণ ফেলে
একেলা যেতে প্রার্থনাতে বেদীর চরণমূলে।
মলিন ধর্ম পুস্তক খুলে করতে স্তোত্র পাঠ
আধো আধো কিশোর বোলে মিশিয়ে ভক্তিরস।
মনে কর গ্রেচেন তুমি সেই মেয়ে কি আছ?
আজ তোমার চিন্তাধারায় বিরাট রূপান্তর
প্রার্থনাতে বসে তোমার কাঁপছে নাকি স্বর।
নিজের মাকে আপন হাতে হাজার আজাব দিয়ে
চেতনবিহীন ঘুমের দেশে দিয়েছ পাঠিয়ে।
তার রুহের শান্তির জন্য মাগছ মাগফেরাত,
তোমার দোরগোড়াতে হল বল কাহার রক্তপাত?
বুকের তলায় ভয়ঙ্করের আগাম খবর নিয়ে
নড়ে চড়ে, নির্দেশ করে কোন্ সে পরিণাম?

মার্গারিটা : ভয়ঙ্কর, ভয়ঙ্কর
চিন্তা থেকে যদি মুক্তি পাই কোন মতে
আকাঙ্ক্ষার প্রতিকূলে করে অপরাধী।

সমবেত সঙ্গীত : ঘাড়ের ওপর নামবে যখন রুদ্ররোষের শাপ
থাকবে না আর সুখের দিন করবে পরিতাপ।
(অর্গানবাদ্যের সঙ্গীত)

দুষ্ট আত্মা : মাথার ওপর নামবে এসে স্বর্গের অভিশাপ
তুর্যধ্বনি চমকে ওঠে
ফেটে পড়ে গোর
আত্মা তোমার নতুন রঙে রাঙিয়ে গেল আজ
শীতল ধূলি আর নরকের অগ্নি ভয়ঙ্কর
জাগিয়ে দিল নতুন করে জাহান্নামের ঝড়।

মার্গারিটা : আমি এখান থেকে যেতে পারলে বাঁচি
অর্গানের শব্দে আমার নিশ্বাস বন্ধ প্রায়।
সঙ্গীত শুনে আকুল পরাণ যেন গলে যায়।

সমবেত সঙ্গীত ধর্মরাজ সিংহাসনে আসীন হলে পরে
সকল গুপ্ত প্রকাশ পাবে
কর্ম সকল জাগবে আপন রূপে।

মার্গারিটা : মনে হচ্ছে স্তম্ভগুলো ধরছে চেপে জোরে
ওপরের ঐ খিলান ভেঙে পড়ছে মাথার পর
আহা একটুখানি বাতাস পেতাম যদি।

দুষ্ট আত্মা : লুকাতে চাও
লুকানো কি যায় কখনো লজ্জা এবং পাপ
হতভাগী বাঁচতে এখন আলো বাতাস চাও।

সমবেত সঙ্গীত : গুনাহ্গার বান্দা আমি কি হবে উপায়
কে ত্বরাবে অভাগীরে নিদানের কালে
না জানি ধর্মের রাজ দেয় কোন সাজা!

দুষ্ট আত্মা : শুভবুদ্ধি শুদ্ধ আত্মা ঘৃণায় ফিরাবে মুখ
তোমাকে দেখলে পরে
পুণ্যবান আতঙ্কেতে উঠবে শিউরে
তোমার কোন কুল নাই পাপীয়সী নারী।

সমবেত সঙ্গীত : গুনাহগার বান্দা আমি কি হবে আমার?

মার্গারিটা : (পাশের মহিলার প্রতি)
ভগ্নি তোমার শিশিটি দাও
একটু শুঁকে দেখি।
(মূর্ছাহত হল)

একবিংশ দৃশ্য

ভালপুর্গিস রজনী, মে মাসের প্রথম দিন

[হার্টস পর্বত, ফাউস্ট, মেফিস্টোফেলিস]

মেফিস্টো : ঝাঁটার হাতল চাইকি তোমার শূন্যলোকে উড়তে
জোয়ান ক্ষ্যাপা তাগড়া মোটা পাঁঠা হলে মানায়
চলার পথের চেয়ে লক্ষ্য অনেক অনেক দূর।

ফাউস্ট : শরীর মন তাজা যখন চলতে ভালবাসি
গ্রন্থিভরা কালো লাঠি এই তো আমার সব
রাস্তা সংক্ষেপ করার কোন আছে প্রয়োজন?
মস্ত ঢালু উপত্যকার রহস্য সব দেখে যেতে চাই
তারপরেতে চড়তে চাই আকাশ ছোঁয়া উচ্চ শিখর চূড়ে।
যেখান থেকে ঝর্না নামে তরল রূপার মত
এসব দৃশ্য ভ্রমণকারীর চোখে ঠেকে ভাল
শিরীষ বীথির ফাঁকে ফাঁকে বসন্ত দেয় উঁকি
ঝাউবনে মর্মরিত সুখের শিহরণ
আর আমাদের অঙ্গে অঙ্গে লাগছে নাকি দোলা।

মেফিস্টো : সত্য কহি আমার কোন ভাবান্তর নাই
প্রবল শীতের জাড়ে আমি কাঁপছি সর্বদাই।
যদি হত তুষার ঢাকা কুয়াশা ঘেরা পথ
লাগত ভাল সকল কিছু অরণ্য পর্বত।
আকাশলোকে দিচ্ছে পাড়ি ঘোলাটে এক চাঁদ
অর্ধেক তার ভরা শরীর অর্ধেক তার খাদ।
অল্প শিখায় যায় না দেখা শিলাভরা পন্থ
গাছে গাছে ঢেকে আছে পাই না কোন অন্ত।
তাই তো ডাকি আলেয়ারে ওরে ও মশায়
আলো জ্বেলে উপকার কর দেখ সে চাই;
উঠব ঐ পাহাড় চূড়ায় বাতিখানি ধরুন
দয়া করে একটু একটু পথ দেখিয়ে চলুন।

আলেয়া : আশা রাখি মনেপ্রাণে কাজটা দেব করে
ফাৎরা স্বভাব রাখব বশে লাগাম টেনে ধরে
কিন্তু চলব এঁকেবেঁকে এই আমাদের কানুন।

মেফিস্টো : দুরাচার মানব স্বভাব নকল করতে চাস্
নাক বরাবর চলবি সিধা, যদি শয়তানে ডরাস
তা নইলে আলোক জীবন করব অবসান।

আলেয়া : কর্তামশায় প্রথম চোটেই উচিত ছিল চেনা
যথাসাধ্য তামিল করব হুকুম করুন না
এই সময়ে আমরা সবাই মস্ত হালে থাকি
মাফ করবেন অল্পস্বল্প অনিচ্ছার ফাঁকি।

(ফাউস্ট-মেফিস্টোফেলিস ও আলেয়া একের
পর এক তিনজনের গান)

মনে হয় আমরা এলেম বটে
যাদুর লোক সুখ স্বপনের দেশে
থেমে থেমে জ্বলা আলোর ফুল্‌কি
পথ বেঁধে চল ত্বরিত চমকি
দ্রুত চলে যাও গহীন বিরান
শোকপ্রান্তর পেরিয়ে বিমানে।
ঐ দেখ চেয়ে গাছের উপরে গাছ
গ্রীবা তুলে দেখায় শাখার নাচ,
শৈল চূড়াগুলো মেঘলোক চিরে
আকাশ আলোকে কি যেন নেহারে।
পাহাড়ে পাহাড়ে হাওয়ার ঘষায়
বাঁকা নাক মেলে কে যেন শাসায়।
শিলায় শিলায় আঘাতে জর্জর
ভূমি পানে চলে নদী নির্ঝর
জাগিছে সঙ্গীত কল্লোল কলতানে
বড় মিঠে সুর লাগে নাকি কানে।
বাতাসে খেলিছে মর্মর ধ্বনি
প্রেমিকজনের কাঙ্ক্ষিত অতি
নন্দনলোকের প্রভাতী মধুর গীতি।
আঘাত-বেদনার পরশন ভরা
জাগে প্রতিধ্বনি চঞ্চল করা
প্রাচীন কাহিনী প্রাণ পেয়ে ফিরে
আলোকে পুলকে জাগিছে ধীরে।
পেচক ডাকছে হু-হু চিৎকারে
ভুতুম কেমন পাকশাট মারে

বাজ হেঁকে চলে উর্ধ্ব আকাশে
জাগছে সকলে যাদুর বাতাসে।
উদর ফোলানো অতিকায় টিকটিকি
হামাগুড়ি দেয় ভয়াল ভীষণ একি।
তরুমূলগুলো সাপের মতন
এঁকেবেঁকে শিলা ফাটিয়ে ফাটিয়ে
বালুতে উঁচিয়ে মেলেছে ফণা।
বড় বড় গাঁঠে খেলিয়ে মোচড়
যেন বা পথিকে দেখায় ভেল্কি
ঐ বুঝি ধরে জড়িয়ে পেঁচিয়ে
ভেঙ্গে দেয় সব করে চুরমার।
দলে দলে সব ধেড়ে ইঁদুর
লেজ তুলে তুলে ধরেছে নাচন
সাদা কালো বহু রঙে রঙে লেখা
ঝোপঝাড় ঠেলে চলে সারে সারে
চলে শ্যাওলায় অতি চুপিসারে।
কখনো চলছে কখনো বা দাঁড়িয়ে থমকি
ওরা সব আমাদের মাতাল দিশারী।
বল দেখি চলছি কিনা থির দাঁড়িয়ে আছি
নাকি শুধু অন্ধকারে খেলছি কানামাছি।
কাঁপছে থরথর ভাঙছে জোরে
করছে নাচন কাটছে সাঁতার বীভৎস চিৎকারে
নানান বরণ মুখের আদল
বিকট রকম ভেংচিবাজি করে
আলেয়ারা ডর দেখাতে বাড়ছে চতুর্গুণ।

মেফিস্টো : আমরা এখন উঠে গেছি উচ্চভূমির পরে
আঁকড়ে ধর বসন আমার ভাল মতন করে
দাঁড়িয়ে আছে পাহাড় দেখ উচ্চশিরে হোথায়
কুবের রাজার সোনার প্রাচীর অগ্নির মত ধাঁধায়।

ফাউস্ট : এই আশ্চর্য প্রভাতে
চমকে ঝলকে দেখি অধিত্যকা উন্নত চড়াই
সর্বত্র ছড়ানো স্বর্ণ স্বর্ণে স্বর্ণময়
আবার হঠাৎ দেখি পাতালে মিলায়।
ভেদ করে মেঘের মিনার বাষ্পরাশি
কুহেলির স্তর কখনো বা জাগায় চমক
কখনো উড়ায় তার লঘু উত্তরীয়
মুহূর্তেই মূর্ত হয় প্রাণবন্ত ছুটন্ত ঝরনা।
গোটা অধিত্যকা জুড়ে রূপালি শিখার মত

চমকিছে ঝিলিমিলি আলোর কণিকা।
তারি মাঝে অকস্মাৎ দেখা যায় নয়ন ধাঁধানো
সুউন্নত পর্বত শিখর অদূরে ছড়ানো আছে
থরেথরে স্বর্ণ বালুরাশি।
তারপরে দৃশ্যমান মেঘলোকে খাড়া আশ্চর্য প্রাকার
যেন সর্বগায়ে অগ্নি তার নয়নাভিরাম।

মেফিস্টো : কুবের রাজা দরাজ হাতে এই উৎসবের মেলায়
সাজিয়েছেন প্রাসাদবাটি সোনার আলোকমালায়;
ভাগ্য ভাল দেখতে পেলে বিলাস কারে বলে
গন্ধ পাচ্ছি লোভে অন্ধ অতিথি সব আসছে দলে দলে।

ফাউস্ট : ঝড়ের মত শক্তিরা সব হিসহিসিয়ে বেগে
ঘাড়ে পিঠে চাবুক হানে ভীষণ রকম জোরে।

মেফিস্টো : আঁকড়ে ধর আচ্ছা করে প্রাচীন গিরির হাড়
তা নইলে ঝাপটা মেরে করবে পগার পার।
রাত্রি এখন পরে আছে কৃষ্ণ নেকাব খানি
বনে বনে ঝড়ের নাচন প্রলয়ের হাতছানি।
ভয়ে পেঁচা অন্ধকারে করুণ সুরে ডাকে
সবুজ তরু ঝাপটা খেয়ে সটান পড়ে থাকে।
দানের মত বিশাল গাছের বিরাট কাণ্ডগুলি
মড়মড়িয়ে লুটিয়ে পড়ে শেকড় বাঁধন খুলি।
সমস্ত বন লণ্ডভণ্ড ঝড়ের আক্রমণে।
ত্রাসের কাঁপন শাখায় শাখায় গর্জনে স্বননে।
গিরিখাতের ফাঁকে ফাঁকে ঝঞ্ঝাবাতের চাপ
ফুলিয়ে কেশর কারে যেন দিচ্ছে অভিশাপ।
ওপর থেকে শুনছ সব ক্ষুব্ধ রুদ্র ধ্বনি।
কখনো বা সুদূরে যায় কখনো গায় মধুর আগমনী।
পাহাড়শ্রেণীর ফাঁকে ফাঁকে চলছে আন্দোলন
অবাক করা যাদুর ধ্বনি গম্ভীর গর্জন।

ডাকিনীদের কোরাস
ডাকিনী দল ব্রোকেন পাহাড় চূড়ায় চড়েছে
সোনালি শিষ শষ্যটি তার হরিৎ বরণ হবে
নৃত্যোৎসবে লোকজন আসবে ম্যালারকম
উরিয়ানুস মশায় আসবেন হয়ে সবার শিরোমণি
ঠক ঠক ঠক ঠেকিয়ে লাঠি, রাম পাঁঠার খুশব পাওয়া যায়।

একটি স্বর
শাবকঅলা বরাহ্র পিঠে চড়ে
এই মাত্র বাওবো মশায় এলেন।

কোরাস : যার যেমনটি মানসম্মান তারে তেমন দাও।
আরে, আরে, বাওবো-গিন্নি আসুন।

সবার আগে মিছিলটিরে পথ দেখিয়ে চলুন।
তাগড়া জোয়ান শূয়রটি, সঙ্গে আছে ছা
ডাকিনীদের জোর কদমে পথ দেখিয়ে যা।

একটি স্বর : কোন্ পথে এলে তুমি?

অন্যস্বর : ইলসেন পাহাড় পেরিয়ে
বাসায় এসে দেখি পেঁচক মশায় দিব্যি বসে আছে
আমায় দেখে বলব কি তার চক্ষু ছানাবড়া।

স্বর : নরকে যাও, কে বলেছে হাঁকিয়ে জুড়ি
অমন বেগে আসতে?

অন্যস্বর : এই দ্যাখ না বেটি আমার কেমন মেরেছে
পিঠের ছাল কেটে গিয়ে রক্ত ঝরেছে।

ডাকিনীদলের
কোরাস : চওড়া বটে, লম্বা বটে রাস্তাটির বিশাল আয়তন
কোথা হতে এল এসব ডাক-ডাকিনীর বাথান
ঝাঁটার আচড় লাগে গায়ে ফুটছে কাঁটা পায়ে
ধড়ফড়িয়ে মরবে শিশু গর্ভ যাবে ফেটে।

ডাক-ডাকিনীর
অর্ধ কোরাস : শামুক যেমন ধীর গতিতে চলছি আমরা
লেজের দিকে মর্দ সব সামনে জেনানা
খারাপ কাজে যদি তুমি পাল্লা দিতে চাও
হাজার কদম এগিয়ে কিন্তু জেনানারাই রবে।

দ্বিতীয় অর্ধ কোরাস : এসব কিন্তু আমরা সবে সয়ে যেতে পারি
যত ইচ্ছা এগিয়ে থাকুক অপোগণ্ড নারী
হাজার পা এগিয়ে তারা আর কতদূর যাবে।
পুরুষেরা একটি লাফে মঞ্জিল ছুঁয়ে যাবে।

স্বর (উপর থেকে) : সঙ্গে এস পাহাড়ঢাকা হ্রদের ভেতর থেকে।

স্বর (নিচে থেকে) : যদিও ধুই হাজারো বার দাগ যায় না তবু
চিরকেলে নিস্ফলা আর বন্ধ্যা থেকে যাই
কেমন করে উর্ধ্বলোকে করি আরোহণ।

ডাক-ডাকিনীর
কোরাস : স্তব্ধ বাতাস, তারারা সব মলিন হয়ে গেছে
বিষাদে চাঁদ মুখটি ঢেকে আছে
ডাকিনীরা উচ্চরবে উর্ধ্বে তোলে বোল
হাজার হাজার অগ্নি শিখায় জাগল অট্টরোল।

স্বরগুলো
(নিচ থেকে) : একটু দাঁড়াও যেয়ো নাকো চলে।

স্বর (উঁচু থেকে) : অন্ধকার গুহা হতে ডাকছ কাহারা?

স্বর (নিচ থেকে) : মিনতি করি সঙ্গে আমায় নাও
এই রকম তিন শ' বছর ধরে
যাদুর চূড়ায় চড়ার জন্য যাচ্ছি কোশেশ করে
বন্ধুস্বজন খুঁজে বেড়াই পাই না দেখা কারো।

মিলিত কোরাস : ভার বইবে ঝাঁটা ঊর্ধ্বে তুলবে লাঠি
ঝাঁটা আর পাঁঠায় চড়ে উড়ছে কতজন
অদ্য যেজন ঊর্ধ্বদিকে উঠতে নাহি পারে
বরবাদ তার বরাতখানি চিরদিনের তরে।

অর্ধ ডাকিনী
(নিচ থেকে) : অনেক কাল চড়ছি আমি একটু একটু করে
অন্য সবাই পিছে ফেলে উঠল ওপরে
ভয়ে ভয়ে থাকি ঘরে শান্তি সুখ নাই
এখানেও বাড়া ভাতে পড়ে গেছে ছাই।

ডাকিনীদের
কোরাস : সাহস যদি হারায় তবে দিলাম তেজি মালিশ
ফাটা ছ্যাঁড়া তেনা আজ হবে পোতের বাদাম
অদ্যরাত্রে তোমার জাহাজ যদি উড়তে নাহি পারে
রসাতলে থাকবে তুমি যুগযুগান্তর ধরে।

মিলিত কোরাস : উচ্চ চূড়ায় চড়ে সবাই নামব ভূমিতলে
ছড়িয়ে যাব সকলখানে আমরা দলে দলে
হোক-না উঁচু ব্রোকেন চূড়া আকাশ মাথার পর
ডাকিনীদের কলরোলে কাঁপবে থরথর।
(তারা অবতরণ করল)

মেফিস্টো : এইখানে ধাক্কাধাক্কি, ঠেলাঠেলি
উচ্চলম্ফ উদ্দণ্ড চিৎকার
অট্ট অট্ট [illegible] ঘট্ট ঘোর গণ্ডগোল
ফুটন্ত স্ফুলি[illegible] আর দুর্গন্ধের তীব্র বাড়াবাড়ি
এই হল সত্যিকার ডাকিনীর কাজ।
থাক কাছাকাছি পাছে যদি ভিন্ন হয়ে যাই
জানা আছে জনাবের আমরা কোথায়?

ফাউস্ট : এই তো এখানে।

মেফিস্টো : আসল পথ ছড়িয়ে তুমি গেছ অনেক দূর
তাই তো আমার করতে হচ্ছে একটু খবরদারি।
পথ করে দে লোক সকলে রাজার কুমার
ফোল্যান্ড এবার যাবে, পথ করে দে লোকসকলে।
মুহূর্তও দেরি নয় পণ্ডিত মশায়, আমার আলখেল্লা
তুমি ধর দৃঢ় হাতে, মুক্ত হই।

দ্রুত বেগে করি অন্তর্ধান, এমন জঘন্য লীলা
শয়তানেরও বিতৃষ্ণা বাড়ায়।
অদূরে মশাল শীর্ষে যে আগুন উঠছে চকমকি
চল সেইখানে, বুঝে নেই রহস্য কোথায়
ঝোপের আড়ালে গিয়ে দাঁড়ালে একবার
দৃষ্টির অতীত হব নিশ্চয়ই সবার।

ফাউস্ট : মনে মনে যে সংকল্প করেছ গ্রহণ
চল সেই পথে পাপিষ্ঠ পামর
কথা ছিল ভালপুর্গিস পূর্ণিমার রাতে
নির্জনতার স্বাদ নিতে আমরা দুজন
নীরবে ব্রোকেন শীর্ষে করব আরোহণ।

মেফিস্টো : ঝোপের ভেতর দেখ সতেজ আলোর রেখা
দলে দলে আলাপ-সালাপ করছে মনের মতন
নির্জনতা সঙ্গী পেয়ে উঠছে যেন হেসে।

ফাউস্ট : তবু আমি ঐখানে ঐ উঁচু স্থানে যাব
উঠছে ধুম আকাশ পানে, আগুন জ্বলছে ভয়ঙ্কর
শয়তানের আত্মা করে মনুষ্য শাসন
অবশ্যই অনেক ধাঁধার হচ্ছে অবসান।

মেফিস্টো : অনেক ধাঁধা জন্মও লয় এটি হল রীতি।
এই যে আমরা বসে আছি শান্ত নিরিবিলি
মাতাল জগৎ গোল্লায় যাক বলতে পারি বটে।
বিরাট জগৎ ছেঁকে আমরা ক্ষুদ্র জগৎ গড়ি
তরুণ তরুণ ডাকিনীদের ন্যাংটা দেখে সুখ
বুড়িরা সব অঙ্গ ঢেকে ছলাকলা করে
জিভ নিকালে, চোখের ঠারে বাত্তিরটুকু দেখায়।
অল্প আয়াসে বেশি মজা তবে কিসের কারণ
বাদ্যযন্ত্রে উঠেছে বেজে তালবেতালের ধ্বনি
অতিশপ্ত আওয়াজ বটে, কিন্তু এটা রীতি।
চলেন জনাব আর দেরি নয় ঢোলের বাদ্য টানে
হাতে ধরে নিয়ে যাব মজার মধ্যিখানে
আপন মুখে ধন্য ধ্বনি করবে উচ্চারণ।
কী বললে ক্ষুদ্র মেলা দৃষ্টি মেলে দেখ
বিশাল বিরাট বিস্তৃতি তার হাজার মশাল জ্বলে
তারা কথা বলে, নৃত্য করে, পদ্য বানায় নতুন
পান করে ভালবাসে বর-বধূর মতন।
এমনতর জাঁকাল শোভা দেখবে কোথায় আর!

ফাউস্ট : যখন সবার সঙ্গে মুলাকাতে যাবে
শয়তান বা যাদুকর কোন্ পরিচয় দেবে?
মেফিস্টো : দশের এক হতে আমার আপত্তি তো নাই
কিন্তু এমন মজার দিনে পদকটদক একটু পরা চাই।
মোজার নতুন ফিতা বাঁধার প্রয়োজন কি হয়
ঘোড়ার ক্ষুরে জানবে সবে আসল পরিচয়।
দেখতে কি পাও শামুক মশায় আসছে ধীরে ধীরে
নরম শুঁড়ে টের পেয়েছে আঁধার নৃপতিরে।
প্রজাকুলের মধ্যে আমার গোপন থাকা সহজসাধ্য নয়
চল এসব মশাল টশাল পেরিয়ে যেতে হয়
তুমি হবে প্রেমিক পুরুষ আমি তোমার ফড়ে।
(জ্বলন্ত কয়লার পাশে বসে যে ক'জন লোক আগুন পোহাচ্ছে তাদের প্রতি)
প্রবীণ সবাই গোমরা মুখে বসে আছেন বেশ
এগিয়ে গিয়ে আসন নিলে কিসের এমন দোষ।
যৌবনের হৈ হুল্লোরে গাটি গরম করুন
নিভে যাওয়া যৌবন প্রদীপ উসকে তুলে ধরুন।
ঘরের মধ্যে সবাই তো নিজের ভাবে থাকে
নতুন প্রাণ পাখনা মেলে উৎসবের ডাকে।
সেনাপতি : জাতিগুলো সব সময়ে নতুন কিছু চায়
ওদের পরে আস্থা রাখা বড্ডো বিষম দায়।
জান মাল দিয়ে তাদের যতই করুন পোষণ
দেখতে পাবেন নারীর মত স্বভাব তাদের কোপন।
আখেরেতে যুবকদেরে সবাই তারা চায়
এটা অতি সরল সত্য কিন্তু টিন্তু নাই।
মন্ত্রী : দুঃখ আমার বলে তো ভাই যায় না শেষ করা
প্রাচীনকালের মানুষ ছিল মুনিঋষির বাড়া
মন্ত্রিদের মুখের কথা ছিল তখন বিধান
স্বর্ণযুগের ভাবনা ভেবে করি দুঃখে রোদন।
মুনাফাখোর : সব সময়ে আমরা কিন্তু ছিলাম হুঁশিয়ার
ন্যায়ান্যায় কোনরকম করিনি বাছবিচার।
ভাবলাম যখন মুঠির ভেতর শক্তি আছে বলে
দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে দেখতেছি শেষকালে।
গ্রন্থকার : তত্ত্বভরা কেতাব টেতাব পড়তে কে চায় এখন
হাল আমলের পড়ুয়াদের আজব ধরন ধারণ।
মেফিস্টো : (হঠাৎ তাকে অশীতিপর বৃদ্ধের মত দেখাল)
ব্রোকেন পাহাড় চূড়ায় আমার এই শেষবার চড়া

দিব্যি চোখে দেখতে পাচ্ছি খতম হবে ধরা
আমার ছোট্ট ভাণ্ডার দেখি উজাড় হল প্রায়
দুনিয়াটার টিকে থাকার আর তো উপায় নাই।

পসারিনী ডাকিনী : মশায় অমন নিরাশ করে চলে যাবার আগে
দয়া করে নয়ন মেলে পসরাগুলো দেখুন।
এই ডালাতে থরে থরে আছে সাজানো
নানান রকম বিরল জিনিস নয়ন লোভানো।
দোকান ভর্তি পণ্য ম্যালা জুড়ি পাওয়া ভার
ক্ষয়-ক্ষতিতে সংসারেতে তুলছে হাহাকার।
এই যে যত ছুরি দেখেন খুন পিয়ে লাল হয়েছে
পেয়ালাগুলোয় হলাহলের তীব্র আরক রয়েছে।
শেষ করেছে হাজার জীবন পূর্ণ হওয়ার আগে
চেয়ে দেখুন মুক্তামালা দেখতে কেমন লাগে।
সতীত্বের গর্বগাথা নাশ করেছে হঠাৎ
আরো দেখুন তরবারি মুহূর্তেরই ঝলকে
বিশ্বাসহন্তার হাতে পড়ে চোট মেরেছে পলকে।

মেফিস্টো : থামাও এসব আদ্যিকালের রদ্দি যন্ত্রপাতি
সময় ধায় ঘোড়ার পিঠে তীব্র তার গতি
বেচতে যদি চাও তো তুমি নতুন কিছু আন
নতুনেরই জয়জয়কার এই কথাতো মান।

ফাউস্ট : ডাকিনীদের এই যে বিরাট যাদুর মেলায় এসে
ভয় লাগে, বোধবুদ্ধি হারিয়ে ফেলি শেষে।

মেফিস্টো : ঘূর্ণচক্র উপর দিকে ঠেলছে তোমায় তুলে
ভাবছ তুমি ঠেলছ ওদের প্রাণপণ বলে।

ফাউস্ট : কিন্তু কে আসে ঐ?

মেফিস্টো : কেউই না আসছে লিলিথ।

ফাউস্ট : কে সে?

মেফিস্টো : আদমের প্রথম বিবি দেখ কেশের বাহার
এইটিই তার ব্রহ্মাস্ত্র যুবক পুরুষ ধরার।
যখন কোন পুরুষ আটকা পড়ে জালে
মুক্তি তার কচিত ঘটে সহজ সরল হালে।

ফাউস্ট : দেখ তরুণ ডাকিনী এক
বৃদ্ধার সঙ্গে নেচে হল সারা
মত্তহালে নাচে দুজন
যেন পাগল পারা।

মেফিস্টো : আজকে জোর নাচের মৌসুম শান্তি কোথা বল
ভিড়ের মধ্যে আমরা দুজন নাচতে থাকি চল।

ফাউস্ট : (এক তরুণী ডাকিনীর সঙ্গে নাচতে নাচতে)
একদা এক মধুর স্বপ্ন দেখেছিলাম
একটি তাজা আপেলতরু জন্ম নিয়েছে
সেই তরুতে একটি জোড়া আপেল ফলেছে
আপেল পাড়তে সেই গাছেতে
দিব্যি চড়েছিলাম।

সুন্দরী ডাকিনী : স্বর্গলোকে আপেল জোড়া
ফলে ওঠার থেকে
তোমার অবুঝ মন কেড়েছে
ঈশারাতে ডেকে।
স্বীকার করি আগুন ভরা
হৃদয়খানি দিয়ে
গর্ব আমার ছিল ভীষণ
আপেল দুটি নিয়ে।

মেফিস্টো : স্বপ্ন দেখছি শুয়ে একা
গাছের মধ্যিখানে ফাটা
বিরাট বড় তবু আমার
সুখ হল না ভাটা।

বৃদ্ধা ডাকিনী : ক্ষুর চরণের প্রেমিক মশায়
সালাম হাজার বার
আটকে রাখুন খুঁটি দিয়ে
গর্তখানি ফাটার!

স্যার টিউনিক অভিশপ্ত মানুষগুলো সেই পুরাতন ছাঁদে
চেয়ে দেখ পড়ছে আবার ফাঁদে।
বলেছি তো ভূত ভূতানীর মানুষের পা নাই
তবু নরকুলের মত তাদের নাচন করা চাই।

সুন্দরী ডাকিনী : আমাদের এই নাচের মেলায়
ওঁর কি প্রয়োজন?

ফাউস্ট উনার কথা ভেবে বিশেষ লাভ হবে বা কার
সবাই নাচে উনিই দেন যোগ্য পুরস্কার।
সকল পদক্ষেপে উনি দোষটি খুঁজে পান
যখন তখন সুযোগ পেলে বাক্য বলে যান।
যদি চলি সমুখ পানে, লাট্টুর মত মাথা
ঘুরিয়ে বলবে কিচ্ছু না, হচ্ছে এমন যা তা।
বৃত্তাকারে যদি নাচি তবুও ঘ্যানর-ঘ্যানর
শুনতে হবে জবাব নেই সকল রকম কেনর।
যদি দাও তার পানে একটু নেক নজর
ছন্দ আর মুদ্রাগুণে দেবে খোশ খবর।

স্যার টিউনিক : বাতুল সবাই ডাক-ডাকিনী নাচতে আরো চায়
লম্ফ-ঝম্ফ, এতে তো নেই শিল্পকলার সায়,
আইন-কানুনের ধার ধারে না সব শয়তানের চ্যালা
সব কিছুতে আনবে টেনে ট্যাগেল গাঁয়ের পালা।
সুদীর্ঘ দিন খ্যাংড়া পিঠে পাগলামির এই বিষ
ছাড়িয়ে দিতে এদের সঙ্গে লড়ব অহর্নিশ।

সুন্দরী ডাকিনী : ঢের শুনেছি মশায় তোমার
ঘ্যানর ঘ্যানর থামাও।

স্যার টিউনিক : পষ্টাপষ্টি বলি ডাক-ডাকিনীর কাণ্ডকারখানা
আমি থাকতে ওসব কিন্তু চলতে দেব না
অট্ট ঘট্ট লম্ফ ঝম্ফ যতই দেখি হায়
ঘৃণার তোড়ে পেটের ভাত উগরে আসতে চায়।
(নাচ চলতে থাকে)
ব্যর্থ হলাম আজকে বটে সামনে তো দিন আছে
দেখি সব ডাক-ডাকিনী কেমন করে নাচে
যেখানেতেই যাবে তারা আমি হব হাজির,
ডাক-ডাকিনী কবির সঙ্গে যুদ্ধ হবে বাজির।

মেফিস্টো : হুজুর এখন আরাম করছেন ডোবার ভেতর বসে
এই ভাবেতে অনেকখানি ক্লান্তি যাবে খসে
পশ্চাদ্দেশের রক্ত পিয়ে যখন জোঁকগুলো
সব তাগড়া মোটা হবে
মুখের আদল পাল্টাবে আর বাতিক
কেটে যাবে।
(নাচ থামিয়ে ফাউস্টকে বসে থাকতে দেখে)
সঙ্গীত নিপুণ সঙ্গীনিরে করলে পরিহার
সেই তো ছিল আজ রজনীর শ্রেষ্ঠ পুরস্কার।

ফাউস্ট : মিথ্যা নয় গান করে সে ভাল
কিন্তু প্রতি বাক্যে মুখের থেকে লোহিত বরণ মুষিক
বেরিয়ে আসে, কেমন করে সহ্য করি বল।

মেফিস্টো : এসব অতি তুচ্ছ বিষয়, যদি হত ধুমসী বুড়ি
কুঁকড়ে যেত ঠোঁট, ধর্মকর্মের কথা শুনে
লাগত মনে চোট
কিন্তু এমন ভালোবাসার দহন ভরা রাতে
ছোটখাটো মিষ্টি ওজর কিই-বা এমন তাতে!

ফাউস্ট : তারপর দেখলাম।

মেফিস্টো : কি দেখলে?

ফাউস্ট : মেফিস্টো যেখানে দাঁড়িয়ে তুমি
সেইখানে ছিল অনিন্দিতা কন্যা এক মলিন বদন

প্রতিটি চরণপাতে দুঃখ ঝরে পড়ে
দেখামাত্র চিনে গেছি, গ্রেচেন আমার
নয়ন সমুখে ভাসে সর্ব অঙ্গ তার।

মেফিস্টো : এই কথা, অতি মন্দ এই সন্দর্শন
এসব দেখেছ তুমি যাদুর কারণে
লেখা ছিল তার ভাগ্যে ভীষণ ভোগান্তি
শিরোদেশে রক্ত জমে বন্ধ হয় গ্রন্থি
এই রোগ অনেকেরই মৃত্যুর কারণ
প্রাচীন বেভুস গ্রন্থে আছে বিবরণ।

ফাউস্ট : সত্যি সত্যি দৃষ্টি প্রায় মৃত মানুষের
নীরব নিথর স্তব্ধ যেন দর্পণ দুঃখের
গ্রেচেনের বক্ষদেশ মূর্তিমতী উষ্ণ ভালবাসা
দেখে তারে মনোলোকে হঠাৎ সহসা
বেঁধেছে অন্তরে আহা বাসনার বাসা।

মেফিস্টো : এ ঘটেছে শক্তিশালী যাদুক্রিয়া থেকে
প্রতি মূর্খ নিজ প্রিয় রমণীকে দেখে।

ফাউস্ট : কি প্রেমের ব্যাকুলতা, নিদারুণ ব্যর্থতার দাহ
সেই শূন্য দৃষ্টি রজ্জু হয়ে টানে অহরহ
অধিকন্তু কি বিস্ময় মধুময় অধরের নিচে
ছুরির ফলার মত রক্তময় চিহ্ন বিরাজিছে।

মেফিস্টো : সত্য বটে সে খবর বলি বেশি করে
দীর্ঘদিন মস্তক রেখেছে বটে বাহুর ওপরে।
হয়ত এমনও হবে কাটা যাবে খাড়ার আঘাতে
ওসব দেখেছ তুমি যাদুর সম্পাতে।
কথা রাখ শীঘ্র চল আন পাহাড়ে যাই
এমন মধুর দৃশ্য ভিয়েনার নাই।
সেইখানে জমকালো হচ্ছে থিয়েটার
কর্মসূচি কি কি হবে বল অদ্যকার।

থিয়েটারের নট যে নাটকটি দেখাব আজ সাত নাটকের সেরা
নাট্য লেখক শৌখিন কিন্তু পেশাদারের বাড়া
নট নটি শৌখিন সবাই তবে নাট্যকলায় পাকা
ক্ষমা করুন মশায় সকল এখন যেতে হবে
অপেশাদার নট হিসেবে পর্দা তুলতে হবে।

মেফিস্টো : তুষ্ট হলাম হার্টজ পাহাড়ে তোদের সকল কথায়
সকল রকম নবিশগিরি এই পাহাড়ে মানায়।

দ্বাবিংশ দৃশ্য

ভালপুর্গিস স্বপ্ন রজনী

[ওবেরন এবং টিটানিয়ার বিবাহের সুবর্ণ জয়ন্তী; একটি গীতি নাট্যের অভিনয়]

অধিকারী : এই কাহিনীর জন্য প্রয়োজন
মিডিং দেশের মানুষ আর শ্যাওলাঢাকা পাহাড়
আরাম আয়েশ, আর একটুখানি উপত্যকার ধার।

ঘোষক : পঞ্চাশ বছর পূর্ণ হলে তারপর হবে স্বর্বনজয়ন্তী
ভয় ধরানো ঝগড়াঝাটির অন্তে পাওয়া মধুর প্রশান্তি

ওবেরন : চলে এস তোমরা সবাই ভূত ভূতানীগণ
এই অভিনব উৎসব কাণ্ড কর উদযাপন
রাজা এবং রানী আবার করেন মুলাকাত
প্রেমের মুকুট পরাও শিরে জানাও ধন্যবাদ।

পুক : পুক এলগো হনহনিয়ে
খ্যাংড়া পায়ে নেচে
শত শত লোকলস্কর ঘোরে আশেপাশে
তারা নাচে গায় বাদ্য বাজায় খলখলিয়ে হাসে।

এরিয়েল এরিয়েল বাজায় এখন স্বর্গলোকের বীণা
চেকন সুরে চমকে ওঠে হাল্কা মধুর তান
ভালমন্দ সকল মানুষ সুর করবে পান।

ওবেরন : বিবাহিত দম্পতি যারা চায় সবার আশীর্বাদ
তাদের কাছে একটি কথা বলি পত্রপাঠ
প্রেমের স্বাদ ভাল করে পেতে যদি চাও
স্বামী-স্ত্রী ভাল করে তফাৎ হয়ে থাক।

টিটানিয়া : কর্ত্রী যখন ক্ষ্যাপার মত করে ব্যবহার
কর্তা যখন মনের দুঃখে করেন মুখ ব্যাজার
তখন তাদের হ্যাঁচকা টানে ধরে
কর্ত্রীটিকে মেরুর দেশে ছুঁড়ে ফেলে দেবে
কর্তাটিকে গরম দেশের হাওয়া খিলাবে।

ঐকতানিক

দলের নায়ক : মাছির নাক, ডাঁশের শুঁড়
এবং তাদের গোষ্ঠী-গেয়াত সকল
ঘাসের ফড়িং তারি সঙ্গে ঝোপের কোলা ব্যাঙ
যুক্ত হলে জমে মধুর ঐকতানের সঙ।

এক বাদক এখন বড় মধুর সুরে ব্যাগপাইপ বাজে
সুরের যত কেরামতি ব্যাগের ভেতর রাজে
থ্যাবড়া নাকের গতিবিধির সঙ্গে মিলিয়ে
শুনতে হবে লারেলাপ্পা হৃদয় ভরিয়ে।

উঠতি কবি : ক্ষুদ্র চতুষ্পদে দাও পাখনা দুলিয়ে
মাকড়সার চরণ কিংবা ব্যাঙের উদর নিয়ে
অবাস্তবের কাব্য লিখি কলম খেলিয়ে।

বামুণ কবি যুগল : উর্ধ্বদিকে লম্ফ দিয়ে
শিশির স্নাত ঘাসের পরে হাঁটা
যাওয়া তোদের হয় না কোথা
কারণ চরণ দু'টো খাটো।

কতূহলী মুসাফির : সত্য হোক, মিথ্যা হোক, স্বপ্ন দেখেছি
এই প্রান্তরে দর্শন দেবেন দেব ওবেরন।

গোঁড়া ক্ষুর নেই, নেই কোন লেজের দীর্ঘ বহর
অনুমানে দেখতে বটে গ্রিক দেবতার দোসর
তবু শয়তান সুনিশ্চিত ঠিক করেছি ঠাহর।

উত্তর দেশের শিল্পী : আমি জানি ক্যানভাস ভরা শুধু আঁকিবুঁকি
শিল্প শিখতে ইতালিতে নিচ্ছি যাওয়ার ঝুঁকি।

নীতিবাগিশ : দুঃখের কথা এই তামাশার ভিড়
বাড়ছে ভীষণ নোংরা মতন
ডাকিনীদের মধ্যে দেখি দুজনারই মুখে
মাজন মাখা আর সকলে ফাঁকা।

তরুণী ডাকিনী : পেটিকোট আর মাজন ওসব
ধুমসী বুড়ি যৌবনহীনার চাই
এই দ্যাখনা পাঁঠায় চড়ে ন্যাংটা গতর দেখাই।

গিন্নী : গা করি না তরুণীদের তরল পরিহাসে
জরা আর বার্ধক্য তাদের দোরগোড়ায় হাসে।

ঐকতান পরিচালক : মাছির সার, ডাঁশের ঝাঁক
মিষ্টিমুখী নগ্নিকাকে ছেড়ে তোরা আয়
কোলা ব্যাঙ আর ঘাস ফড়িং নেচে নেচে যা।

সুযোগ সন্ধানী : (একদিকে তাকিয়ে)
চেয়ে দেখ থরে থরে জমেছে কেমন কাণ্ড
যেদিক পানে তাকাও তুমি দেখবে মজার ভাণ্ড।
কনেরা সব সেজেগুজে দলে দলে ঘুরে
যুবকেরা মধুর নেশায় বেড়ায় উড়ে উড়ে।
(অন্যদিকে তাকিয়ে)
যত সকল হারাম কাণ্ড কবর না দিলে
পালিয়ে বাঁচতে পারবনাকো যাব রসাতলে।

স্কেনিয়া : ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধারাল অতি বর্শাফলা দিয়ে
আমরা সব পতঙ্গেরা ছুটে এলেম ধেয়ে
আমাদের মহান পিতা শয়তান মহাশয়
তার উদ্দেশ্যে সালাম জানান এই তো উচিত হয়।

হ্যানিংগস : দেখ সবাই একজোটে কেমন খোঁচা মারে।
অথচ বলছে তাদের হৃদয় আছে অনিষ্ট না করে।

এ্যাপোলো : এসব ডাক-ডাকিনীর সঙ্গ আমার লাগে চমৎকার
কলা চর্চার চেয়ে তারা অনেকগুণে ভাল।

যুগ প্রতিভা ধর সবাই আমার নাগাল সঙ্গে সঙ্গে এস
ছাড়িয়ে যেতে পারবে না কেউ গতির তরঙ্গে
জার্মানির পার্নাসুস কেমন চওড়া সুবিস্তার
যেমন উঁচু তেমন খাড়া ব্লকসবার্গের পাহাড়।

কতূহলী মুসাফির : জাঁকালো ঐ লোকটি কে রে লম্ফ দিয়ে চলেন
যেন সবখানেতে জেসুইটদের গন্ধ খুঁজে ফেরেন।

বকধার্মিক : স্বচ্ছ জলে মৎস্য ধরা সহজ অতিশয়
ঘোলাজলে কাজটি কিন্তু তেমন মধুর নয়।
তাই তোমাদের ধর্ম অন্ধ মানুষ সারে সারে
সবান্ধবে যাচ্ছে ছুটে শয়তানের খোয়ারে।

একজন
পৃথিবীর মানুষ প্রমাণসিদ্ধ পন্থা পেলে মানুষ সকল পথে যায়
এমনকি ব্লকসবার্গেও একটা দু'টা মাজার গড়তে চায়।

নাচিয়ে : নতুন এক নাচের দলের শুনি আগমনী
দূরের থেকে ভেসে আসে ঢোলের বাদ্যধ্বনি।
আসল কথা বলব কি ভাই যাই বলিহারি
তাল নাই বোল নাই পাখির মারামারি।

নৃত্য পরিচালক মোটা পা চেকন পা সবাই সমান লাফায়
নাচের যে জন জানে না
সেও শরীর বাঁকায়।

বংশীবাদক : অর্ফিয়ুসের বাজনা যেমন জন্তুজগৎ নাচায়
তেমনি এরা ব্যাগপাইপের আওয়াজে পা মেলায়।

নীতিনিষ্ঠ গোঁড়া : শোরগোল চিৎকারে তালা ধরে কানে
সমালোচক যতই বলুক হয় না কোন মানে
আমি জানি শয়তান আছে
নইলে এসব কোথা হতে এল।

আদর্শবাদী : চিন্তাধারা হতে পারে দারুণ স্বেচ্ছাচারী
সকল চিন্তা যদি দিত অন্তরে চিৎকার
কবে পাগল হয়ে পেরিয়ে যেতাম ভবসিন্ধুর পার।

বস্তুবাদী : জ্ঞানতত্ত্ব যে কাউকে পাগল করতে পারে
তার শাখা সূত্রগুলো আরো ভয়ঙ্কর
অত খারাপ ছিল না তো আমার দৃষ্টিকোণ।

অতিপ্রাকৃতবাদী : এই উৎসবে সবার সঙ্গে কাল কেটেছে ভাল
মন্দের পাঠ নেয়ার পরে, বুঝি ভালও তাই আছে।

সংশয়বাদী : তারা ভাবে আল এবং ধোঁয়ার মধ্যে
স্বর্ণ খুঁজে পাবে
শয়তানের বোলচালে মাথা রাখি ঠিক
যার যা ইচ্ছা বলুক আমি হারাই না দিক।

ঐকতান পরিচালক : ঘাস ফড়িং, কোলা ব্যাঙ
নবিশ বটিশ তোরা
মাছির ঝাঁক, ডাঁশের পাল বাদ্যি বাজা চড়া।

চালাক জন : সকলখানে আমরা শুধু ফুর্তি খুঁজে বেড়াই
পদযুগল অচল হলে মস্তক দিয়ে হাঁটি।

অনভিজ্ঞের দল : সময়কালে আমরাও ভোগ করেছি অনেক
খোদার লীলা সেসব এখন শোনায় পরিহাস
শতচ্ছিন্ন পায়ের জুতো নগ্ন পায়ে চলি।

আলেয়ারা : জলাভূমির মধ্য হতে আমরা আসি ছুটে
দুলকি চালে চড়কি বাজির মত উঠি ফুটে
সার বেঁধে আমরা যখন নাচের দলে মিশি
উজল শোভায় সাজিয়ে তুলি কালোবরণ নিশি।

উল্কারাজি : তারায় তারায় ঘষা খেয়ে ফুলকি জ্বেলে আসি।
ঘাসের ভেতর ছিটকে পড়ি কক্ষ থেকে খসি।

অতিশরীর ধারীগণ : হেই সকলে রাস্তা ছাড়ো আমরা এলাম বলে
ঘাসের বুক লণ্ডভণ্ড করব সদলবলে।
কেমন ভারি শক্ত মোটা অতিকায়ের শরীর
এই লগনে নাচন করে করব সবে জাহির।

পুক : হাতির বাচ্চা রইবে নীরব মায়ের কাছাকাছি
এই সভাতে সবার সেরা আমি একাই আছি।

এ্যারিয়েল : নিসর্গের কাছে পেলাম পাখানা উপহার
গুঞ্জরণে খুলে দেবে মনোলোকের দ্বার
এ্যারিয়েলের সঙ্গীত ধ্বনি মনেপ্রাণে ভুঞ্জে
উড়ে উড়ে এস সবাই, বল গোলাপের কুঞ্জে

ঐকতান : (একটিমাত্র পিয়ানোসহকারে)
হটো ওগো মেঘের মিনার কুয়াশা সব সরো
শিশিরভেজা ঘাসপাতায় আলোর লুকোচুরি।
নল খাগড়ায় রোদন করে নীরব হাওয়ার বীণা।
আমাদের এই উৎসবরাত সাঙ্গ হল কিনা।

ত্রয়োবিংশ দৃশ্য

উন্মুক্ত প্রান্তর, একটি দুর্যোগঘন দিন

[ফাউস্ট-মেফিস্টোফেলিস]

ফাউস্ট : হতাশ আর গভীর দুঃখের জর্জর। পৃথিবীর
বুকে দীর্ঘ করুণ পদচারণা অন্তে সুন্দরী
সুকুমারী নারী, এখন কারাকক্ষ তার আশ্রয়স্থল
তার চাইতে দুঃখী কেউ নেই। আতঙ্ক এবং যন্ত্রণায়
তার প্রহর কাটে। হায়রে এমন ছিল তার ললাট লিখন।
বিশ্বাস ঘাতক পামর শয়তান, একথা তুই আমার
কাছ থেকে গোপন রেখেছিস। এখন আমার
সামনে দাঁড়িয়ে তোর শয়তানী ক্রোধ প্রকাশ
করছিস, রোষ কষায়িত নয়নে আমাকে বিঁধছিস।
তোর ঘৃণ্য উপস্থিতি দিয়ে আমার যন্ত্রণা হাজার
গুণ বাড়িয়ে তুলছিস্। কারানিবাসিনী সে,
অজস্র নির্যাতনে পীড়িতা। শয়তান এবং পাষণ্ড
হৃদয়হীন মানুষদের বিচারের কাঠগড়ায়
পাঠিয়ে আমাকের তুচ্ছ, নিকৃষ্ট ভোগসুখে
মত্ত রেখেছিস। আমার কাছ থেকে তার
অন্তহীন দুঃখের কথা লুকিয়ে রেখে একাকী
সহায়হীন বান্ধবহীন তাকে সর্বনাশের মুখে
ঠেলে দিয়েছিস।

মেফিস্টো : সে তো আর প্রথম মেয়ে নয়।

ফাউস্ট : ঘৃণ্য নরকের কীট, কুৎসিত দানব
হে পৃথ্বিআত্মা আর একবার তুমি এই
সরীসৃপকে সারমেয় সন্তানে পরিণত কর
যে বেশে সে রাতের বেলা আমার সামনে
কুঁইকুঁই করে ঘুরে বেড়াত। নিরীহ পথচারীর
পদতল চাটত অথবা ছুটে গিয়ে তার ঘাড় কামড়ে

ধরত। আর একবার তাকে তার প্রিয় জানোয়ারের
রূপদান কর, যাতে সে সারা পেটে কাদা
মেখে বুক দিয়ে আমার সামনে হাঁটে। আমি
তাকে সমস্ত ঘৃণা দিয়ে পদদলিত করি।
কি চমৎকার কৈফিয়ৎ! এই তো একমাত্র মেয়ে
নয় গো। মানুষের বোধ উপলব্ধির অতীত এই
যন্ত্রণা, এই বেদনা। অপার করুণাময় ক্ষমাশীল
খোদাতালা এক হতভাগিনীর এই মর্মান্তিক
দুঃখভোগে বিচলিত হয়ে অন্য সকল মেয়ের
দুঃখ বেদনার ভার কি লাঘব করবেন না।
এই একজনের দুঃখে আমার অন্তরের শিরা
উপশিরা ছিঁড়ে যাওয়ার উপক্রম। আর কিনা
সহস্র মেয়ের দুঃখ দেখে তুই দন্তপাটি বিকাশ
করে হাসছিস।

মেফিস্টো : বাস, এইখানে তোমাদের আর আমার
বোঝাবুঝির ছেদরেখা টানা উচিত। তার অর্থ
এই যে মানুষের সহ্যশক্তি খুবই সামান্য, তারপরেও
আমাদের সঙ্গে মিশে কাজে কেন নাম?
উড়বার ইচ্ছা প্রবল অথচ মাথা ঝিমঝিম করে
আমরা কি তোমাদের ওপর পদ্ধতি চাপাই
কখনো? তোমরাই তো আমাদের পেছন
পেছন লাগতে আস।

ফাউস্ট তোর কুৎসিত দন্তপাটি দিয়ে
কিড়মিড় আওয়াজ তুলিস না। শুনে আমার
ক্ষোভ বিরক্তি চরমে ওঠে। মহান গৌরবমণ্ডিত
পৃথ্বিআত্মা আমার সামনে আবির্ভূত হয়ে ধন্য
করেছ আমাকে। তুমি তো জান আমার
অন্তর মনের সমস্ত সংবাদ তবে কেন জুটি
বেঁধে দিলে আমাকে এই ঘৃণ্যজীবের সঙ্গে
ক্ষতিতে যার উল্লাস, ধ্বংস সাধনে যার আনন্দ।

মেফিস্টো : আপনার কথা কি ফুরাল?

ফাউস্ট : উদ্ধার কর তাকে, নতুবা তোমাকে ভোগ
করতে হবে তার ফল, হাজার হাজার বছর
ধরে জ্বালিয়ে মারবে এমন অভিসম্পাত নেমে আসবে।

মেফিস্টো : প্রতিশোধকামীদের বন্ধনজাল ছিন্ন করা
আমার কর্ম নয়। তুমি বলেই খালাস

উদ্ধার কর কিন্তু তার ধ্বংসের কারণ কে? তুমি
না আমি? বজ্র ছুঁড়ে মারার ভীতি প্রদর্শনের জন্য
ধন্যবাদ। সৌভাগ্যবশত মানবকুলকে সে শক্তি দেয়া
হয়নি। তোমাদের পথে যে কোন নিরীহ
জীব পড়বে ধ্বংস করে ছাড়বে। বেকায়দায়
পড়লেই এভাবে তোমাদের মত
নিপীড়করা শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়ে থাকে।

ফাউস্ট : আমাকে তার কাছে নিয়ে চল তাকে
মুক্ত করতে হবে।

মেফিস্টো : তুমি কিরকম বিপদের মুখে নিজেকে ঠেলে
দিচ্ছ চিন্তা করছ! তুমি নিজহাতে যে রক্তপাত
ঘটিয়েছ এ শহরে এখনো তার জের থামেনি।
হত ব্যক্তির মৃত্যুস্থানে প্রেতাত্মা ভিড় করে খুনীর
প্রত্যাগমনের প্রতীক্ষা করে।

ফাউস্ট : একথা বলতে সাহস করিস তুই। দানব
তোর ঘাড়ে সমস্ত হত্যা এবং অপরাধের দায়
নেমে আসুক। আমাকে নিয়ে চল। সে যেখানে
আছে এবং বলছি তাকে মুক্ত করব।

মেফিস্টো : আমি তোমার পথপ্রদর্শক হব। শুনে
রাখ আমি কি করতে পারব। স্বর্গমর্তের সমস্ত
ক্ষমতা আমি ধারণ করে বসে নেই। আমি
কারারক্ষীর সংজ্ঞা হরণ করে তোমার হাতে
চাবির গোছা তুলে দেব। দরজায় পাহারা
থাকব। তুমি মানবিক শক্তি প্রয়োগ করে তাকে
বাইরে নিয়ে আসবে। ঘোড়া তৈরি, আমি তোমাকে
নিয়ে যেতে পারি। কেবল এটুকুই আমার ক্ষমতা।

ফাউস্ট : তবে তাই হোক, চল যাত্রা করি।

চতুর্বিংশ দৃশ্য

রাত, উন্মুক্ত প্রান্তর

[ফাউস্ট-মেফিস্টোফেলিস কৃষ্ণবর্ণ অশ্বারোহণে জোর কদমে চলছে]

ফাউস্ট	:	বধ্যমঞ্চে ওরা ওসব বুনছে যেন কি।
মেফিস্টো	:	কেউ জানে না সেসব বড় জটিল বুজুরকি।
ফাউস্ট	:	লম্ফ দিয়ে ঝাপিয়ে পড়ছে উর্ধ্বলোকে কখনো চাপছে কখনো নামছে নিচে, কখনো আবার প্রবল প্রক্ষোভে ভেঙ্গে খানখান ছড়িয়ে পড়ছে।
মেফিস্টো	:	ডাইনির বাথান
ফাউস্ট	:	ওরা তুক তাক যাদুমন্ত্র কত কিছু করে।
মেফিস্টো	:	চল, চল।

পঞ্চবিংশ দৃশ্য

কারাগার

ফাউস্ট : (লৌহফটকের সামনে চাবির গুচ্ছ এবং মশাল হাতে)
বহুপূর্ব অতীতের বিস্মৃত বেদনা
আমার অন্তরলোকে দিয়ে যায় হানা
হায়রে বালিকে,
তোর দুঃখে কম্পমান অস্তিত্ব আমার
এইখানে স্যাঁতস্যাতে পাথুরে প্রকার
তার অন্তরালে বন্দি প্রিয়তমা প্রেয়সী আমার।
তার শুধু অপরাধ, অন্ধ অসহায় এক
আকাঙ্ক্ষার বেগ তাড়িত করেছে তারে।
বড়ই বিহ্বল আমি চালাতে সন্ধান
বড় সঙ্কুচিত তার মুখোমুখি হতে।
যা কর এক্‌খুনি কর, বিলম্বে বিনাশ
মরণ রসনা দেবে অমোঘ ছোবল।
(ফাউস্ট ফটকের তালায় হাত রাখল এবং
শুনতে পেল ভেতরে গান গাইছে)

মার্গারিটা (অভ্যন্তরে)
মা ছিল এক জাতকুলটা
মত্যু দিল বর
বাপ ছিল এক নচ্ছার বেটা
গিলে খেল ধড়।
সোনামণি বোনটি আমার
অস্থিগুলো তুলে
পুঁতে দিল একে একে
গহীনমাটির তলে।
শুনতে পেলাম আমি এখন
পক্ষি হয়ে গেছি
দূরের কানন ভূমির ডাকে
উড়ে উড়ে যাইরে আমি
উড়ে উড়ে যাই।

ফাউস্ট : (রুদ্ধ তালা খুলে)
দুয়ারে দাঁড়িয়ে প্রিয় আহা সংজ্ঞা নেই মনে
হস্তের শৃঙ্খল আর শুষ্ক তৃণ শোনে
তার সঙ্গীত প্রলাপ।
(ফাউস্ট ভেতরে প্রবিষ্ট হল)

মার্গারিটা : (তৃণ শয্যায় নিজেকে লুকাবার চেষ্টা করে)
হায়, হায়, ঐ আসে তারা
ভয়াবহ যমদণ্ড মৃত্যু সন্নিকটে।

ফাউস্ট : শান্ত হও প্রিয়তমে, ধীরে কও কথা
তোমার বন্ধনজাল ছিন্ন করে নিয়ে যাব আমি।

মার্গারিটা : ওগো তোমার অন্তরে কোন দয়ামায়া নেই
মনুষ্যের চোখ নেই ললাটে তোমার?

ফাউস্ট : প্রিয়তমে কারারক্ষী জেগে যাবে
তোমার চিৎকারে।
(ফাউস্ট তাকে মুক্ত করার জন্য শৃঙ্খলে হাত রাখল,
মার্গারিটা জানু পেতে বসল)

মার্গারিটা : রে জল্লাদ বল্
যার ভয়ঙ্কর বার্তা বয়ে এই রাতে
এসেছিস বল, কে সেই নিষ্ঠুর।
দয়া কর্, দয়া কর্, বাঁচতে দে আমায়
ঊষা আসে দ্রুতগতি। এই বুঝি বেজে ওঠে
অন্তিম সঙ্কেত, অত্যাসন্ন পরিণাম
আমার জীবনরঙ্গ সাঙ্গ হবে (উঠে দাঁড়াল)
হায়রে এখনো আমি নবীনা তরুণী
একদা ছিলাম বটে অনিন্দ্য সুন্দরী
তাই হল আপনার মত্যুর কারণ।
আহা প্রেম ছিল সন্নিধানে ছিল প্রিয়
এখন তো অপগত সব
ফুলদল ছিন্ন আজ পদতলে পিষ্ট হয় চম্পক মালিকা।
রে জল্লাদ তোর কোন ক্ষতি করি নাই
ছেড়ে দে, ছেড়ে দে আমায়।
অতি জোরওয়ার তুই, তোর স্পর্শ বড়ই পুরুষ
অভাগিনী নারী আমি, কারুণ মিনতি রাখ্
জীবনে কখনো তোকে নয়নে দেখিনি।

ফাউস্ট : হে অশ্রু নিরস্ত হও
পাছে আমি দোলাচলে হই কাপুরুষ।

মার্গারিটা : এখন আমি তোর হাতের মুঠোয়
রে ঘাতক দেব না কোনই বাধা
কিন্তু তার আগে বাছারে আমার স্তন্য দিতে দে
গোটা রাত পিয়ায়েছি দুধ ওরে বড়ই আদরে।
কিন্তু তারা কেড়ে নিল আমার প্রাণের প্রাণ বুকের মাণিক
তারপরে শিরে দিল লাঞ্ছনার ডালি।
এখন বলছে তারা মা হয়ে শিশুর প্রাণ করেছি হরণ
কাটা ঘায়ে তাজা নুন দুঃখ কাকে বলে।
এখন মানুষ আমাকে নিয়ে নিত্যি ছড়া লিখে
গান করে গায়
প্রাণের যেখানে ব্যথা প্রত্যহ খোঁচায়।
একটি প্রাচীন গাঁথা যার শেষ এরকম
আমিও শুনেছি, কোপন স্বভাব লোক
এখন আমার নামে সেই গান গায়।

ফাউস্ট : (নতজানু হয়ে)
দেখ পদতলে নত হয়ে প্রেমিক তোমার
আপনার হস্তে করে বন্ধন মোচন।

মার্গারিটা : (ফাউস্টের পাশে জানু পেতে বসে)
চল নতজানু হই, মস্তক নোয়াই
সন্তবৃন্দে ডাকি, যেন করে অবধান করুণ মিনতি
ফটক পড়িছে ফেটে অগ্নিশিখা উড়ে
সোপানে নরক অগ্নি প্রচণ্ড হুঙ্কারে
শয়তান আসিছে ধেয়ে শোন রোষধ্বনি
এখ্খুনি উগরে দেবে আস্ত জাহান্নাম।

ফাউস্ট (উচ্চ কণ্ঠে) গ্রেচেন, গ্রেচেন

মার্গারিটকা (সকচিত হয়ে)
যেন পূর্বজন্ম প্রান্ত হতে শুনি
আমার হৃদয়নাথ বলিতেছে বাণী।
(লাফ দিয়ে দাঁড়াল, পায়ের শৃঙ্খল খসে পড়ল)
কোথায় কোথায় পাব।
এইমাত্র শুনলাম যার কণ্ঠস্বর
মুক্ত আমি টুটেছে শৃঙ্খল।
বাহুপাশে বেঁধে তাকে হৃদয়েতে নেব
হিয়ায় মেশাব হিয়া, কে আমায় বারণ করে
তার বুকে আপনাকে ছুঁড়ে দেব আমি।
এইমাত্র চৌকাঠে দাঁড়িয়ে গ্রেচেন গ্রেচেন বলে
অন্তরের অনুরাগে যেজন ডেকেছে।

এই নারকীয় পরিবেশ, তর্জন গর্জন
অহরহ শয়তানের উগ্র উন্মাদনা, উচ্চরোল পরিহাস
তারি মাঝে হয়েছে ধ্বনিত
স্নিগ্ধ শোভন কান্তি প্রেমিকের মধুমাখা স্বর।

ফাউস্ট : আমি সেই।

মার্গারিটা : তুমি সেই, বল এই কথা আর একবার।
(ফাউস্টকে আলিঙ্গন করে)
এই তুমি! আমার বেদনরাশি মুহূর্তে উধাও
কোথায় কারার ভয় শৃঙ্খল যন্ত্রণা;
পেয়ে গেছি কি আশ্চর্য মুক্তির আস্বাদ।
এখনো দৃষ্টিতে ভাসে সেই রাজপথ
আহা সেই রাজপথ যেখানে তোমার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ
ফুলদল বিকশিত প্রফুল্ল উদ্যান
আমার স্মরণে আসে মার্থার কাননে
প্রহর গোঙায় যেত প্রিয়তম দরশন আশে।

ফাউস্ট : চলে এস, এস।

মার্গারিটা : আহা এইখানে তিষ্ঠ ক্ষণকাল
তোমায় পেয়েছি ফের, আনন্দ অন্তরে
তাই আমি দাঁড়াব ক্ষণিক।

ফাউস্ট চলে এস প্রিয়তমে
বিলম্বে সমূহক্ষতি, যদি ব্যর্থ হই
কেঁদেও হবে না শেষ তার পরিতাপ।

মার্গারিটা : প্রিয়তম চুম্বনে বিরাগ কেন
এক চাঁদ পরমায়ু করে নাই শেষ
এরি মধ্যে বিসরিলে
প্রেমের আবেগভরা তড়িতচুম্বন।
তোমায় জড়ালে বুকে বল কেন শঙ্কা জাগে মনে
এমনও সুদিন ছিল তোমার কণ্ঠের স্বর, চোখের চাহনি
কোন্ সুখলোকে প্রাণ নিয়ে যেত টেনে
চুম্বনে চুম্বনে আহা বিবশ শরীর।
মনে হত ভেসে যাব কোথা নিরুদ্দেশে
আমাকে চুম্বন কর, নয় আমি করব চুম্বন।
তোমার অধর ওষ্ঠ এত শুষ্ক নীরস নিষ্প্রাণ
কোথা সেই ভালবাসা প্রাণের প্রত্যেক রন্ধ্রে বাঁশরির সুর
হায়, হায়, কে করল অভাগীর এই নর্বনাশ।
(সে মুখ ফিরিয়ে নিল)

ফাউস্ট : সঙ্গে সঙ্গে এস প্রিয়তমে
অন্তরে সাহস রাখ
সহস্র সহস্রবার ভালবেসে যাব
এখন মিনতি রাখ, সঙ্গে সঙ্গে এস।

মার্গারিটা : একি প্রকৃত তুমি, একি কভু সত্য হতে পারে?

ফাউস্ট : সত্য, সত্য বটে আমি, চলে এস সাথে।

মার্গারিটা : বঁধু তুমি ঘুচিয়েছ শৃঙ্খল বাঁধন
আবার নিয়েছ তুলে হৃদয়ে জড়ায়ে
আমার অবাক লাগে কেন শঙ্কা নাহি জাগে তোমার অন্তরে
নিজ হাতে মুক্ত করলে কোন্ পাপীয়সী।

ফাউস্ট : আহা, চলে এস
প্রত্যূষ রাতের কালো করিছে শোষণ
ফিকে হয়ে এল তার গাঢ় আবরণ।

মার্গারিটা : আপন হাতে খুন করেছি মাকে
নিজের ছাওয়াল বধ করেছি ডুবিয়ে কূয়ার জলে।
এ শিশু প্রাণের প্রাণ রক্তের রক্ত তোমার আমার
একি তুমি? বিশ্বাস হয় না মোটে, হাতখানি দাও
কেন জানি মনে হয় স্বপ্ন চলমান।
তোমার দু'খানি হাত ভেজা ভেজা কেন
মনে হয় রক্ত লেগে আছে
হায় খোদা কি করলে কথা রাখ
কোষবদ্ধ কর তরবারি।

ফাউস্ট : প্রিয়তমে অতীত মিলাতে দাও আচ্ছন্ন অতীতে
তা না হলে শুরু হবে ঘোর বিপর্যয়
প্রাণ যাবে দুজনের সেই পরমাদে।

মার্গারিটা : না না আমি মরি, তোমাকে বাঁচতে হবে
শুনে রাখ কেমন কবর হবে করছি বয়ান।
উত্তম কবরে স্থান দিয়ো জননীকে
তার পাশে ভাই যেন সুখে শুয়ে থাকে
একটু তফাতে হবে আমার কবর
মা ভায়ের গোর থেকে নয় বেশি দূর।
ডাহিন বুকের কাছে বাছারে আমার
ঠাঁই দিয়ো অনুরোধ নাহি ভাব পর।
দেখবে শুনবে আর করবে যতন
যেন কেউ শান্তি সুখ না করে হরণ।
একদা পুলকচিত্তে বাহুপাশে বেঁধেছি তোমায়
মরি, মরি কিবা সুখ হল অপগত
প্রতি সুধাবিন্দু দিয়ে গড়া স্বপ্ন মধুময়।

সে আনন্দ সে পুলক ফিরবে না আর
রুদ্ধ করে আছ তুমি হৃদয় দুয়ার।
তত্রাচ তোমার পথে আপনাকে ঠেলি
মনে হয় পেয়ে যাব
প্রেমপূর্ণ দয়াময় তোমার হৃদয়।

ফাউস্ট : অন্তরে প্রতীতী যদি জন্মে থাকে
তোমার হৃদয়নাথ প্রাণকান্ত আমি
উপেক্ষা করতে পারি সর্ব বাধা ভয়
চলে এস।

মার্গারিটা : হেথা হতে যাব কোথা।

ফাউস্ট : যেইখানে মুক্ত স্বাধীনতা।

মার্গারিটা : আমার সমাধি যদি হয় এইখানে
মৃত্যু যদি পেতে থাকে ফাঁদ
তাহলে সেখানে চল অন্তহীন নিদ্রাসুখ
করি আস্বাদন
বাড়াতে পারি না আর একটি চরণ
যাও চলে প্রিয়তম হাইনরিশ আমার
আহা যদি পারতাম!

ফাউস্ট : অন্তরে সাহস ধর উন্মুচিত দ্বার।

মার্গারিটা : এইখানে থাকতে হবে নিয়তি আমার
সর্ব আশা শেষ যার পালাবে কোথায়?
ওঁত পেতে আছে তারা, ঘাতক প্রস্তুত
দুর্গত জীবন দুটি অন্ন ভিক্ষা করে শুধু বেঁচে থাকা
তারো চেয়ে ভয়ঙ্কর দিবানিশি বিবেক দংশন
দূর-দূরান্তর দেশে সহায় বান্ধবহীন একেবারে একা থাকা
সে বড় কঠিন কর্ম একদিন হব গেরেফতার।

ফাউস্ট : তোমায় ছেড়ে যাব না কোথাও।

মার্গারিটা : দ্রুত চলে যাও
শিশুটি বাঁচাও
নদীতীর বেয়ে
সাঁকোটি পেরিয়ে
দেখবে বনের একটুকু বামে
মাচান খিলান যেখানে মিলেছে
দেখবে পুকুর জলে ভরভর
শিশুটি সেখানে বাঁচার আশায়
হাত পা ছুঁড়ছে।
অকূল হতে টেনে তোল কূলে
যাও যাও ত্বরা সময় গোঁভায়।

ফাউস্ট : শান্ত হও প্রিয়ে, আর মাত্র একপদ
সমুখে বাড়ালে সর্বশঙ্কা হতে মুক্তি।

মার্গারিটা : হেথা হতে দূরে পাহাড় পেরিয়ে যখন যাব
আমার কেশে ফেলিছে তুষার শ্বাস
দেখব জননী বসে একাকিনী
শিলার আসনে।
নিরাশায় তার মস্তক দুলিছে
চিনতে পারে না আমাকে আর
কাঁপন জাগে না আঁখি তারার
মস্তক তার নুয়ে পড়ে ভারে
গভীর গহন ঘুমে অচেতন
পাশ ফিরে কভু জাগবে না আর।
ঘুমের গভীরে পাঠিয়ে মায়েরে
দুজন করেছি সুখের সন্ধান।

ফাউস্ট : কার্যসিদ্ধি হবে না কথায়
নিতে হবে জোর করে, হে আমার বাহু
তুমি বাক্য হতে শক্তিমান, দাও সে প্রমাণ।

মার্গারিটা : আমাকে একা হতে দাও
শক্তিতে হব না বশ
দূরে রও খুনিয়ার সন্নিকটে এস না আমার।
আর কেন, যত প্রেম ছিল প্রাণে
দিয়েছি উজাড় করে তোমার চরণে।

ফাউস্ট : প্রিয়তমে নিশাক্রান্ত
ঐ দেখ দিনের উদয়।

মার্গারিটা : হ্যাঁ দিন, বড় ভয়ঙ্কর দিন
হতে পারত এই দিনে বিবাহ আমার।
এসেছ গ্রেচেন কক্ষে কারো কাছে কর না প্রকাশ
বেদনায় ঝরে গেছে মালা হতে ফুল
ভাগ্যে যা ছিল ঘটে গেল।
আবার সাক্ষাৎ হবে, তবে নাচের আসরে নয়।
ঐ দেখ নিঃশব্দ চরণে তারা ভিড় করে আসে
অলিপথ গলিপথ রাজপথ ভরে
লোকে লোকে লোকারণ্য তিল নাহি ধরে
তুরি ভেরি বেজে ওঠে যমদণ্ড হয়েছে ঘোষণা।
হস্তপদ বাঁধে সব নির্মম বাঁধনে
বধ্যমঞ্চে একা আমি থরহরি কম্পমান
নির্বাক নিস্পন্দ চোখে জনতা নেহারে

ঝলসে ওঠে ঘাতকের তীক্ষ্ণ তরবার
সবাই আপন কণ্ঠে হাত রাখে
যেন সে কণ্ঠ আমার
নির্বাক নিস্তব্ধ ধরা চেয়ে আছে পাষাণ প্রতিমা।

ফাউস্ট : ধরাতলে জন্ম যদি না হত আমার।

মেফিস্টো : (কপাটের কাছে মেফিস্টোফেলিস দেখা দিল)
অধিক বিলম্বে দুজনেই হারাবে জীবন
দেখতে পাও না উষা
কি কারণে এত দেরি বৃথা শুধু সময় হরণ।
অশ্বগুলো কম্পমান ঘর্মে সিক্ত সর্ব কলেবর
এখনো দাঁড়িয়ে কেন
দেখছ না পূর্বাকাশে সূর্য সুপ্রকাশ।

মার্গারিটা : ভূমিতলে ভেদ করে কে বা জাগে দুষ্ট দুরাচার
হাঁ সেই, সেই দৃষ্টির আড়ালে যা
পবিত্র ভূমিতে নেই তোর অধিকার।
আমার মৃত্যুর পরে আত্মা নিয়ে কষ্ট দেবে
তাই বেটা অপেক্ষায় আছে।

ফাউস্ট : তোমাকে বাঁচতে হবে।

মেফিস্টো : (ফাউস্টের প্রতি)
চল এস, নয়তো তোমারও হবে একই লোকে গতি।

মার্গারিটা : আমি তো তোমার হে প্রভু, আমাকে উদ্ধার কর
স্বর্গবাসী পিতা, দেবদূতগণ আমাকে
বেষ্টন করে থাক সর্বক্ষণ।
হাইনরিশ তোমার জন্য বড় ভয়, বড় বেশি আতঙ্ক আমার।

মেফিস্টো ওর মৃত্যু সুনিশ্চিত।
(ঊর্ধ্বলোক হতে) ঊর্ধ্বলোকে মুক্তি পেয়ে গেছে।

মেফিস্টো : আর নয় এইবার এস!
(ফাউস্টসহ অন্তর্ধান)

ধ্বনি (কারাকক্ষের ভেতরে ধ্বনি ক্রমশ ক্ষীণতর হয়ে আসে)
হাইনরিশ! হাইনরিশ!

গ্যোতের জীবন এবং প্রধান প্রধান ঘটনাসমূহ

১৭৪৯	২৮ আগস্ট তারিখে গ্যোতে ফ্রাঙ্কফোর্টে জন্মগ্রহণ করেন। বাবা য়োহান ক্যাস্পার গ্যোতে (১৭১০-১৭৮২) এবং মা এলিজাবেথ ক্যাথারিন (১৭৩১-১৮০৮)।
১৭৫৯	সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধের ফলশ্রুতিতে ফ্রাঙ্কফোর্ট ফরাসিদের দখলে চলে যায়।
১৭৬৪	সম্রাট দ্বিতীয় জোসেফের অভিষেক।
১৭৬৫-৬৮	পর্যন্ত লাইপসিক্ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র।
১৭৬৮-৭০	ফ্রাঙ্কফোর্টে পিতৃগৃহে অবস্থান।
১৭৭০	স্ট্রাসবুর্গে অবস্থান এবং আইনের সনদ প্রাপ্তি।
১৭৭১-৭২	অল্পদিনের জন্য আইন ব্যবসায় আত্মনিয়োগ।
১৭৭২	ভেৎস্লারে অবস্থান। তাঁর প্রেমিকা লোটে বাফ-কাস্নারকে বিয়ে করেন।
১৭৭৩-৭৫	ফ্রাঙ্কফোর্টে অবস্থান। এসময়ে তিনি প্রহসন, কবিতা এবং ক্লাভিগো নাটক রচনা করেন। এসময়েই তিনি 'ফাউস্ট','এগমন্ট' এবং 'ভের্থর' রচনা শুরু করেন এবং লিলি শোয়েনমানের সঙ্গে তাঁর বিয়ে ঠিক হয়।
১৭৭৫	মে থেকে জুলাই মাস পর্যন্ত তিনি সুইজারল্যান্ড ভ্রমণ করেন। নভেম্বর মাসে ভাইমারের ডিউক কার্ল আগস্টের নিমন্ত্রণে ভাইমারে আসেন।
১৭৭৬	মন্ত্রিপরিষদের সদস্য হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। এসময়ে শার্লোট ফন স্টেইনের সঙ্গে তার প্রণয় জন্মে এবং ইল মেনাউতে খনিজ সংক্রান্ত বিষয়ে মনোনিবেশ করেন।
১৭৭৭	নভেম্বর থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়ে হার্টস্ পর্বতে ভ্রমণ করতে যান।
১৭৭৮	বার্লিন সফর করেন।
১৭৭৯	যুদ্ধপরিষদের সভাপতি এবং সড়ক ও জনপথ বিভাগের পরিচালকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এ-সময়ে তিনি গদ্যে 'ইফিগেনিয়া' রচনা করেন।
১৭৮০	দ্বিতীয়বার সুইজারল্যান্ড ভ্রমণে যান।
১৭৮২	তাঁকে সম্মানসূচক সামন্ত পদে উন্নীত করা হয় এবং তিনি অর্থ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

১৭৮৪	অস্থিবিদ্যায় human os inter maxillare অস্থি সর্বপ্রথম আবিষ্কার করেন।
১৭৮৫	রাজন্যবৃন্দের মধ্যে দৌত্য কাজ করেন এবং উদ্ভিদবিদ্যার গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেন।
১৭৮৬	তিনি ইতালি ভ্রমণ করেন এবং কবিতায় 'ইফিগেনিয়া', 'এগমন্ট' এবং 'টাস্‌সো' নাটক রচনা করেন।
১৭৮৮	দৈনন্দিন রাজকার্যের ঝামেলা থেকে তিনি মুক্তি লাভ করেন। এ-সময়ে ভাবীপত্নী খ্রিস্টিয়ানা ভালফিয়াসের সঙ্গে একত্রে বসবাস শুরু করেন। এই সময়ের কাব্যগ্রন্থ 'রোমান এলিজি'।
১৭৮৯	ডিসেম্বর মাসে একমাত্র পুত্র আউগস্ট জন্মগ্রহণ করে। পাঁচ সন্তানের মধ্যে একমাত্র আউগস্টই বেঁচে ছিল।
১৭৯০	আট খণ্ডের গ্যোতে রচনাবলি প্রকাশিত হয়। এ-সময়ে তিনি জ্যোতির্বিদ্যা, অস্থিবিদ্যা, আলোকবিদ্যা ও উদ্ভিদের রূপান্তর বিদ্যার (Metamorphosis of plant) গবেষণায় গভীরভাবে আত্মনিয়োগ করেন। এছাড়া রাজকীয় নাট্যমঞ্চ পরিচালকের দায়িত্বভারও তাঁকে গ্রহণ করতে হয়।
১৭৯২	আগস্ট থেকে নভেম্বর পর্যন্ত ফরাসিদের অভিযান। এ-সময়ে সাত খণ্ডে তাঁর নতুন রচনাবলি প্রকাশ শুরু হয়।
১৭৯৪	জার্মানির অপর একজন বিখ্যাত কবি শিলারের সঙ্গে তাঁর গভীর বন্ধুত্ব হয়। গোটা-বিশ্বের সাহিত্যে এরকম বন্ধুত্বের দৃষ্টান্ত বিরল। এ-সময়ে তিনি 'ভিলহেম মাস্টারস্ এ্যাপ্রেন্টিশ্‌শিপ' গ্রন্থ রচনায় হাত দেন।
১৭৯৬	শিলারের সঙ্গে মিলিত হয়ে 'হ্বেনিয়েন' পত্রিকা প্রকাশ করেন। এ-সময়ে 'হার্মান অ্যান্ড ভরোথিয়া' নাটকটি রচনা করেন।
১৭৯৭	তিনি দক্ষিণ জার্মানি এবং সুইজারল্যান্ড ভ্রমণ করেন।
১৭৯৮	সাহিত্য সাময়িকী 'ডি প্রোপিলায়েন' প্রকাশ করেন।
১৮০১	বিসর্প বা শোথ রোগে আক্রান্ত হন।
১৮০৩	'দি ন্যাচারাল ডটার' প্রকাশ। জেনাতে ফ্রোমান পরিবারের অতিথি।
১৮০৪	মাদাম দা স্টেইল নাম্নী ফরাসি মহিলার সঙ্গে সাক্ষাৎ। ভিঙ্ক্যালমানের সাথে সাক্ষাৎ। নেপোলিয়ান নিজেকে সম্রাট ঘোষণা করেন।
১৮০৫	ভয়ঙ্কর কিডনী রোগে আক্রান্ত। শিলারের মৃত্যু। সেলটারের সঙ্গে বন্ধুত্ব।
১৮০৬	অক্টোবরের ১৪ তারিখে সংঘটিত হয় জেনার যুদ্ধ। ভাইমার নেপোলিয়নের দখলে চলে যায় এবং গ্যোতে ভালপিয়াসকে খ্রিস্টধর্ম মতে বিবাহ করেন।
১৮০৭	'ফাউস্ট', প্রথমখণ্ড প্রকাশিত হয়।

১৮০৮ ১২ খণ্ডে প্রকাশিত গ্যোতে রচনা সংকলনে ফাউস্ট প্রথম খণ্ডের অন্তর্ভুক্তি। এই একই বছরে এরফুর্ট কংগ্রেসে নেপোলিয়নের সাথে গ্যোতের সাক্ষাৎ।

১৮০৯ আত্মজীবনী রচনার সূচনা।

১৮১২ অমর সংগীতশিল্পী বেঠোফেন এবং অস্ট্রিয়ার সম্রাজ্ঞী মারিয়া লুডোবিকার সঙ্গে সাক্ষাৎ। নেপোলিয়েনের রাশিয়া অভিযান।

১৮১৩ রাশিয়া, প্রাশিয়া, অস্ট্রিয়ার সম্মিলিতভাবে নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে ১৮ অক্টোবর তারিখে লাইপসিকের যুদ্ধে অংশগ্রহণ।

১৮১৪ নেপোলিয়নের পরাজয়, এল্‌বা দ্বীপে নির্বাসন এবং ভিয়েনা কংগ্রেসের অধিবেশন।

১৮১৫ মাইন, রাইন অঞ্চলে ভ্রমণ। পুনরায় কোল্‌ন্‌ হয়ে রাইন, মাইন অঞ্চল পরিদর্শন। ২৯ খণ্ডে রচনাবলির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ। একই বছরে ওয়াটার্লুর যুদ্ধে নেপোলিয়নের চূড়ান্ত পরাজয় এবং সেন্ট হেলেনায় নির্বাসন।

১৮১৬ পত্নী ভালফিয়াসের মৃত্যু।

১৮১৭ রাজকীয় নাট্যমঞ্চের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি। পুত্র আউগস্টের সঙ্গে ওতিলে পগভিশের বিয়ে।

১৮১৯ 'দিওয়ান অব্‌ দা ওয়েস্ট অ্যান্ড ইস্ট' (প্রাচ্য-প্রতীচ্যের দেওয়ান) গ্রন্থের প্রকাশ। বার্লিনে ফাউস্টের প্রথম মঞ্চায়ন।

১৯২১ 'ভিলহেম মাস্টার্‌স্‌ এ্যাপ্রেন্টিশ্‌শীপ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের প্রকাশ।

১৮২৩ শুরুতেই কঠিন রোগে আক্রান্ত হন। এ-সময়ে একারমান তাঁর সেক্রেটারি হিসেবে কাজ করতে ভাইমারে আসেন।

১৮২৫ ফাউস্ট, দ্বিতীয় খণ্ডের ওপর কাজ শুরু।

১৮২৮ ৪০ খণ্ডে রচনাবলি শেষবারের মত তাঁর জীবদ্দশায় প্রকাশিত হয়।

১৮৩০ গ্যোতের একমাত্র পুত্র আউগস্ট রোমে মারা যান। প্যারি একাডেমিতে কুভিয়ের জিওফ্রে বিতর্কের সূত্রপাত। প্যারিতে জুলাই বিপ্লব। নাগিরক সম্রাট লুই ফিলিপের রাজত্বকাল শুরু।

১৮৩১ তিনি উইল করেন। ফাউস্টের, দ্বিতীয় খণ্ডের সমাপ্তির পর ইলমে-নাউতে শেষবারের মত জন্মদিন পালন করেন।

১৮৩২ মার্চের ১৪ তারিখ তিনি গাড়িতে করে বেড়াতে যান। মার্চের ১৬ তারিখে অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং মার্চের ২২ তারিখে মারা যান। ২৬ মার্চ তারিখে রাজকীয় শবাধারে করে তাঁকে বন্ধু শিলারের পাশে সমাহিত করা হয়।

সহায়ক গ্রন্থের তালিকা

১. কবিগুরু গ্যেটে, প্রথম খণ্ড — কাজী আবদুল ওদুদ, ভারত সাহিত্যভবন ২০৩/২ কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা-১৩৫৩

২. কবি গুরু গ্যেটে, দ্বিতীয় খণ্ড — ঐ

৩. The History of Doctor Johan Faustas — H. G. Haile. University of Illinois press. Urbana, 1965

৪. Herder his life and thought — Robert J. Clark. Jr. University of California Press, Berklay and Los Angels, Cambridge University Press, London, 1955.

৫. Carlyle's Lectures on Heroes, Hero Worship and the Heroic in History — Edited by P. C. Poor, Clavenden press. London.

৬. The Plays of Christopher Marlowe — J. M. Dents Sons Ltd. London 1927.

৭. Goethe : Poet & thinker — Essays by Elizabeth Wilkinson and L. A. Willoughby Edward Arnslal Publisher Ltd. London 1962.

৮. Goethe—the Reluctant Bourgeois — Walter Benajamin, New Left Review, issue No. 133. New York.

৯. Geothe and his Age — George Luckacs. Translated by Robert Anchor, Merlin Press. London 1974.

১০. Goethe his Life and Times — Richard Friedenthal, Weiden-Feld Nicolson 29, New Bond Street London 1965.

১১. Conversation With Ecker Mann — Translated by John Oxenford. North Point press. San Francisco 1982

১২. The life and work of Goethe — Lewes. Geroge Henry. Everyman Library No 257 Dent London, 1959.

১৩. Who is Goethe? — Edited by Katharina Mommsen. Translated by Leslie and Jeanne Wilson : Suhrkamp Insel Publishers. Boston Inc. 1983.